বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(Contemporary Islamic Calligraphy: Bangladesh Perspective)

পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়

মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর

পিএইচ.ডি গবেষক

রেজি: নং-১৮২/২০১২-১৩

রেজি: নং-৬১/২০১৭-১৮ (পুনঃ)

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

মার্চ-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(Contemporary Islamic Calligraphy: Bangladesh Perspective)

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদভুক্ত আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক **মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর** কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত **সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ (Contemporary Islamic Calligraphy: Bangladesh Perspective)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি গবেষকের একক গবেষণাকর্ম। যা মৌলিক ও তথ্যবহুল। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য দাখিল করতে চুড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে- **সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ (Contemporary Islamic Calligraphy: Bangladesh Perspective)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এ গবেষণাকর্মের কোন অংশ ইতোপূর্বে কোথাও প্রকাশ করা হয়নি।

(মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর)
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং-১৮২/২০১২-১৩ খ্রি.
রেজিঃ নং-৬১/২০১৭-১৮ খ্রি. (পুনঃ)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শব্দ-সংক্ষেপ নির্দেশনা

সংক্ষিপ্ত	পূর্ণাঙ্গ রূপ
(সা.)	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(আ.)	আলাইহিস সালাম
(রা.)	রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা/আনহুমা/আনহুম/আনহুন্না
(রহ.)	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
জ.	জন্ম
মৃ.	মৃত্যু
পৃ.	পৃষ্ঠা
নং	নাম্বার
ড.	ডক্টর
অনু.	অনুবাদ/অনুদিত
লি.	লিমিটেড
হি.	হিজরী (হযরত মুহাম্মদ সা. এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত থেকে গণনাকৃত সন)
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
পূ.	পূর্ব
ঢাবি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাএ	বাংলা একাডেমি
বাশিএ	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
ইফা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বাং	বাংলা সন
ব.	বর্ষ
স.	সংখ্যা
তা.বি	তারিখ বিহীন
সম্পা.	সম্পাদিত
সংস্ক.	সংস্করণ
প্রাগুক্ত	পূর্বোক্ত, পূর্বের উক্তি
খ.	খণ্ড
দ্র.	দ্রষ্টব্য
১ম	প্রথম
২য়	দ্বিতীয়
৩য়	তৃতীয়

P.	Page
PP.	Pages
(SM)	Sallallahu Alaihi Wasallam
Vol.	Volume
ND	No Date
Op. cit.	Open cito
Ibid.	Ibidem
IF	Islamic Foundation
Dr.	Doctor
Pvt.	Private
Edn.	Edition
Pub.	Publisher
Tr.	Translation

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা

আরবী	প্রতিবর্ণ	আরবী	প্রতিবর্ণ
أ	আ, া	ع	‘
إ	ই, ি	غ	গ
أُ	উ, ু	ف	ফ
او	ঊ,	ق	ক্ব
اى	ঈ,ী	ك	ক
ب	ব	ل	ল
ت	ত	م	ম
ث	ছ, স	ن	ন
ج	জ	و	ও, ভ
ح	হ	ه	হ
خ	খ	ة	হ্/ত*
د	দ	ء	’
ذ	য	اء	আ’
ر	র	اء	ই’
ز	য	اء	উ’
س	স, ছ	يِ,ى	য়, ইয়া
ش	শ	ى	য়ি
ص	স্ব	ىِ	য়ী
ض	য, দ্ব	عا	‘আ
ط	ত্ব	عى	‘ঈ
ظ	য	عو	‘ঊ

* শব্দের শেষে আসায় ة কে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন- بقرة (বাকারাহ)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করছি; যার অপরিসীম মেহেরবাণীতে **সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সকল বিধি-বিধান মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারলাম। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি; যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য সুমহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ক্যালিগ্রাফির প্রতি উৎসাহ প্রদান করে ইসলামী শিল্পকলার বিকাশে অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধাসহ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক, বিশিষ্ট গবেষক, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **ড. মোহাম্মদ ইউছুফ** স্যার-এর প্রতি। যিনি প্রচণ্ড ব্যস্ততা সত্ত্বেও যথাযথ আন্তরিকতার সাথে আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে অসামান্য অবদান রেখেছেন। যার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলে গবেষণাকর্মটি শেষ করতে পেরেছি এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার জন্য অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায় পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর নিরলস ও আন্তরিক সহযোগিতা। তাছাড়াও সাবেক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান **ড. আ স ম আব্দুল্লাহ** স্যার-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও শুরু থেকেই নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পথ-নির্দেশনা দিয়ে আমার গবেষণাকর্ম এগিয়ে নিয়েছেন। এজন্য আমি তাঁদের নিকট চিরঋণী। আমি তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ মহতী কর্ম সম্পাদনে আমাকে বিভিন্ন সময় উদারচিত্তে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন অত্র বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ড. মো. আবদুল কাদির, সহযোগী অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ড. মুহা. মিজানুর রহমান, ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, সহকারী অধ্যাপক ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, ড. মুহা. রফিকুল ইসলাম, ড. কামরুজ্জামান শামীম, চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. আব্দুস সাত্তার, ইসলামিক আর্টস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সভাপতি শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমির সভাপতি শিল্পী আরিফুর রহমান, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড-এর সভাপতি শিল্পী

মাহবুব মুর্শিদ ও সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমদ মাইজভাণ্ডারী ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শিল্পী সাইফুল্লাহ সাফা। তাদের সবার কাছেও আমি চিরঋণী।

গবেষণার কাজে দ্বারস্থ হয়েছি- পাবলিক লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, জাতীয় জাদুঘর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার। তাছাড়াও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করেছেন বিভিন্ন খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার তথা শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী সবিহ্-উল আলম, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী ভাস্কর রাসা, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ। উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি উক্ত শিল্পীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজে সহযোগিতা করেছেন আসাদ উদ্দীন। আর আনুষঙ্গিক কাজে সহযোগিতা করেছে ছোট ভাই মুজাহিদুল্লাহ নোমান ও মুস্তাইন বিল্লাহ রুমান তাদের প্রতিও রইল আন্তরিক সাধুবাদ।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ, একাডেমিক পরিষদ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও বিভাগীয় অফিসসহ অন্যান্য শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি; যারা আমাকে আধুনিক যুগোপযোগী এ বিষয়ের উপর পিএইচ.ডি করার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। গভীর কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মাওলানা এ বি এম আব্দুল হক, মাতা শ্রদ্ধেয়া ফিরোজা বেগম; যাদের আন্তরিক ও চিরন্তন দু'আ ও নির্দেশনা আমার অগ্রযাত্রার পথে সর্বদা আলোকবর্তিকা হিসেবে ছিল দীপ্যমান। সেই সাথে আমার হৃদয়ের গহীন কন্দর থেকে উৎসারিত সবটুকুন ভালবাসা রইল সহধর্মীনি সালমা মানসুর-এর প্রতি, যে প্রতিনিয়ত আমার কাছে ছায়ার মত পড়ে থেকে এ গবেষণার কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহস জুগিয়েছে এবং দুগ্ধপোষ্য কন্যা আদিবা ইবনাত সাফার প্রতি যার অকৃত্রিম ভালবাসার ফল্গুধারা সিঞ্চিত করেছে আমার অনুভূতি ও অস্তিত্ব। আমি তাদের সবার কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ। মহান আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে ইহকালে ও পরকালে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

মোঃ সাইফুল্লাহ মানসুর

সূচিক্রম

	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সূচনা	প্রত্যয়নপত্র	III
	ঘোষণাপত্র	IV
	শব্দ-সংক্ষেপ নির্দেশনা	V
	প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা	VII
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	VIII
	সূচিক্রম	X
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	XII
	উপক্রমনিকা	১
প্রথম অধ্যায়	**ক্যালিগ্রাফি, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এবং এর শৈলী ও কর্মকৌশল**	
	প্রথম পরিচ্ছেদ: ক্যালিগ্রাফির পরিচয়	৮
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উন্মেষ ও বিকাশধারা	২৮
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলী	৬০
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফি নির্মাণের কর্মকৌশল	১০৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	**বাংলাদেশের সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফার ও ক্যালিগ্রাফি**	
	প্রথম পরিচ্ছেদ: খ্যাতনামা ইসলামী ক্যালিগ্রাফারদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম	১২৫
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা	১৮৪
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন	১৯১
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা	২০২
	পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যবহারভিত্তিক অনুশীলন	২৩৭
	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহুমাত্রিক ব্যবহার	২৫৫
	সপ্তম পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিষয়ভিত্তিক অনুশীলন	২৬৫
	অষ্টম পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক অনুশীলন	২৬৯
	নবম পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অনুশীলন	২৭৯
তৃতীয় অধ্যায়	**ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: বাংলা ভূখণ্ড ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট**	
	প্রথম পরিচ্ছেদ: এশিয়ায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি	২৯০
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইউরোপে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি	২৯৯
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উত্তর আমেরিকায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি	৩০৩
	চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বাংলা ভূখণ্ডে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি	৩০৫

চতুর্থ অধ্যায়	**ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের সংস্কৃতি**	
	প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সৃজনশীলতা ও শিল্পসৌন্দর্য	৩২০
	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহিঃপ্রকাশ	৩২৭
	তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব	৩৩৬
সমাপনী	প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা	৩৪০
	উপসংহার	৩৪৪
	গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র	৩৪৮
	পরিশিষ্ট	৩৫৯

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

মানুষের চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, অনুভূতি ও লালিত ঐতিহ্যই মানুষের সংস্কৃতি। আর ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হলো সার্বজনীন মানবকল্যাণ সাধন। পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে ইসলামী শিল্পকলার অবদান অনবদ্য। ইসলামী শরীয়তে প্রাণীর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ থাকার পরও শিল্পীরা ক্ষণিকের জন্যও থেমে থাকেননি, থমকে দাঁড়ায়নি তাদের শিল্পচর্চা। বরং কল্পনার পাখায় ভর করে তারা নির্মাণ করেছেন সৃজনশীল, সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। ইসলামী শিল্পকলা যে সকল ধারায় বিকশিত হয়েছে তন্মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি বা সুন্দর হস্তলিপিকলা।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও আল-হাদীস তথা ইসলামের কোন বক্তব্যকে আলঙ্কারিকভাবে উপস্থাপন করাই ইসলামী ক্যালিগ্রাফি। এর আবেদন কালজয়ী ও চিরন্তন। কারণ এর শৈলী বা লিখনরীতি পরিমার্জিত ও সুষমামণ্ডিত। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় বারো শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ললিতকলা হিসেবে ক্যালিগ্রাফির চর্চা হয়েছে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। স্থাপত্য, চিত্রকলা, মৃৎপাত্র ও ধাতবপাত্রসহ ইসলামী শিল্পকলার অন্যান্য শাখার পাশাপাশি ইসলামী ক্যালিগ্রাফির যে উৎকর্ষ সাধিত হয় ও বিকাশ ঘটে তা বিশ্বের ললিতকলার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

হরফের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে মূলত তিন ধরনের লিপি বিদ্যমান। যথা- মুদাওওয়ার (مدور) বা গোলায়িত; মুছাল্লাছ (مثلث) বা কৌণিক এবং তাঈম (تعيم) বা গোলায়িত ও কৌণিক লিপির মিশ্রিতরূপ। আরবী ও ফারসী ভাষায় এসব ধারার অর্ধশতাধিক লিখনপদ্ধতি রয়েছে। যেগুলোকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলী বা লিখনরীতি বলা হয়। যেমন- কুফী, সুলুস, নাসখী, মুহাক্কাক, রায়হানী, তাওকী‘, রুক‘আহ, দিওয়ানী, তুঘরা, তা‘লিক, নাসতা‘লিক, শিকাসতা, ঘুবার, তুমার, মাগরিবী, বিহারী, কাশ্মীরী, সিয়াকাত, মুসালসাল, গুলজার, তাউস, সাক্কি, তাজ, জুলফ-ই-আরুস, খাত আল-মানসুর, খাত আল-হুর ও খাত আল-সুম্বুল ও মুসান্না লিপি ইত্যাদি।

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীসমূহ অত্যন্ত সুষমামণ্ডিত। এগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে ক্যালিগ্রাফারগণ আরো অধিকতর সৌন্দর্য বর্ধন ও উৎকর্ষ সাধন করেন। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশেই এসব শৈলীর চর্চা বিদ্যমান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে অনেক শিল্পী ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম নির্মাণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ফলে অনেক ক্যালিগ্রাফার অধিকাংশ শৈলী আয়ত্ত করে তার চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু কয়েকটি শৈলী তথা তাওকী‘, বিহারী,

তাউস, সাক্কি, তাজ, জুলফ-ই-আরুস, হুর ও সুম্বুল রীতিতে এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন ক্যালিগ্রাফার কোন শিল্পকর্ম সম্পন্ন করেননি। অনেকে এসব প্রচলিত নিয়মে ক্যালিগ্রাফি করতে সিদ্ধহস্ত নন। বরং তারা বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা ও শব্দসমূহকে শিল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তথা বেসিক আর্ট, রিয়েলস্টিক বেজ, পারসপেকটিভ সেন্স, অনুপাত, দর্শন, এবস্ট্রাক্ট ফর্ম, টেক্সচার, কালার কম্বিনেশন ও আলো-ছায়া ইত্যাদি অনুসরণে উন্মুক্তভাবে ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করেন। এসব ক্যালিগ্রাফি ট্রাডিশনাল ফন্টের অনুসরণে না হলেও শিল্পমানে উত্তীর্ণ।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যারা ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন- শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী সবিহ-উল আলম, শিল্পী মীর রেজাউল করিম, শিল্পী মনিরুল ইসলাম, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী এ.এইচ.এম বশির উল্লাহ, শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী কামরুল হাসান কালন, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী ভাস্কর রাসা, শিল্পী ফরেজ আলী, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার ও শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী প্রমুখ।

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চার বিস্তৃতি ও বিকাশে বাংলাদেশে কতিপয় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সংস্থা নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন- ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমদ মাইজভাণ্ডারী ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড, বাংলাদেশ চারুশিল্পী পরিষদ, সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার, সুবহা ক্যালিগ্রাফি এন্ড আর্ট একাডেমি, ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র ইত্যাদি। এসব সংস্থা বিভিন্ন সময় ঢাকাসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি নিয়ে গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, শিল্পীদের সরাসরি পেইন্টিং ও ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ এবং দেশী-বিদেশী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যা শিল্পের এ নন্দিত ভূবনে চিরন্তন, সত্য ও সুন্দরকে একদিকে যেমন চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছে; অন্যদিকে উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়েছে নবীন শিল্পীদের মাঝে। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এটি অন্তর্ভুক্ত

না হওয়ায় চমৎকার এ শিল্পটি তেমন বিকাশ লাভ করছে না। তবে নবীন শিল্পীদের প্রচণ্ড আগ্রহ ও আবেগ-উদ্বেলতা, তাদের শিল্পভাবনা এবং নিপুণতত্ত্ব অনুধাবনের প্রচেষ্টা অসীম দুয়ারকে করেছে উন্মুক্ত ও উম্মোচিত।

ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফির চর্চা হয়েছে। বিগত দুই যুগের বেশি সময় ধরে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেটসহ বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রতি বছরেই ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুবাদে বেশ কিছু গ্যালারি ও আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিল্পী ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা করে চলেছেন। অনেক শিল্পী বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থায় শিল্প নির্দেশনার কাজে রত থাকায় তাদের এ চর্চা অব্যাহত রয়েছে। অনেকেই আবার ক্যালিগ্রাফির উপর নিয়মিত প্রবন্ধ লিখছেন। কেউ কেউ আবার বইও প্রকাশ করছেন। সম্প্রতি কয়েকজন এর উপর গবেষণাও করছেন।

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি একটি পরিপূর্ণ শিল্প। শিল্পকলার যতগুলো দিক ও বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে এটি অত্যন্ত পরিশীলিত। শিল্প শুধু শিল্পের জন্য নয়, বরং সত্য ও সুন্দরের জন্য। ইসলামী শিল্পকলা- বিশেষ করে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্প সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সুনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, শুভ চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ও মানব চরিত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এসব শৈলী নীরবে মানব মনে নানা ভাব ও চিন্তার উদ্রেক করে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে- বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে ইসলামী শিল্পচর্চা হচ্ছে, প্রয়োজনীয় উৎসাহ উদ্দীপনা ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আশা করা যায় বাংলাদেশেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটবে। তবেই বিস্তৃত হবে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শিল্পব্যঞ্জনা এবং ছড়িয়ে পড়বে শিল্পবোধের অনন্য দ্যোতনা।

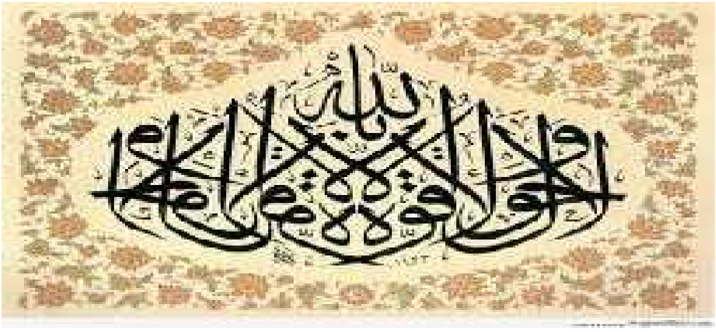

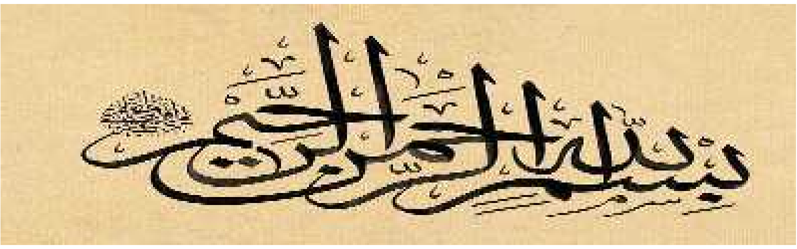

উপক্রমনিকা

ক. প্রেক্ষাপট

মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন [১]-اقرأ باسم ربك الذى خلق- خلق الانسان من علق...الذى علم بالقلم অর্থ- পাঠ কর! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি (তোমাকে) সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে।...যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। অন্যত্র বলেছেন [২]-والقلم وما يسطرون - ن অর্থ- নুন, শপথ কলমের এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার। মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতারিত এ আয়াতের মাধ্যমে কালি-কলম ও লেখনীর গুরুত্ব নিশ্চিত করা হয়। ইসলামী কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যেও লেখনীর মর্যাদা ফুটে উঠে। আরবী রোমান্টিক ও অলঙ্কৃত বর্ণনায় আরবী হরফের আকৃতিগুলোকে ভালবাসার দৈহিক রূপের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ রূপক বর্ণনার বৈচিত্র ইসলাম-পূর্ব আরবী কবিতায়ও দেখা যায়। বিখ্যাত কবি লাবীদ তাঁর কবিতায় মরুভূমির বৃষ্টির দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে- ‘তীব্র গতিতে বয়ে যাওয়া মরু নালা প্রাচীন জনপদের মুছে যাওয়া চিহ্নকে হঠাৎ উন্মোচন করে, যেমন করে পুরনো পাণ্ডুলিপির ধূসর লেখা কলমের মাধ্যমে নতুন করে ফুটে উঠে।’[৩] ইসলামী ঐতিহ্যে ক্যালিগ্রাফি নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক বার্তা বহনের চাক্ষুষ মাধ্যম। যা মাঝে-মধ্যে স্থাপত্য অলঙ্করণে প্রধান ভূমিকা পরিগ্রহ করে। এর শিলা লিপিগুলো যেমন বিষয়গত দিক থেকে সমৃদ্ধ, তেমনি লেখনি সৌন্দর্যেও অনন্য।

---

[১] *আল-কুরআন*, সূরা ‘আলাক, আয়াত: ১-৪

[২] *আল-কুরআন*, সূরা কালাম, আয়াত: ১

[৩] ফুআদ আফরাম আল-বুস্তানী সম্পাদিত, *তারাফা ওয়া লাবীদ* (বৈরুত: ১৯৬১), পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকলার ইতিহাসে ইসলামী শিল্পকলার অবদান অনবদ্য। ইসলামী শরীয়তে প্রাণীর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ থাকার পরও শিল্পীরা ক্ষণিকের জন্যও থেমে থাকেননি, থমকে দাঁড়ায়নি তাদের শিল্পচর্চা। বরং কল্পনার পাখায় ভর করে তারা নির্মাণ করেছেন সৃজনশীল, সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। ইসলামী শিল্পকলা যে সকল ধারায় বিকশিত হয়েছে তন্মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে ক্যালিগ্রাফি বা সুন্দর হস্তলিপিকলা। শিল্পীরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিখ্যাত কবিদের কবিতার চরণমালাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে শৈল্পিক রূপ দিয়ে শিল্পের এক অসাধারণ তৃপ্তি অনুধাবন করেছেন। চমৎকার লিপিশৈলী ও কলার মাধ্যমে একে একটি উচ্চাঙ্গ শিল্পে পরিণত করেছেন। যার জ্বলন্ত নিদর্শন হস্তলিখিত আল-কুরআনের শিল্পব্যঞ্জনা।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি নিয়ে গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, শিল্পীদের সরাসরি পেইন্টিং ও ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ এবং স্বদেশী ও বিদেশী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যা শিল্পের এ নন্দিত ভূবনে চিরন্তন, সত্য ও সুন্দরকে একদিকে যেমন চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছে; অন্যদিকে উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়েছে নবীন শিল্পীদের মাঝে। তাদের প্রচণ্ড আগ্রহ ও আবেগ-উদ্বেলতা, তাদের শিল্পভাবনা এবং নিপুণতত্ত্ব অনুধাবনের প্রচেষ্টা অসীম দুয়ারকে করেছে উন্মুক্ত ও উম্মোচিত। এ সময় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। সর্বপ্রথম গবেষণামূলক কর্ম সম্পাদন করেছেন অধ্যাপক ড. পারেস ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান। তাঁর কিছু রচনা ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় তার পিএইচ.ডি থিসিস 'Islamic Calligraphy in the medieval India'। এছাড়াও 'ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি' শিরোনামে তাঁর আরেকটি বই প্রকাশিত হয়, যা ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রথম বই। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ইসলামিক আর্টের উপর পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। ১৯৯৫ সনের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত 'মুসলিম লিপিকলা' শিরোনামে তাঁর এ বইটিতে ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস, ক্যালিগ্রাফারদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী এ বিষয়ে দু'টি বই লিখেন 'Select Arabic and Persian Epigraph' (১৯৮৮) ও 'মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প'। শিল্পী সবিহ-উল আলম 'লেখা থেকে রেখা' ও 'কারুকাজে জাদুকর' নামে দু'টি বই লিখেন। শিশুদের উপযোগী করে লেখা হলেও মূলতঃ এ দু'টি বইই গবেষণামূলক। 'আরবী লিপি ও ইসলামী হস্তলিপি কলা' নামে ড. আব্দুর রহমানের একটি রচনা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। জোবেদ আলী কর্তৃক অনুবাদকৃত এ রচনাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকায় জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উৎস ও প্রকাশ' শিরোনামে একটি অনুসন্ধানধর্মী রচনা লিখেন শিল্পী সাইফুল ইসলাম। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালেও বেশ কিছু প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। কিন্তু সমকালীন বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চার উপর বিশেষ কোন গবেষণা হয়নি। তাই ইসলামী শিল্পকলার এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। সাধারণ দর্শক ও পাঠকদের এ বিষয়ের নান্দনিক, ঐতিহাসিক ও উন্নয়নের ক্রমধারা জানা থাকলে এটি আরো গ্রহণযোগ্য এবং এর মাধ্যমে শৈল্পিক রসবোধ আহরণ সহজ হয়। তাই আমি এ বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ নিয়েছি।

খ. গবেষণার উদ্দেশ্য

বিবেক সম্পন্ন সত্তা হিসেবে প্রত্যেক মানুষই অনুভূতিপ্রবণ। তাই মানুষ মাত্রই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অনুভূতি প্রকাশের প্রয়াস পায় এবং অনুভূতির বাহ্যিক প্রকাশ শিল্পের রূপ ধারণ করে। আর ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে, সুন্দর আক্ষরিক অবয়বে অনুভূতি ও সুপ্ত প্রতিভার বাহ্যিক ও শিল্পরূপ। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় এটি সৌন্দর্য পিপাসু ও আর্ট সমঝদারদের নয়নে প্রশান্তির স্পর্শ এনে দেয়। ক্যালিগ্রাফির আক্ষরিক শিল্পরূপ মানুষের হৃদয়ে ভাবাবেগ সৃষ্টি করে এবং সুশৃঙ্খল ও অনুগত করে তুলে। এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তারকারী শিল্প সম্পর্কে এদেশের মানুষের ধারণার কমতি থাকায় শিল্পের এ নন্দিত ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি। এতদবিষয় অনুধাবন করত আমি বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে এবং নিম্নোক্ত কারণে এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি-

Dhaka University Institutional Repository

১. ইসলামী ক্যালিগ্রাফির পরিচিতি, গুরুত্ব ও মাহাত্ম তুলে ধরে সমাজে এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা;
২. এ শিল্পের বিকাশে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক সমাধানের উপায় বের করা;
৩. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অবদানসমূহ পর্যালোচনা করা;
৪. নতুন প্রজন্মকে এ শিল্পের প্রতি আরো অধিক আগ্রহী করে তোলা।

গ. গবেষণার পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিকে তথ্যবহুল, নিখুঁত এবং তথ্যসমূহকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য করার জন্য আলোচ্য গবেষণাকর্মে প্রধানত: ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, পর্যবেক্ষণমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও সমালোচনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে মূখ্য উপাত্ত ও গৌণ উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় মুখ্য উপাত্ত এবং ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, ক্যালিগ্রাফির উন্মেষ, ক্যালিগ্রাফির বিকাশধারা: প্রাথমিক যুগ, উমাইয়া যুগ, আব্বাসী যুগ ও আধুনিক যুগ সম্পর্কিত বিষয়ে গৌণ উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। মূখ্য উপাত্ত হিসেবে প্রশ্নপত্র, জরিপ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং গৌণসূত্র হিসেবে গ্রন্থাদি, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও দলীলাদি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ. উপাত্ত সংগ্রহ

প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এজন্য পাবলিক লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি লাইব্রেরি, জাতীয় জাদুঘর, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনার লাইব্রেরি (আরবী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, বিআইআইটি লাইব্রেরি, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ চারুশিল্পী পরিষদ, ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড, সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমদ মাইজভাণ্ডারী ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, সুবহা ক্যালিগ্রাফি এন্ড আর্ট একাডেমি, সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার, বিভিন্ন কওমী ও আলিয়া মাদরাসা, শরীফা আর্ট স্কুল-চট্টগ্রাম, অঙ্কন আর্ট স্কুল-ঢাকা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন আর্ট স্কুল ও কলেজ, খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফারদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি, বিভিন্ন প্রকাশনা ও গবেষণা সংস্থা, ওয়েবসাইট, ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং আমার নিকট দীর্ঘদিন থেকে সংগৃহীত ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক পেপার কাটিং, ক্যাটালগ, পোস্টার, হ্যান্ডবিল, ফোল্ডার, বাংলা, ইংরেজি ও আরবী ভাষায় রচিত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও জার্নাল হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। অভিসন্দর্ভটিতে যাদের ক্যালিগ্রাফি চর্চার কথা ও যে সকল প্রতিষ্ঠানের অবদানের কথা উল্লেখ করেছি; তাদের সাথে সরাসরি, ই-মেইল, ফেসবুক, ডাকযোগে, সাক্ষাৎকার ও ফোনে কথা বলে এবং বিভিন্ন ক্যাটালগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় প্রকৃত সমস্যাবলি চিহ্নিত করার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করে খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফারদের কাছে পাঠিয়েছি এবং তাদের প্রেরিত উত্তরপত্রের সাথে আমার চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে আমার গবেষণাপত্র প্রস্তুত করেছি।

ঙ. অভিসন্দর্ভের কাঠামো

আমার গবেষণাপত্রকে ভূমিকা, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট ও আনুষঙ্গিক বিষয় ছাড়াও চারটি অধ্যায় ও মোট বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। শেষাংশে গবেষণার আলোকে শিক্ষার্থী, ক্যালিগ্রাফার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবসম্মত প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা পেশ করেছি। বর্ণিত অধ্যায় সমূহের পরিচ্ছেদ ভিত্তিক বর্ণনা নিম্নরূপ:

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ে- ইসলামী ক্যালিগ্রাফির মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যাতে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে ক্যালিগ্রাফির শাব্দিক বিশ্লেষণ, প্রামাণ্য সংজ্ঞা, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, কিতাবাত, ক্যালিগ্রাফি ও হ্যান্ড রাইটিং স্টাইল এবং শিল্পকলা ও ক্যালিগ্রাফি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উন্মেষ ও বিকাশধারা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীসমূহের পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও সচিত্র প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির কর্মকৌশল তথা লিখনপদ্ধতি, কলম বানানোর পন্থা, কালির ব্যবহার, রং-এর বিভিন্নতা ও এর অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা, বিভিন্নমূখী ব্যবহার, ক্যালিগ্রাফির পরিপ্রেক্ষিত ও এর প্রাচীন পত্রসমূহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে- বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা ও বিকাশ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এতে মোট নয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফারদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের কার্যক্রম, চতুর্থ পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা, পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যবহারভিত্তিক অনুশীলন, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহুমাত্রিক ব্যবহার, সপ্তম পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিষয়ভিত্তিক অনুশীলন, অষ্টম পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক অনুশীলন এবং নবম পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অনুশীলন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে- বাংলা ভূখণ্ড ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা, অবস্থান ও বাস্তব চিত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে মোট চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে এশিয়ায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইউরোপে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, তৃতীয় পরিচ্ছেদে উত্তর আমেরিকায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাংলা ভূখণ্ডে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা ও বিকাশ শীর্ষক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে- বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিভিন্নমুখী প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মোট তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সৃজনশীলতা ও শিল্পসৌন্দর্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহিঃপ্রকাশ এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ক্যালিগ্রাফি, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এবং এর শৈলী ও

প্রথম পরিচ্ছেদ	ক্যালিগ্রাফির পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ক্যালিগ্রাফির উন্মেষ ও বিকাশধারা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলী

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফি নির্মাণের কর্মকৌশল

প্রথম পরিচ্ছেদ

১.১ ক্যালিগ্রাফির পরিচয়

১.১.১ ক্যালিগ্রাফির শাব্দিক বিশ্লেষণ

ইংরেজি শব্দ Calligraphy[৪] গ্রীক ভাষার Kallos ও Graphein শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। Kallos অর্থ সুন্দর বা চমৎকার আর Graphein অর্থ হস্তলিখন। সুতরাং ক্যালিগ্রাফি শব্দের অর্থ- সুলিখন, সুন্দর লেখা, সুন্দর হস্তলিখন, লিপিকলা, লিপিকৌশল,[৫] চারুলিপি, হস্তলিপি শৈলী, হস্তলিখন শিল্প, হস্তলিপি কলা, হস্তলিপি বিদ্যা, হস্তাক্ষর লিখন, সুন্দর লিখনশৈলী ও হস্তাক্ষর বিন্যাস ইত্যাদি। আরবী ভাষায় যাকে الخط, الكتابة, التحرير, الرقم, السطر, الزبر ইত্যাদি[৬] এবং ফারসীতে خوش خط, خوش‌نویسی বলে।[৭] ইংরেজিতে বলা হয়- Fair hand writing, Elegant

---

[8] From the Greek word for ‘Beautiful writting’ Calligraphy was considered the highest art form in Islam, for several reasons. For one, Muslims believe that Allah used the Arabic language to recite the Quran to Muhammad, and for the reason, It has a spiritual meaning for Muslims. Also, using words as artisty avoided the problem of using pictorial images. (Abdel Kader Khatibi, The Splendour of Islamic Calligraphy, London, Thames and Hudson, 1979)

[৫] নরেন বিশ্বাস, *বাংলা উচ্চারণ অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ.৪২০।

[৬] মুহাম্মদ তাহির ইবনু আব্দুল কাদির আল-কুরদী আল-মাক্কী, *তারিখুল খাত্তিল ‘আরাবী ওয়া আদাবিহী* (আল-মাকতাবাতুল হিলাল: ১৯৩৯), পৃ.৭।

[৭] http://dictionary.onepakistan.com.pk.

Dhaka University Institutional Repository

Penmenship, Beautiful writing, Art of beautiful writing, The Art of fancy lettering ইত্যাদি।[৮]

১. আল-মাওরিদ (المورد) অভিধানে আছে- الخط[৯], حسن الخط, الخط اليد ও علم الخط ইত্যাদি।[১০]

অতএব লিপিশিল্পে যিনি পারদর্শী তাকে আরবীতে খাত্তাত (خطاط) এবং ইংরেজিতে ক্যালিগ্রাফার (Calligrapher) বলে।

২. Encyclopedia of World Art গ্রন্থে আছে- Elegant Penmenship.[১১]

৩. Oxford Advanced Learners Dictionery তে আছে- Hand writing as an art, Beautiful hand writing etc.[১২]

৪. Illustrated Oxford Dictionery তে আছে- Hand writing especially when fine. The Art of hand writing.[১৩]

৫. Cambridge Advanced Learners Dictionery তে আছে- Beautiful writing, often created with a special pen or brush.[১৪]

১.১.২ ক্যালিগ্রাফির প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. শায়খ শামসুদ্দিন ইবনুল আক্‌ফানী তাঁর رشاد القاصد الى أسنى المقاصد। গ্রন্থে বলেন-

---

[৮] *Mediavilla-1996:17*, en.wikipedia.org/wiki.mic

[৯] খত্ত: এর মূল অর্থ হলো মাটিতে অঙ্কিত বা খোদিত রেখা অথবা লাঠি কিংবা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বালুর উপর অঙ্কিত রেখা। প্রথমত এ শব্দটি কবর খনন অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে এটি 'রেখা টেনে রাস্তা ও গলির সীমানা নির্ধারণ' অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। অবশেষে এটি স্কেলের সাহায্যে কাগজ বা চামড়ার উপর অঙ্কিত রেখা অর্থে এবং পুস্তকের ছত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে তা যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সড়ক, নৌপথ, টেলিফোন লাইন, টেলিগ্রাফ লাইন বা আকাশপথ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া বর্তমানে শব্দটি লিপিকলা বা লিখনপদ্ধতি এবং বর্ণের বিভিন্ন আকৃতি বা রূপ অর্থে মৌলিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। (ড. আহমদ আলী, *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭), পৃ.৮-৯।

[১০] *আল-মাওরিদ*- ইংরেজি-আরবী অভিধান-১৯৬৭, বৈরুত, লেবানন, পৃ.১৩২।

[১১] *Encyclopedia of World Art*

[১২] *Oxford Advanced Learners Dictionery*, 4th Edition (London: Oxford University Press, 2011), p.148.

[১৩] *Illustrated Oxford Dictionery*, Oxford, Newyork.

[১৪] *Cambridge Advanced Learners Dictionery* (Cambridge University Press, 2008), p.195.

Dhaka University Institutional Repository

’علم تعرف منه صورالحروف المفردةوأوضاعها وكيفية تركيبها خطا,و ما يكتبه منها فى السطور ـ وكيف سبيله ان يكتب، ومالايكتب، وإبدال ما يبدل منها فى الهجا، وبماذا يبدل-‘[১৫]

২. تاريخ الخط العربى وآدابه নামক গ্রন্থে আছে-

’الخط علم يعرف به أحوال الحروف فى وضعها وكيفيية تركيبها فى الكتابة-‘

৩. كتاب صبح الاعشى নামক গ্রন্থকার বলেন-

’ المفردالخط ما تتعرف منه صورالحروفة-‘[১৬]

৪. Mediavilla-1996:17 তে আছে- ‘The Art of giving from to sign in an expressive, harmonious and skillfull manner.’[১৭]

৫. Encyclopedia Britanica তে আছে- ‘The art of beautiful or elegant hand writing as exhibited by the correct formation of characters the ordinary of the various parts and harmony of proportions.’[১৮]

৬. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন- ‘Calligraphy is the Art of penmenship, inspired by devine will, Calligraphy is now a global art practised by eminant and devoted calligraphers throughout the muslim world.’[১৯]

৭. প্রখ্যাত মুসলিম লিপিকার ইয়াকুত আল-মুস্তা‘সিমী বলেন- ‘ক্যালিগ্রাফি এক ধরনের আধ্যাত্মিক জ্যামিতি বা নক্‌শা যা বিশেষ ধরনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।’[২০]

৮. আর্ট এণ্ড সিভিলাইজেশন নামক গ্রন্থে আছে- ‘কলম বা তুলির সাহায্যে কাগজ বা এ জাতীয় উপাদানের উপর হস্তাক্ষর, যা একই সাথে শৈল্পিক ডিজাইন এবং ফর্ম তুলে ধরে তাই ক্যালিগ্রাফি।’[২১]

---

[১৫] কামিল সালমান আল-জাবুরী, *মাওসূ‘আতু আল-খাত্তুল আরাবী- আল-খাত্তুল কুফী* (দার ওয়া মাকতাবাতু হিলাল, ১৯৯৯), পৃ.১৯।

[১৬] *তারিখুল খাত্তিল ‘আরাবী ওয়া আদাবিহী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮।

[১৭] *Mediavilla-1996:17*, en.wikipedia.org/wiki.

[১৮] *Encyclopedia Britanica*.

[১৯] মুহাম্মদ নূরুর রহমান, *আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, ২০০৫), পৃ.৬।

[২০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: মজিদ পাবলিকেশন, ২০০৫), পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

৯. শহীদুল্লাহ এফ. বারী বলেন- ‘নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও শিল্পকলার সৌন্দর্যের মাপকাঠি অনুসরণ করে আরবী অক্ষরে লেখা হস্তলিপিকে আরবী ক্যালিগ্রাফি বা আরবী লিপিকলা বলা হয়।’[২২]

১০.অধ্যাপক নাসির মাহমুদ ক্যালিগ্রাফি ও আধুনিক শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন- ‘Oriental Art আজন্ম Decorative বা অলঙ্কারবাদী। আর অলঙ্কারের উদ্দেশ্য হলো- Asthatic sence কে জাগৃতি দান। ফলে অলঙ্কৃত বস্তু যদি মানুষের নান্দনিক মনের সুক্ষ্মকোণে নিজস্ব সুন্দরের অস্তিত্বকে নীরবে কিংবা সরবে ধীরে সুস্থে হলেও প্রামাণ্য করে তুলতে সক্ষম হয়, তাহলেই তা শিল্প। আর ক্যালিগ্রাফি ঠিক তেমনি এক শিল্প।’[২৩]

১১.তিনি আরও বলেন- ‘ক্যালিগ্রাফি চিরচেনা বস্তুর অচেনা ব্যাঞ্জনাসহ এক প্রাচ্য শিল্পকলা। সুতরাং এর নির্মাণ বৈজ্ঞানিক অর্থে অপূর্ব।’[২৪]

১২.ড. আহমদ আলী বলেন- ‘লিপিকলা যখন একাধারে ভাষার বাহ্যিক রূপ, অন্তস্থিত ভাব ও দৃশ্যমান শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে রচিত হয় এবং দর্শকদের মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত করে অবচেতন মনে দোলা দিয়ে যায়, তখন তা ক্যালিগ্রাফি হয়ে ওঠে।’[২৫]

১৩. ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী বলেন- ‘কোন ভাষার বর্ণমালা সাধারণভাবে লেখার পরিবর্তে গতিময় করে তোলার এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসে সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পরিবর্ধন করে উপস্থাপনের পারিভাষিক নাম হলো ক্যালিগ্রাফি।’[২৬]

ক্যালিগ্রাফি ইসলামী সংস্কৃতি প্রকাশের শক্তিশালী একটি মাধ্যম। যা যুগে যুগে মানব সভ্যতার অগ্রগতির বার্তা বহন করে আসছে। ইসলামী সংস্কৃতিতে লিখিত বাক্যের একটি পবিত্রতম স্থান

---

[২১] নাসির মাহমুদ, ‘শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি’, *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০*, পৃ.২।

[২২] শহীদুল্লাহ এফ. বারী, ‘এসো আরবী শিখি’, *ক্যালিগ্রাফ আর্ট*, ব.১, স.১, আগস্ট-২০০৩, পৃ.৬।

[২৩] *শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২।

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ.২।

[২৫] *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫।

[২৬] *ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৫ (ঢাকা: আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক), পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। কেননা কুরআনের আয়াতের লিখিত রূপ আল্লাহ তা'আলার বাণীর চাক্ষুষ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মূর্তমান। তাছাড়া মানব ইতিহাসের অধিকাংশ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থই বিভিন্ন যুগে লৈখিকভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। ক্যালিগ্রাফি শিল্পটি নান্দনিক রসসিক্ত, বর্ণ লেপনের কুশলতা, আত্মনিবেদনের ভাব, হৃদয় দোলানো সৌন্দর্যমণ্ডিত, সুন্দরের প্রতীক এবং চারুশিল্পের অনন্য মাধ্যম।

১.১.৩ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

'Islamic calligraphy is the beautiful writting of the Arabic script. It has been the main Islamic art since the Quran's revelation (610 AD). It has helped continues to help preserve the beautiful words of the Quran.'[২৭]

মনের আবেগ, অনুভূতি ও চেতনা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে লিখিত বক্তব্যকে নান্দনিক ও শৈল্পিকরূপে উপস্থাপন করাই ক্যালিগ্রাফি। আর উপস্থাপিত বক্তব্যগুলোর মাধ্যম যে ভাষাই হোক না কেন, তা যদি ইসলামী বিষয় তথা কুরআনের আয়াত, হাদীসের বাণী কিংবা ইসলামের চেতনা সম্বলিত কোন বিষয়ের উপর সম্পন্ন করা হয় তাহলে তাকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি বলে।

Wikipedia তে আছে- 'Islamic calligraphy is the artistic practice of handwriting and calligraphy, based upon the Arabic language and alphabet in the lands sharing a common Islamic cultural heritage.'[২৮]

কেউ কেউ বলেন- পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীসের উদ্বৃতি ও ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন সাহিত্যের অংশবিশেষ যে কোন ভাষায় শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করাকেই ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

---

[২৭] *Catalogue of winner's plates in the First International Calligraphy Competition in the name of Abn-el-Bawwab,* (Istanbul: International commission for the Preservation Islamic cultural haeritage, 1996).

[২৮] *Wikipedia,* the free encyclopedia Islamic calligraphy.

Dhaka University Institutional Repository

বলে। ইসলামই ক্যালিগ্রাফিকে স্বতন্ত্র শিল্পের মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছে এবং নিজস্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।[২৯]

ক্যালিগ্রাফি ইসলামী শিল্পকলার অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। এটি ছাড়া ইসলামী শিল্পকলার কথা কল্পনাই করা যায় না। মধ্যযুগে কুরআনের বাণী দিয়ে মুদ্রার উপর ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা গেছে। বিভিন্ন যুগে বিশেষত মুঘল মিনিয়েচারে, মসজিদগাত্রে, মিনারে, মিহরাবে ও গম্বুজের গায়ে এর সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে পারস্যের পূর্বদেশের মৃৎপাত্রসমূহে উন্নত মানসম্পন্ন এক ধরনের শৈলীসম্পন্ন ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। যাকে 'এপিগ্রাফিক ওয়্যার' বলে। যা ছিল পারস্যের মৃৎশিল্পের সবচেয়ে সুক্ষ্ম, স্পর্শকাতর ও শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। Jafar Hasan বলেন- 'Calligraphy has played a conspicuous role in the field of decorative art, Inscriptions artistically written formed decorative feature in Muslim architecture.'[৩০]

একজন মুসলিম ক্যালিগ্রাফারের প্রথম ও প্রধান উৎসাহ-উদ্দীপনার স্থল হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। মহান আল্লাহর বাণী তাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। ক্যালিগ্রাফিতে সে আত্মিক সমর্থন ও সহযোগিতা এ গ্রন্থ থেকে পায়। পবিত্র কুরআনে আছে- يقلب الله الليل والنهار-[৩১] অর্থ- মহান আল্লাহ তা'আলা দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এই যে দিন ও রাতের পর্যায়ক্রমিক আগমন। ঠিক যেন সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে অবিরাম লিখে যাওয়া। কুরআনের বাণীর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য একজন ক্যালিগ্রাফারকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে। আল্লাহ তা'আলা নিজেকে একজন মহান শিল্পী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। একজন ক্যালিগ্রাফার নিজেকে সেই মহান শিল্পীর প্রতিনিধি মনে করেন।[৩২] কুরআনের বাণীই হলো মূলত ইসলামী ক্যালিগ্রাফির মূল প্রতিপাদ্য

---

[২৯] *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

[৩০] Jafar Hasan, *Muslim Calligraphy, Indian Art and Letters,* N S vol.ix, no.I, p.61.

[৩১] *আল-কুরআন*, সূরা আন-নূর, আয়াত-৪৪।

[৩২] Shamsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal* (Rajshahi:1960), vol.II, p.17.

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়। যা আরবী ভাষায় লেখা হয়। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে পারস্যে ব্যবহৃত হত ফারসী ভাষা। পরবর্তীতে তুর্কী ও উর্দূ ভাষায়ও ক্যালিগ্রাফি করা হয়। তাই ইসলামী শিল্পকলায় ক্যালিগ্রাফারদের মর্যাদা ছিল অন্যান্য সব শিল্পীদের চেয়ে উপরে।

হরফের সৌন্দর্য চর্চার নাম ক্যালিগ্রাফি। ইসলামী সভ্যতায় এই ক্যালিগ্রাফি এক বিশেষ প্রেরণার দাবিদার। এটি সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক প্রেরণা জোগায়। প্রাক-ইসলামী যুগেও কাবা শরীফের শোভাবর্ধক আরবী শিলা লিপিগুলোতে হরফ অলঙ্কারের বৈচিত্র ছিল। মক্কা-মদীনায় খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় সেই ট্রাডিশন অনুসরণ করেই ইসলামের প্রথম যুগের ক্যালিগ্রাফারগণ বিশেষ হরফগুলোর অলঙ্কার বৃদ্ধি করে এবং বাক্য গঠনের ধারাবাহিকতায় লীলায়িত ছন্দের কাব্যিক অবলম্বন বজায় রেখে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সূত্রপাত ঘটান।

ইসলামী স্থাপত্য প্রথম থেকেই স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। এর খিলান, গম্বুজ, মিনার, খোলা চত্তর, মিহরাব, এরাবেস্ক নক্শা ও কুরআনের আয়াত সম্বলিত জৌলুসপূর্ণ ক্যালিগ্রাফি সবই এক অনন্য স্বতন্ত্রে ভাস্বর। মুসলিম স্থপতিরা তাদের অভূতপূর্ব সৃজনশীলতা, প্রজ্ঞা ও আল্লাহর প্রতি প্রচণ্ড আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে এসব নির্মাণ করেছেন।[৩৩] ক্যালিগ্রাফাররা সুন্দর লিপির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরফের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। হিব্রু, গ্রীক ও ল্যাটিন বর্ণমালায় ক্যালিগ্রাফির ছকে আলঙ্কারিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। আরবী বর্ণমালার লম্বদণ্ড ও বক্রাকার ছাঁচ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে লিখনকে উপস্থাপিত করে করার পক্ষে সহায়ক। এর সঙ্গে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে ধর্মীয় অনুশাসন যুক্ত হয়েছে।[৩৪]

আরবী ভাষা পবিত্র কুরআনের ভাষা হওয়ায় এর প্রতি অনুরাগ পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষের। Anthony Welch (1979) লিখেছেন- ‘The primary reason for the chronological, social

---

[৩৩] ড. মো. রফিকুল আলম, *ইসলামী সভ্যতা ও শিল্পকলা* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪), পৃ.৬৭-৬৯।
[৩৪] *ক্যালিগ্রাফি: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২।

Dhaka University Institutional Repository

and geographic persuasiveness of the calligraphic arts in the Islamic world is found in the holy Quran.'[৩৫] আরবী ভাষায় ক্যালিগ্রাফির চর্চা অনেক দিন আগের। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী, পরিশীলিত, নান্দনিকতায় চুড়ান্ত, বিমূর্ততায় অপূর্ব ও পবিত্রতায় ভাস্বর। এতে রয়েছে শিল্পী মনের এক অদ্ভুত সৃজনশীলতা, মমতা, বিশ্বাস আর ও সম্মোহনী আকর্ষণ। শিল্পকলার বহুমাধ্যম আছে, আছে প্রকাশরীতি বা ঢং। ক্যালিগ্রাফিও তাই। শিল্পকলার বিমূর্ত আন্দোলনের অন্যতম প্রভাব ছিল ইসলামী ক্যালিগ্রাফি। জীব-জন্তু, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়বস্তু ব্যতিরেকে যে চিত্রকলা নির্মাণ সম্ভব, তা ইসলামী ক্যালিগ্রাফার ও ভাষাবিদগণই তা দেখিয়েছেন। এ মতবাদ পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন এবং এর প্রমাণও দেয়া সম্ভব।[৩৬]

আরবী হরফের সহজ, সরল ও ছন্দময় গতি, উল্লম্ব রেখা ও সমান্তরাল আঁচড়ের নমনীয়তা লিপিকারের জন্য এনে দেয় সৃজনশীলতার এক অপার সম্ভাবনা। যার ফলে সে সৃষ্টি করতে পারে অসংখ্য চতুষ্কোণ চক্র, ডিম্বাকৃতি রেখা, ঘনক, ফাঁস ইত্যাদি। পরস্পরের সঙ্গে জড়িত রেখা ভারসাম্য, সাবলীল ও শিল্পচাতুর্যে অতুলনীয়। আনুভূমিক কায়দায় সজ্জিত হরফগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে চলমান রেখাগুলোর সাথে মিশে যায়। আর উল্লম্ব হরফের রেখাগুলো সমভাবে অঙ্কিত হয়ে সম্প্রসারিত হরফগুলোর মাঝে কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এগুলো দেখে মনে হয় যেন, আমাদের দৃষ্টিকে অতীন্দ্রিয় ঊর্ধ্বযাত্রার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। মোটকথা এ ভাষার প্রত্যেকটি বর্ণের আকৃতি ও প্রকৃতিগত চরিত্র এমন যে, এরা একেকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।[৩৭] 'Arabic Calligraphy is the artistics practice of hand writing and by extention of bookmarking in the land sharing a common Islamic cultural heritage.'[৩৮]

---

[৩৫] *Catalogue of winner's plates in the First International Calligraphy Competition in the name of Abn-el-Bawwab,* Ibid.

[৩৬] *ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৩ (ঢাকা: বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি), পৃ.২।

[৩৭] নাসির আহমেদ খান, *ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও বিকাশ*, পৃ.২।

[৩৮] *Bloom1999*, p.218.

Dhaka University Institutional Repository

হস্তলিখনের ধারাক্রমের মধ্য দিয়ে একজন শিল্পী একসময় পূর্ণাঙ্গ শিল্পী হিসেবে পরিণত হন। আরবী হস্তলিখন শিল্প ভিন্ন প্রকৃতির। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্প। আরবী হরফের চারটি রূপ যথা- সমান্তরাল, লম্ব, বৃত্ত, বৃত্তের ভগ্নাংশ এবং অবশেষে একটি ফ্লো বা প্রবাহ। শিল্পীরা নানান ব্যঞ্জনায় এ ক'টি আকৃতিকে রূপ দিয়ে থাকেন। জাপান কিংবা চীনা শিল্পের ক্ষেত্রে হস্তলিখন শিল্পচর্চার যে বিশিষ্টতা আরবী হরফের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা থেকে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্নরকম।[৩৯] হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (সা.) বলেছেন- তোমরা আরবদের তিন কারণে ভালবাসবে। যেহেতু আমি নিজে আরব, কুরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাতের ভাষাও আরবী।[৪০] ইসলামী সভ্যতায় আরবী হরফের প্রতি মুসলমানদের আধ্যাত্মিক টান বরাবরই দেখা যায়। কেননা এগুলো আল্লাহ তা'আলার পাঠানো বাণীকে হুবহু বহন ও সংরক্ষণ করে আসছে। এর মাধ্যমেই যুগে যুগে ইসলামী বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও দর্শনকে ধরে রেখেছে। ইসলাম প্রাণীর চিত্রায়ন বা মূর্তির ভাস্কর্যকে সমর্থন না করায় সে স্থানকে দখল করে নিয়েছে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি। যা ধর্মীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে।[৪১] রাসূল (সা.) বলেন- ان الله جميل ويحب الجمال অর্থ- আল্লাহ নিজে সুন্দর, আর তাই তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন।[৪২] রাসূল (সা.)-এর এ হাদীস প্রতিটি মুসলমানের মানসপটে নান্দনিক চেতনাকে ফুটিয়ে তুলে এবং ক্যালিগ্রাফিকে একটি পরিপূর্ণ কলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।[৪৩] এটি প্রথম থেকেই ইসলামী সংস্কৃতিতে একটি শৈল্পিক রূপ পরিগ্রহ করে।

শিল্প মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায়। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নির্দেশনা দেয়। ইসলামের প্রথম দিকেই প্রাণীর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ করা হয়। তখন শিল্পীরা রাসূল (সা.)-এর নিকট

---

[৩৯] *ক্যাটালগ: ১ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯* (ঢাকা: সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র), পৃ.১।

[৪০] ইমাম বায়হাকী, *বায়হাকী শরীফ*, শুয়াবুল ঈমান

[৪১] W. Lents Tomas, *Arab and Iranian Arts of the book, Arts of Asid* (November-December:1987, p.76.

[৪২] ইমাম মুসলিম (রহ.), *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাব ৩৯, নং ২৬৫/১৪৭।

[৪৩] Ettinghausen, *Al-Ghazzali on beauty, Islamic Art and Architecture* (Newyork: Garland Library of the history of the Art, 1979, p.162.

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এখন কী করব? তখন রাসূল (সা.) তাদেরকে ৪টি উপাদানের মাধ্যমে শিল্প চর্চা করতে বললেন-

১. উদ্ভিদীয় পরিকল্পনা তথা ফুল ও লতা-পাতা

২. জ্যামিতিক আকার-আকৃতি ও রেখা

৩. আরবী বর্ণমালা লিখন বা ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

৪. বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র রং-এর ব্যবহার।[৪৪]

মুসলিম ক্যালিগ্রাফারগণ সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন। রাসূল (সা.)-এর সময় কুত্তাব আল-ওয়াহী (كتاب الوحي) এবং পরবর্তীকালে রাজ-দরবারগুলোতেও ক্যালিগ্রাফারগণ বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। ক্যালিগ্রাফি বা লিখনী চর্চার কার্যক্রম শুধু তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এর পরিধি ছিল অনেক ব্যাপক, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাকেও স্পর্শ করে। নিজামুল মুলক তাঁর বিখ্যাত 'নাসাইহুল মুলক' গ্রন্থে লিপিশৈলীর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে- রাজার হাতের সুন্দর লেখা রাজকীয় মর্যাদাকে আরো সমুন্নত করে। তাঁর নিকট কলমের চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছু ছিল না।[৪৫] রাসূল (সা.) বলেন, 'রাজাদের রাজকীয় সৌন্দর্য ফুটে উঠে তাদের সুন্দর হাতের লেখার মাধ্যমে।' তাই মুসলিম বিশ্বের অনেক রাজা তাঁর পরিবারের সদস্যগণ শুধু ক্যালিগ্রাফি চর্চাই করেননি বরং অনেকেই শ্রেষ্ঠত্বও অর্জন করেছেন। ভারতের সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ অবসর সময়ে স্বহস্তে কুরআনের অনুলিপি তৈরি করে তা বিক্রি করতেন এবং তা দিয়ে ব্যক্তিগত খরচ মিটাতেন।[৪৬]

---

[৪৪] মাহফুজা ঝর্ণা, *সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিরকের প্রভাব* (ঢাকা: ওয়ামী, বাংলাদেশ অফিস, ২০০৭), পৃ.৬৩।

[৪৫] F R C Begle, *Counsel for Kings* (London:1964), p.112.

[৪৬] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-লাওয়াতী, *রিহলাহ ইবন বতুতা* (বৈরুত:তা বি), পৃ.৪২৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিল্পকলায় হরফের ব্যবহার করা হয়েছে নক্‌শাকলার অঙ্গ হিসেবে। এর ব্যবহার করা হয়েছে প্রধানত হরফের সৌন্দর্যের জন্য এবং কোন জিনিসের বাস্তবতাকে চিত্রিত করার জন্য নয়। অবিমিশ্র আলো-ছায়াবিহীন উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার ইসলামী শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য।[৪৭] শুধু আলঙ্কারিক লিপিমালায় নয়, বরং মুসলিম শিল্পকলা থেকে আহরিত অন্যান্য আলঙ্কারিক মোটিফ খ্রিস্টান ইউরোপের অসংখ্য কারুশিল্পে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৪৮]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) গুরুত্বপূর্ণ লিখনকার্য সম্পন্ন করার জন্য অনেককে নিযুক্ত করতেন। যারা বিভিন্ন বিষয়ের লিখনকার্য সম্পাদন করার জন্য রাসূলের দরবারে সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। মূলত তখন মদীনায় একটি পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় গড়ে উঠেছিল। হযরত আলী (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) প্রমুখ সাহাবী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন লিপিবদ্ধকরণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) ও জহম ইবনুস সালত (রা.) ছিলেন যাকাত-সদকা প্রভৃতির সম্পদের হিসাবরক্ষক। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আকরাম (রা.) ও আল 'উলা ইবনে উকবা জনগণের পারস্পারিক লেনদেন, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি বিষয়ক দলীলাদি লিখতেন। হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) খেজুর ফসলের পরিমাণ ও তার উপর ধার্য যাকাতের পরিমাণ অনুমানপূর্বক লিখে রাখতেন। হযরত মুয়াইকাব ইবনে ফাতিমাদসী (রা.) রাসূলে কারীম (সা.)-এর প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন। তাছাড়া রাসূল (সা.)-এর সময়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নাম ও পরিচিতিও লিপিবদ্ধ করা হত। দরবারের কোন লেখক অনুপস্থিত থাকলে হযরত হিলযিলা (রা.) তাঁর স্থলে কাজ করতেন। তিনি রাসূল (সা.)-এর সিলমোহর ব্যবহার করতেন ও ধারণ করতেন।[৪৯]

---

[৪৭] এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮), পৃ.১৬।

[৪৮] Nabil F. Safwat, *The Art of the pen: Calligraphy of 14th centuries,* (London: Oxford University Press,1996), p.40.

[৪৯] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২), ৭ম প্রকাশ, পৃ.১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীগুলোর মৌলিক উপাদানগুলো যুগের পর যুগ পুনরাবৃত্তি হয়ে আসছে। অথচ এর বার্তাগুলোর উপযোগিতা কখনও শেষ হয়নি এবং তা হবে না। পবিত্র কুরআনে সেই কথাই ঘোষণা দিচ্ছে-[৫০] ولو أنما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمت اللة- ان الله عزيز حكيم- অর্থ- পৃথিবীর সব বৃক্ষ যদি কলম হত আর সাত সমুদ্র কালি হত, তবুও মহান আল্লাহর বাণীগুলো লিখে শেষ করা যেত না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাত্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির খাঁড়া লেখাগুলো আল্লাহর লিখিত রূপ, যেখানে শক্তিশালী উল্লম্ব রেখাগুলো লেখার মূল কাঠামোর উপর ছাপিয়ে উঠে। আরবী ভাষায় একটি সরল খাঁড়াদণ্ড 'এক' সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। তেমনিভাবে 'আলিফ' বর্ণের সংখ্যাতাত্ত্বিক মূল্যও 'এক'। ফলে এটা সর্বদা একই থাকে। এমনকি এটাকে আরেকটি এক দিয়ে অসংখ্যবার গুণ করলে এক-ই থেকে যায়। যাতে তাওহীদ বা মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতীকী বার্তা বহন করে। ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে ধারালো তরবারির ন্যায় উল্লম্ব হরফগুলো ইসলামের গতিশীলতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি ইঙ্গিত করে। মসজিদ স্থাপত্যগুলোতেও আল্লাহর লিখিত রূপ মিনার ও গম্বুজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলেও মসজিদের মিনারগুলোকে 'আলিফ ও লাম' এবং গম্বুজকে 'হা' হরফ হিসেবে কল্পনা করা যায়। তাই ধর্মীয় প্রতীক, অলঙ্করণের স্থান ও উপাদান ইসলামী ক্যালিগ্রাফির এক শৈলীর চেয়ে অন্য শৈলীতে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে।[৫১] ইসলাম আরবী ভাষা ও লিপির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ায় পৃথিবীর যেখানেই ইসলাম পৌঁছেছে সেখানেই আরবী ভাষা ও লিপির চর্চা শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আর্নস্ট ক্যাহেনল বলেন- 'দ্বীন ইসলাম আরবদেরকে ভাষা ও লিপি দুই-ই দান করেছে। আরবী লিপি পুরো ইসলামী বিশ্বে প্রসার লাভ

---

[৫০] *আল-কুরআন*, সূরা লুকমান, আয়াত-২৭।

[৫১] *Indian Epigraphy: Its bearings on the History of Art*, Edited- Fredaric M Ash & G S I Goi (New Dilhi:1985), p.283.

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। ফলে তা ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে সকল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের বন্ধনরূপে কাজ করে থাকে।'[৫২]

বিশ্বব্যাপী সর্বত্রই মুসলিম ক্যালিগ্রাফারগণ মসজিদসমূহে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বিশিষ্ট লেখা দ্বারা অলঙ্কৃত করে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করেন। ভারতবর্ষের পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ এলাকায় ইসলামের বিস্তৃতির ফলে ইসলামে নবদীক্ষিতদের অনেকের জন্য মহান স্রষ্টার আকার-আকৃতি চিন্তা করা কঠিন। আল্লাহ্ শব্দের আরবী লিখিত রূপ ছিল তাদের মানসিক জগতে মহান আল্লাহর প্রতীকী রূপ। যা ছিল তাদের সান্ত্বনার বড় উৎস। এটি তাদেরকে স্রষ্টার চিন্তা ও ধ্যানে থাকতে সাহায্য করত। তাছাড়া ইসলামের স্থাপত্যে কুরআনের আয়াত সম্বলিত শিলালিপির ব্যাপক ব্যবহারও মুসলিম ধর্মীয় আবেগের বহিঃপ্রকাশ। তাই ঈমানদারগণ কুরআনকে শুধু তিলাওয়াত, মুখস্ত, বুঝা ও চর্চার মধ্য সীমাবদ্ধ রাখেন না বরং একইসঙ্গে তারা ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে এর নান্দনিক সৌন্দর্যও উপভোগ করেন।

১.১.৪ কিতাবাত, ক্যালিগ্রাফি ও হ্যান্ডরাইটিং স্টাইল

কিতাবাত (كتابت) অর্থ লিখন বা লেখা। আর ক্যালিগ্রাফি অর্থ সুন্দর হস্তলিখন। শব্দ দু'টির অর্থ প্রায় একই হলেও উভয়ের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিতাবাত-এর সংজ্ঞায় رسالة الخط গ্রন্থপ্রণেতা বলেন--الكتابة هى رسوم وإشكال تدل على ما فى النفس দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ যে সকল লেখা লিখে থাকে তা যদি পরিশীলিত ও পরিমার্জিতভাবে উপস্থাপন করা হয় তবে তাকে বলা হয় কিতাবাত। রাসূল (সা.) এর উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত অহী যারা

---

[৫২] আর্নস্ট ক্যুহেনল, *ফান্নুল খাত্তিল আরাবী* (বৈরূত: তাবি), পৃ.২।

Dhaka University Institutional Repository

লিপিবদ্ধ করতেন তাদেরকে কাতিবে অহী বলে। আর এ লেখনশিল্পকে কিতাবাত বলে। তৎকালীন যুগে মুদ্রণযন্ত্র না থাকায় কিতাবাত ছিল লিখনকর্মে নিয়োজিতদের পেশা। বইয়ের কপি করার মাধ্যমে তাদের লেখা স্পষ্ট, সুন্দর ও শিল্পোচিত হয়ে উঠত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই কিতাবাত এর প্রচলন দেখা যায়। ব্যক্তিগত চিঠি, অফিসিয়াল লেখালেখি ও রাজকীয় ফরমান লেখার জন্য কিতাবাত এর ব্যবহার বিদ্যমান ছিল।

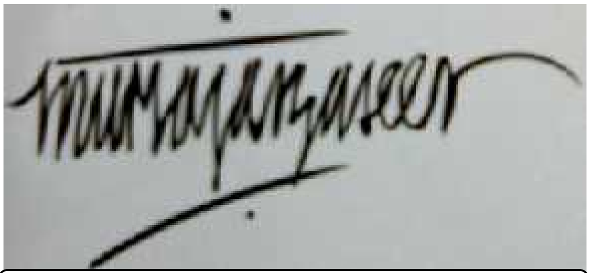

চিত্র-১: শিল্পী মুর্তজা বশীরের দস্তখত বা স্বাক্ষর

শিল্পমণ্ডিত হস্ত লিপিকলাকে আরবী ভাষায় ‘খত’ বলে। ফারসী ভাষায় দস্ত অর্থ হাত। এই দস্ত ও খত শব্দের সমন্বিত রূপ ‘দস্তখত’। এটি অনেক আগে থেকেই বহুল অর্থ স্বাক্ষর। সুন্দর দস্তখতও একটি ফ্রি-হ্যান্ড ক্যালিগ্রাফি। কোন ব্যক্তি তার নামের যে স্বাক্ষর করেন এটাকেই শিল্পভেদে দস্তখত বলে। নিজের নামের হরফগুলোকে একটি শৈল্পিক মডেলে উত্তীর্ণ করার লক্ষ্যে অবিরাম প্রচেষ্টায় এ ধরনের মান অর্জন সম্ভব হয়। যখন একটি চুড়ান্ত মানের শিল্পকর্মযুক্ত খত তৈরি হয়, তখনই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এটিকে দস্তখত হিসেবে বেছে নেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকদের দস্তখত এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য সংস্কৃতিতে যেমন ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তেমনি বাংলা দস্তখত সংস্কৃতিতেও আরবী ও ফারসী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব সুস্পষ্ট। বাংলা লিপিকলার বিকাশে এ দস্তখতগুলো অবশ্যই মূল্যায়নের অবকাশ রাখে। সংস্কৃতির আপন গতিতে ও মনের অজান্তেই বাংলা লিপিকলার বিকাশে এটি একটি অনন্য মডেল। তাই অপূর্ব নান্দনিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এসব দস্তখতকে ফ্রি-হ্যান্ড শিল্প বিবেচনায় এক একটি শিল্পকর্ম এবং এর নির্মাতারা স্থুল অর্থে হলেও একজন লিপিশিল্পী।[৫৩]

[৫৩] মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, ‘বাংলা ক্যালিগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক ভাবনা’, *স্মারক- ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি* (ঢাকা: সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র), পৃ.১২৭-১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

কলম বা তুলির সাহায্যে কাগজ বা বিভিন্ন উপাদানের উপর হস্তাক্ষর যা একই সাথে শৈল্পিক ডিজাইন ও ফর্ম তুলে ধরে তাই ক্যালিগ্রাফি। ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করতে হলে কতিপয় বিধি-বিধান পরিপালন করতে হয়। যাকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে খাত আল-মানসুব (الخط المنسوب) তথা লিপিকলার মাপকাঠি বা মানদণ্ড বলা হয়।[৫৪] এর প্রায় অর্ধশত রীতি বা শৈলী রয়েছে। এসব শৈলীর আলোকেই একজন শিল্পী তাঁর ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। সুন্দর, মার্জিত ও সুশৃঙ্খল হাতের লেখা যখন শিল্পের মাধ্যম হয়; হাতের লেখা যখন লিপিকলা হয়ে উঠে; তখন আমরা তাকে ক্যালিগ্রাফি হিসেবে বিবেচনা করি। আর ক্যালিগ্রাফির মধ্যে আরবী ভাষার ক্যালিগ্রাফি জগদ্বিখ্যাত ও কালোত্তীর্ণ। এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে- আরবী হরফের ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য। প্রয়োগক্ষেত্রে রয়েছে এর সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। উমাইয়া শাসনামল (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) থেকেই এর উৎকর্ষতা শুরু। সে সময়কার বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ও জ্যামিতিবিদ আল-আহওয়াল আল-মুহাররির বলেন- ‘কোন ব্যক্তি যখন ইচ্ছা করে যে তার হস্তলিপি চমৎকার ও পরিচ্ছন্ন হবে, তাহলে তার উচিৎ হবে এমন একটি প্যাটার্ন বা ধরন উদ্ভাবন করা, যাতে তার হরফ ও কলমের আঁচড় নিয়ন্ত্রিত রেখায় প্রবাহিত হয়।’

ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করতে হলে তিনটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। আর তাহলো-

১. সারবস্তু (اصول الحروف)

২. হরফের আকৃতি (شكل الحروف)

৩. হরফের সুশৃঙ্খল যুথবদ্ধতা (تركيب)

ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন স্টাইলে হরফের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যা হাতে কলমে দেখানো ছাড়া এর আসল রূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। প্রতিটি হরফের একটি সুনির্দিষ্ট গঠনপ্রকৃতি রয়েছে। যা খুবই সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হয়। তাছাড়া হরফের রেখাগুলোর বিন্দুতে বিন্দুতে যে বলিষ্ঠতা অথবা দুর্বলতা রয়েছে তা লক্ষ্য রাখতে হয়। হরফের সাধারণ আকৃতি, এর চড়াই-উৎরাই

[৫৪] *আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ও অলঙ্কারসমূহের প্রতি যথেষ্ট নজরদারি থাকা প্রয়োজন। বিশেষত যে সকল হরফের মাঝে পারস্পারিক সাদৃশ্য রয়েছে তাদের ভেতর যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে বিকৃতি এড়ানোর ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়।

কোন নির্দিষ্ট স্টাইলকে পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে অনুশীলন, এর শব্দ, বর্ণ, এমনকি বিন্দুগুলোকে একত্রে প্রযুক্তির পরিভাষায় নাজারি বলে। আর হরফের সারবস্তুর ছোট ছোট অনুলিপি তৈরি করে সংরক্ষণ করা এবং হরফের সামঞ্জস্যগুলোকে বারবার অনুশীলন করাকে কালামী বলে। ইসলামী ক্যালিগ্রাফি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। ক্যালিগ্রাফির ইতিহাসে এমন নজির বিরল। ইসলাম এ লিপিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা এনে দিয়েছে। এর দৃষ্টিনন্দন ছন্দ, মাধুর্য, প্রাঞ্জল ও প্রবাহমানতা এক আন্তর্জাতিক শিল্পমাধ্যমে স্থান করে দিয়েছে। এটি ইসলামী শিল্পকলার প্রধানতম বিষয়। যা আমাদের ঐতিহ্যবোধের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।[৫৫] বর্তমানে সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার ও বিজ্ঞাপনে ফ্রি-হ্যান্ড ক্যালিগ্রাফির চর্চা ও প্রয়োগ সচরাচর চোখে পড়ে।

১.১.৫ প্রসঙ্গ: শিল্পকলা ও ক্যালিগ্রাফি

কোন কাজ সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পন্ন করাকে শিল্পকলা বলে। এককথায় মানুষের কার্যাবলির মধ্যে যে বিশিষ্ট রূপভঙ্গি ইন্দ্রিয়কে আমোদিত ও আনন্দিত করে তাকে শিল্পকলা বলে। Herbert Read তাঁর Education through Art নামক গ্রন্থে বলেন- Art, however we may define it, is present in everything we make to please our senses, to begin with that common to all works of art is something we call form. আর্ট সমালোচক ইটালিয়ান দার্শনিক বেনেভোটা ক্রোস বলেন, Art is expression of impression বা অনুভূতির প্রকাশই আর্ট। সৌন্দর্য আর হৃদয়ে অনুভূতির উদ্রেক সৃষ্টিই শিল্পের কাজ। ক্যালিগ্রাফিতে পর্যাপ্ত সৌন্দার্যানুভূতি,

---

[৫৫] মোহাম্মদ আবদুর রহীম, 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফি যুগে যুগে', মাসিক *অগ্রপথিক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০০), পৃ.১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

সৃজনশীলতা ও প্রয়োজনবোধ বিদ্যমান। যা সৌন্দর্যক্ষুধা নিবৃত্ত করে। ক্যালিগ্রাফি মানব মনের সংবেদনশীলতা, আবেগ-অনুভূতি ও ভাবকল্পনার অন্যতম উৎস। যা সৃজনশীল, মানসিক উন্নতিবিধায়ক ও দুর্বহ প্রকাশ বেদনায় পুষ্ট।[৫৬]

মানব মনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক রূপ হচ্ছে শিল্পকলা। শিল্পকলা মূলত দু'টি ধারায় বিভক্ত। যথা- চারুশিল্প (Fine Arts) ও কারুশিল্প (Crafts)। মানুষের মনের নানা অনুভূতি তথা সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাসহ বিভিন্নমুখী অনুভব থেকে চারুশিল্পের সৃষ্টি হয়।[৫৭] চারুশিল্প বলতে ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, স্থাপত্য, সঙ্গীত ও কবিতা ইত্যাদিকে বুঝায়। অন্যদিকে কারুশিল্প বলতে সেসব শিল্পকে বুঝায়, যা নির্মাণে কল্পনার চেয়ে কারিগরী দক্ষতা বেশি প্রয়োজন হয় এবং যেসব শিল্পকর্মের লক্ষ্য কেবল আমাদের শিল্পবোধ তৃপ্ত করা নয়, বরং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ব্যবহারিক প্রয়োজন পূর্ণ করা। আসলে সব শিল্পকলার লক্ষ্য হলো- মনোহর কিছু সৃষ্টি করা। শিল্পকলার সাধনাই মনোহর সাধনা। একটি কম্বলের গায়ে নক্‌শা না করলেও তা দিয়ে শীত নিবারণ করা যায়। কিন্তু তারপরও তার উপরে নক্‌শা করা হয় তার সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্য। এভাবে মনোহরবোধই হলো শিল্পবোধ। যা কিছুর মধ্যে শিল্পবোধের স্পষ্ট পরিচয় আছে তাই হলো শিল্পবস্তু।[৫৮]

যে শিল্পে মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্মের অনুশাসনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য, মহিমা, আবেগ, অনুভূতি প্রকাশ পায়, তাই ইসলামী শিল্পকলা।[৫৯] ইসলামী শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যে ভরপুর ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শুধু স্থাপত্য ও কারুশিল্পে নয় বরং শিল্পরীতিতেও অসামান্য অবদান

---

[৫৬] মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ক্যালিগ্রাফিতে সীরাতচর্চা', *শিল্পকলা*, ব.২৪, স.১ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪), পৃ.১১।

[৫৭] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, *চারু ও কারুকলা*, নবম-দশম শ্রেণি, পুণর্মুদ্রণ-২০১৭, পৃ.২-৩।

[৫৮] *ইসলামী শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩-৪।

[৫৯] *সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিরকের প্রভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

রেখেছে। মানুষ বা প্রাণীর চিত্রাঙ্কন ইসলামে নিষিদ্ধ। সে কারণে মুসলমানদের মূর্তি অঙ্কন বিরোধী কাজে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করেছে।[৬০]

শিল্পকলার জগতে 'স্পিরিচুয়াল জিওমেট্রি' বা আধ্যাত্মিক রেখাঙ্কন বলে যে কথাটি প্রচলিত তা ইসলামী ক্যালিগ্রাফিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আক্ষরিক অর্থে সুন্দর হস্তাক্ষর দিয়ে গড়া নান্দনিক লিপিকলাকে ক্যালিগ্রাফি বলে। ইসলামী ক্যালিগ্রাফি সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে এর সৌন্দর্য, স্পষ্টতা ও শৈল্পিক অভিব্যক্তির কারণে শিল্পকলায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী ক্যালিগ্রাফির যাবতীয় অর্জনের পেছনে মূল প্রেরণা হচ্ছে পবিত্র আল-কুরআন। কুরআনের বাণীকে হাজার বছর ধরে শিল্পীরা হৃদয়ের সুষমা দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ললিতকলায় ফিগারেটিভ বা জীবাকৃতির বিষয়টি ইসলামী ক্যালিগ্রাফারগণ তাদের বিশ্বাসের কারণে সযতনে এড়িয়ে গেছেন। এজন্য ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পকলায় একটি অসীম সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে প্রকাশিত ও প্রসারিত হয়েছে। এতে রয়েছে শিল্পের যাবতীয় অনুষঙ্গ। প্রতিসাম্য, ফুলেল নক্‌শাকলা ও জ্যামিতিক-গাণিতিক বিষয়াবলি এতে তুলে ধরা হয়েছে। ক্যালিগ্রাফির হরফের গতি-প্রকৃতিতে যে অন্তর্গত সৌন্দর্য প্রয়োগ করা হয়, তা শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক রেখাঙ্কন হিসেবে দর্শককে মুগ্ধ করে।[৬১]

সুন্দরের প্রতি রয়েছে মানুষের সহজাত আকর্ষণ। সৌন্দর্য সৃষ্টির অকৃত্রিম আগ্রহ ও প্রবল আকাঙ্ক্ষাই শিল্পচর্চার প্রেরণা। একজন শিল্পী স্বপ্রণোদিতভাবে ভাবপ্রবণতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্বীয় অনুভূতি ও মানসিকতাকে সৌন্দর্যরসে সিক্ত করে রং-তুলির মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টিকে চিরন্তন ও শাশ্বত করে রাখেন। শিল্পকলার ইতিহাসে মুসলিম চিত্রশিল্পীদের অসামান্য অবদান রয়েছে। আর তাদের শিল্পসত্তার একটি বড় অংশ বিকাশ ঘটেছে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে। বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু রূপায়ন, অনুপাত ও পরিপ্রেক্ষিতের যথাযথ প্রয়োগ, নক্‌শার প্রাধান্য,

---

[৬০] মাহমুদ মাহেরুন, *নাসখ লিপি* (ঢাকা: ইরানী কালচারাল সেন্টার, ২০০৩), পৃ.২০।

[৬১] *ক্যাটালগ: ঢাকা- এশিয়া অঞ্চলের ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী-২০১২ উদযাপন উপলক্ষে ক্যালিগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০১২, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফির ব্যবহারভিত্তিক সুক্ষ্ম ও ছন্দময় রেখা এবং উজ্জ্বল ও বিভিন্ন রঙের সমাবেশ মুসলিম চিত্রকলাকে অনুকরণীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পরীতিতে পরিণত করেছে।[৬২]

শিল্প একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। যার অর্থ- সুন্দর, সুনিপুণ, মার্জিত ও পরিশীলিত ইত্যাদি। ইংরেজিতে Art এবং আরবীতে হাসান (حسن) ও সানা' (صنع) ইত্যাদি। শিল্পকলার মূলকথা হচ্ছে সৌন্দর্য অনুভব করা ও বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ করা। ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, যা প্রত্যেকটি মুসলমানের অন্তরের অন্তস্থলে সৌন্দর্য, প্রেম ও তার অনুভূতি গেড়ে দিয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পাঠকমাত্রই এর যৌক্তিকতাকে সুস্পষ্ট, জোরালো ও গভীরভাবে উপলব্ধি করে থাকেন। মহান আল্লাহ তাআ'লা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তা অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে-[৬৩]-الدى احسن كل شئ خلقه অর্থ- যিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে সুন্দর রূপে সৃজন করেছেন। তিনি আরো বলেছেন-[৬৪]-صنع الله الدى أتقن كل شئ অর্থ- সেই আল্লাহর কর্ম যিনি সবকিছু সুনিপুনভাবে সম্পন্ন করেছেন।

শিল্পকলা মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। যা কোন জাতির হৃদয় ও অনুভূতির সাথে জড়িত। বিভিন্ন প্রভাব সৃষ্টিকারী উপকরণ- যা দেখা যায়, শোনা যায়, পড়া যায়, বুঝা যায় কিংবা চিন্তা ও অনুভব করা যায় এবং জাতির দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও চেতনা গঠনে সহায়তা করে। তবে এটি বিজ্ঞানের মতো, একে যেমন কল্যাণকর ও জাতি বিনির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যায়, তেমনিই অকল্যাণ ও ধ্বংসের কাজেও ব্যবহার করা যায়। ইসলাম সৌন্দর্যবোধকে জাগ্রত করে এবং নান্দনিক শিল্পকলাকে সমর্থন করে। ইসলামী সভ্যতার ছায়ায় তা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং অন্যান্য জাতি ও সভ্যতা হতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। ইসলামী শিল্পকলা যে সকল ধারায় বিকশিত হয়েছে তার

[৬২] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা* (ঢাকা: ছাত্রবন্ধু পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪), পৃ.৩।
[৬৩] *আল-কুরআন*, সুরা সিজদাহ, আয়াত-৭।
[৬৪] *আল-কুরআন*, সুরা আন-নামল-৮৮, আয়াত-৭।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে মসজিদ, বাড়ি-ঘর, বাসন-কোশন ইত্যাদিতে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ও কারুকার্য খচিত নক্‌শা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৬৫]

শিল্পকলার আত্মা হচ্ছে সৌন্দর্যবোধ ও তার রস আস্বাদন। পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ও গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশেষত সুরা আ'রাফের ৩২ নং আয়াতে زينة الله বা 'আল্লাহর সাজসজ্জা' শব্দটিকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সৌন্দর্যকে বিশেষ মর্যাদাবান ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে ও মনে মহাবিশ্বের আনাচে-কানাচে, উপরে-নীচে, আশে-পাশে, আসমান-জমিনে, গাছ-গাছালী, পাখ-পাখালি ও মানুষের মধ্যে যে সৌন্দর্য বিস্তৃত রয়েছে তা পবিত্র আল-কুরআনে বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সুন্দরকে ভালবাসেন। 'জামীল' বা সুন্দর আল্লাহর গুণবাচক নাম ও সৌন্দর্য তাঁর গুণ।[৬৬]

তাই ইসলাম সৌন্দর্য চর্চা, উপভোগ ও সুন্দরকে ভালবাসতে আহবান জানায়। এ কারণে ইসলামী সভ্যতায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি অতি চমৎকার শিল্প হিসেবে সৃষ্টি হয়ে তা প্রভূত উন্নতি লাভ করে। যা আল-কুরআন, মসজিদ, মাদরাসায়, ঘর-বাড়ি, অট্টালিকা, ছাদ, দেয়াল, দরজা, জানালা এমনকি ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তথা তৈজষপত্র, বিছানা, কাপড়-চোপড় ও তরবারি ইত্যাদিতে দেখা যায়। আর এসবের জন্য ব্যবহৃত হয় পাথর, শ্বেতপাথর, মার্বেল পাথর, কাঠ, চামড়া, আয়না, পাতা, লোহা, পিতল ও বিভিন্ন প্রকার খনিজদ্রব্য।[৬৭]

মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই তারা শিল্পের প্রতি আসক্ত। তাদের এ শিল্প চেতনা যেন কল্যাণকর পথে অগ্রসর হয়, এজন্য ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক বিস্তৃতির প্রয়োজন। কারো ঘরে

---

[৬৫] ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলাম ও শিল্পকলা* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭), অনু. ড. মাহফুজুর রহমান, পৃ.১৪।
[৬৬] *আল-কুরআন*, সুরা সিজদাহ, আয়াত-৭।
[৬৭] *ইসলাম ও শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

বা কর্মস্থলে প্রবেশ করলে তার রুচি বা প্রকৃতি সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তার পছন্দ-অপছন্দ কিংবা ভালো লাগা বা মন্দ লাগা বুঝা যায়। কেউ ঘর সাজায় মেডোনার ছবি দিয়ে, কেউ রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি দিয়ে, কেউ সাজায় ফুলশোভায় আবার কেউ সাজায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি দিয়ে। এভাবে প্রতিটি মানুষ সচেতন বা অবচেতন মনে চারু বা কারুকলার শিল্পবোধ দ্বারা তাড়িত। কেউ এসবের চর্চা করে আবার কেউবা ভোগ করে।[৬৮]

[৬৮] আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি* (ঢাকা: প্রীতি প্রকাশন, ২০০১), পৃ.৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১.২ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উন্মেষ ও বিকাশধারা

১.২.১ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উন্মেষ

প্রাচীন যুগে মানুষ লেখপড়া জানত না। তাদের ছিল না কোন কাগজ, কালি বা কলম। কিংবা ছিল না কোন হরফ বা বর্ণমালা। সেই নিরক্ষর যুগে তারা স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তার সাহায্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করত। সময়ের বিবর্তনে তাদের বিবেক বুদ্ধি বিকাশ লাভ করতে থাকে। একপর্যায়ে এসে তারা নিজেদের মনোভাব, চিন্তাধারা ও মুখের ভাষাকে স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধান অতিক্রম করে অনুপস্থিত, অজ্ঞাত ও অনাগত উদ্দিষ্টজনের নিকট পৌঁছানোর কথা চিন্তা করে। তাছাড়া তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপ, লেনদেন ও কথাবার্তা সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনীয়তাও গভীরভাবে অনুভব করে। এর ফলে সভ্য সমাজে ক্রমে লিপির উন্মেষ ঘটে। প্রাচীন লিপির বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্র পর্যালোচনা করে এ ধারণা করা হয় যে, আদিম স্তরে চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন প্রস্তর যুগের[৬৯] অনেক গুহাচিত্র দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। এ গুহাচিত্র গুলোই ছিল লিপি আবিষ্কারের প্রথম উদ্যোগ। তাই ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উন্মেষ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আরবী বর্ণমালার উৎপত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বর্ণমালার উৎপত্তি

---

[৬৯] প্রাচীন প্রস্তরযুগ: যে যুগে মানুষ পাথর দ্বারা হননাদি করত এবং ধাতুর ব্যবহার করতে জানত না। এ যুগের সূচনা হয় ছয় লক্ষ বছর এবং সমাপ্তি ঘটে দশ হাজার বছর পূর্বে।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ বলেন-[৭০]

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

অর্থ- আর তিনি হযরত আদম (আ.) কে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে বলতো এগুলোর নাম। অতএব এ আয়াতের আলোকে বিশ্বাস করা যায় যে, যেহেতু প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কেই হযরত আদম (আ.) কে অবহিত করানো হয়েছে সেহেতু তাকে আরবী সম্পর্কেও অবগত করানো হয়েছে। এ বিশ্বাসের আলোকে বলা যায়, হযরত আদম (আ.) এবং তারপর তদীয় পুত্র হযরত শীস (আ.) আরবী বর্ণ ও বিন্যাসের উৎকর্ষ সাধন করেন। এভাবে বংশানুক্রমে তারাই আরবী ভাষার বিকাশ সাধন করেন। তবে ইতিহাস অধ্যয়নে আরবদের মধ্যে কখন, কোথায় ও কীভাবে লেখার সূত্রপাত হয়, তা নিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক গবেষক ও লিপিবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

- কাব আল-আহবার (রা.) বলেন- হযরত আদম (আ.) আরবী, সিরীয় ও অন্যান্য বর্ণমালার উদ্ভাবন করে ঐসব ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করেন। অতপর তদীয় পুত্র শীস (আ.) আরবী বর্ণ ও হরফের উৎকর্ষ সাধন করেন।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- হযরত ইসমাঈল (আ.) চৌদ্দ বছর বয়সের সময় আরবী বর্ণমালায় লেখার পদ্ধতি চালু করেন।[৭১]
- আদাবুল কিতাবে বর্ণিত আছে- হযরত আদম (আ.) প্রথম সুরিয়ানী বা আরবী হরফ তৈরি করেন। হযরত নূহ (আ.)ও আরবী লিপির প্রসার ঘটান এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) তার সংস্কার করেন।

---

[৭০] *আল-কুরআন*, সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত-৩১।

[৭১] আবু উমর ইউসুফ বিন আবদুল বাবর আল-কুরতুবী, *আল-কাসদ ওয়াল উমাম* (কায়রো: মাকতাবাহ আল-কুদ্সী, ১৩৫০ হি.), পৃ.১৭।

Dhaka University Institutional Repository

- মুহাদ্দিস মাকহুল-এর মতে- হযরত ইসমাইল (আ.)-এর সন্তানগণ আরবী বর্ণমালা আবিষ্কার করেন।
- হযরত আবু যার্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন- হযরত ইদরিস (আ.)-ই সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লিখেন।[৭২]
- সিরাতুল হালবী নামক গ্রন্থে আছে- ইবন মা'আদ ইবনু আদনান আরবী লিপির আবিষ্কারক।
- ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত আছে- প্রাথমিক পর্যায়ে উমায়ম, জুদাইস এবং তামস গোত্রের ব্যক্তিভিত্তিক নাম অনুসারে আরবী বর্ণমালার নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[৭৩]
- ঐতিহাসিক মাস'উদীর মতে- মাদইয়ানের বনু মুহসিন গোত্র সর্বপ্রথম আরবী লিপির ব্যবহার করেন। এ গোত্রে যেসব লোক লেখতে পারত তাদের নাম ছিল- আবজাদ, হাওওয়াজ, হুতাতি ও কালিমন ইত্যাদি।
- ইবনে খালদুন বলেন- দক্ষিণ আরবের তুব্বা'গণ সর্বপ্রথম আরবী লেখা প্রচলন করেন।[৭৪]
- ঐতিহাসিক মায়ার্স বলেন- Perhaps the greatest achievement of the Egyptians was the working out of a system of writting. More than four thousand years before Christ they had developed a very curious and complex system, which was partly alphabetic. মিসরে লেখার পত্র হিসেবে প্যাপিরাস[৭৫] নামক একধরনের নলখাগড়া ব্যবহার করা হত। এগুলো মিসরের জলাশয়, ডোবা ও পুকুর

---

[৭২] জালালুদ্দীন সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন* (কায়রো: আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাতুল 'আম্মাহ, ১৯৭৪) খ.২, পৃ.৩৪৩।

[৭৩] *আল-কাসদ ওয়াল উমাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭।

[৭৪] আ ত ম মুছলেহউদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫), পৃ.১১৪-১১৫।

[৭৫] প্যাপিরাস: এটি শরকাণ্ডা বা বরুই জাতীয় তৃণ। এর ডাঁটা ত্রিকোণ বা ত্রিধারা হয়ে থাকে। এর উচ্চতা সাধারণত চার হাত। এটিকে লেখার জন্য উপযুক্ত করে তোলার জন্য প্রথমে ৪.৫ থেকে ৯.৫ ইঞ্চি পর্যন্ত টুকরা করে ডাঁটা থেকে চওড়া পাত বের করে আঠালো দ্রব্যের মাধ্যমে উক্ত পাতের একটির সাথে আরেকটিকে সেঁটে দেয়া হত। এরপর পত্রটি শুকিয়ে নিয়ে হাতির দাঁত বা শঙ্খের সাথে ঘষে মসৃন ও সমান করে এর উপর লেখা হত। এভাবে তৈরিকৃত পত্রকে ইউরোপীয়রা প্যাপিরাস বলত। এ পত্রের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ, চিঠি ও প্রয়োজনীয় দলীলও লেখা হত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এতে লেখার ধরন কৌণিক বা কীলকাকারের রূপ ধারণ করার পরিবর্তে সহজ রূপ পরিগ্রহ করত। এ লিখনরীতি হায়ারোগ্লিফস (Hieroglyphs) নামে পরিচিত।[৭৬] মিসরে এ রীতি ছাড়াও আরো দু'ধরনের লিখনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাহলো- হায়ার‍্যাটিক্স (Hieraticks) ও ডায়ামেটিক্স (Diemoticks)।

- অনেক লিপিবিজ্ঞানীর মতে- হায়ারোগ্লিফসই হলো সকল বর্ণমালার মূল উৎস। তা থেকেই পৃথিবীতে প্রচলিত সকল বর্ণমালা উৎপত্তি লাভ করে। সর্বপ্রথম খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০ এর মধ্যে সিনাই তীরের সেমিটিক অধিবাসীরা হায়ারোগ্লিফসের পরিণত রূপ সম্পর্কে অবগত হয় এবং তারাই এর পথ ধরে সর্বপ্রথম বর্ণমালা আবিষ্কার করে।[৭৭]
- অধিকাংশ আধুনিক গবেষকের মতে, বাণিজ্যপরায়ণ ফিনিশীয়রাই সর্বপ্রথম বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন বন্দরে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন জাতির লোকদের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ফলে তারা নিজেদের লেনদেন ও বহির্বাণিজ্যের তাগিদেই বর্ণমালা আবিষ্কার করে।
- সেমিটিক ভাষার অধিকাংশ বর্ণমালার নামসমূহ প্রমাণ বহন করে যে- এগুলো ফিনিশীয়[৭৮] বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। কারণ আরবী ও অন্যান্য সেমিটিক বর্ণের ফিনিশীয় বর্ণগুলোর নামের মতই। ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে অ্যারামাইক[৭৯] বর্ণমালা উৎপত্তি লাভ করে।

---

[৭৬] বিলাল রিফাঈ, *আল-খাত্তুল 'আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু* (বৈরুত: দারু ইবন কাছীর, ১৯৯০), পৃ.১৯।

[৭৭] আব্দুল হামিদ আবু সিক্কীন, *ফিকহুল লুগাহ* (কায়রো: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১), পৃ.১১৩।

[৭৮] ফিনিশীয়: এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে সিরিয়াকে প্রাচীনকালে গ্রিক ও রোমানগণ ফিনিশীয় বলে অভিহিত করত। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী, ফিনিশীয়রা হামের বংশধর ছিল। তারা আফ্রিকা থেকে আগমন করে। তারা প্রাচীন যুগের বড় ব্যবসায়ী ছিল। তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম ভূমধ্য সাগরের নানা বন্দরে বিস্তৃত হওয়ায় তারা ইউরোপীয়দের লেখা শিখিয়েছে। ইউরোপের প্রাচীন ও বর্তমান লিপিরীতি তাদের লিপি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

[৭৯] অ্যারামাইক: অ্যারাম দেশ সম্বন্ধীয়। প্রাচীন গ্রিকগণ টাইগ্রিস নদীর নিম্নাঞ্চলকে অ্যারাম নামে অভিহিত করা হত। আর এ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে অ্যারামী বলা হত। তারা সামী বংশোদ্ভূত। এরা আরব দেশ থেকে এসেছিল। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালের পরবর্তী এক সময়ে তারা সিরিয়ায় আগমন করেছিল বিধায় তাদেরকে সিরিয়ানও বলা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

- Dr. D Deringer এর মতে- আরবী, ফিনিশিয়ন, হিব্রু, অ্যারামাইক, সুরিয়ানী প্রভৃতি বর্ণমালা মূল সেমিটিক (Proto Semitic) বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। পাশ্চাত্য লিপিবিদগণ অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন যে, গ্রিক, ইংরেজি প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ণমালার উৎপত্তিও সে মূল সেমিটিক বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত।
- কোন কোন গবেষকের মতে- 'খাত্তুল জযম'ই হলো আরবী লিখনরীতির মূল। কেননা ইসলাম পূর্বকালে আরব দেশে দু'ধরনের লিখনরীতি প্রচলিত ছিল। ১. জযম ২. মুসনাদ। জযম হলো- উত্তর আরবের মক্কা, মদীনা ও ইরাক-আরব প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের লিখনরীতি। আর মুসনাদ ছিল দক্ষিণ আরব ও আরবের অবশিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের লিখনরীতি।[৮০]
- ঐতিহাসিক বালাজুরি থেকে বর্ণিত- সর্বপ্রথম বাওলানের[৮১] তিনজন লোক আরবী বর্ণসমূহ উদ্ভাবন করেন। তারা হলেন- মুরামির ইবন মুররাহ, আসলাম ইবন সুদরাহ ও আমির ইবন জুদ্‌রাহ।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে- আরবী বর্ণমালা মূল সামী বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত। তিনি আরও বলেছেন- বর্তমানে লিপিতত্ত্ববিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, গ্রীক লাতিন বর্ণমালাও মূল সামী লিপিমালা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। উত্তর আরবে মুসনাদ লিপির শাখালিপিগুলোকে সাফাভী, সামুদী ও লিহয়ানী লিপি বলা হতো। দক্ষিণ আরবে এর শাখালিপিকে বলা হতো হিময়ারী।[৮২]

---

[৮০] ইবনুন নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুত: আল-মাতবা'আতুল খায়্যাত, ১৯৭২), পৃ.৪-৫।

[৮১] বাওলান: তাঈ গোত্রের পূর্বপুরুষ গুসাইন ইবন গাওছের বংশধররা বাওলান নামে পরিচিত ছিল। (শিহাবুদ্দীন আহমদ আন-নুয়াইরী, *নিহায়াতুল 'আরাব ফী ফুনুনিল আদাব*, বৈরুত: দারুল কিতাবিল মিসরিয়্যাহ, তা.বি, পৃ.১৭৩)

[৮২] আ ত ম মুসলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইফা, ১৯৯৫), পৃ.১১৫।

[৮৩] মেসোপটেমিয়া গ্রিক শব্দের ইংরেজি রূপ। শাব্দিক অর্থ- নদীঘেরা ভূমি। প্রাচীন গ্রিকরা মেসোপটেমিয়া বলতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী উর্বর ভূ-ভাগকে বুঝাত। এখানে প্রাচীনকালে সুমেরীয়, অ্যাসিরীয়, ব্যাবিলনীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

[৮৪] *আল-খাত্তুল আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩।

Dhaka University Institutional Repository

- কারো কারো মতে- প্রস্তর যুগের শেষদিকে তথা সুমেরীয়রা খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সালে মেসোপটেমিয়ায়[৮৩] সর্বপ্রথম লিপিশিল্পের উদ্ভব ঘটে। তারা কাঠের তৈরি অতি সুক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট ত্রিকোণাকৃতির কলম দ্বারা নরম মাটির ট্যাবলেটে বিভিন্ন জীব-জন্তুর চিত্র ও বস্তুর আকৃতি অঙ্কন করে মনের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করত। তাদের অনুসৃত লিখনরীতিটি 'কীলকাকৃতি লিখনরীতি' (Cuneiform) নামে অভিহিত ছিল।[৮৪]
- জুরজি যায়দান ও আরো কিছু গবেষকের মতে- নাবাতী ও সিরিয়ক লিপিদ্বয়ের সমন্বিত রূপ হলো আরবী লিপি। হিজাজবাসীরা ইসলাম পূর্বকালে লিখনশিল্প সম্পর্কে অবহিত ছিল না। অথচ তাদের উত্তর ও দক্ষিণে এমন অনেক জাতির বসবাস ছিল যারা লেখাপড়া জানত। তাদের মধ্যে ইয়েমেনের হিময়ারীরা এবং উত্তরে নাবাতীরা[৮৫] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিময়ারীরা মুসনাদ রীতি অনুযায়ী লিখত এবং নাবাতীরা নাবাতী হরফ অনুসারে লিখত।[৮৬]
- আধুনিক আরব গবেষক ও অধিকাংশ প্রাচ্যবিদদের মতে- আরবী লিপি খোদ হিজাজেই উন্নতি লাভ করে। বাণিজ্যিক প্রয়োজন ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে হিজাজের অধিবাসীরা প্রথমত মুসনাদ লিপি[৮৭] গ্রহণ করে।
- ড. খলীল ইয়াহইয়া নামী বলেন- হিজাজীরা নাবাতী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে তাদের লিপিরীতি গ্রহণ করে। হয়তো ব্যবসার উদ্দেশ্যে নাবাতীদের হিজাজে গমনের সুবাদে

---

[৮৫] নাবতী: নাবাতী হচ্ছে হযরত ইসমাইল (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবায়ুতের বংশধর। ঐতিহাসিকগণ নবায়ুতকে সাধারণত নাবিত বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইসমাইল (আ.) এর মৃত্যুর পর নাবিত কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। নাবাতীরা হিজাযের অধিবাসী ছিল। পরবর্তীতে তারা সিরিয়া-ইরাক হিজরত করেন।

[৮৬] আবদুল ফাত্তাহ উবাদাহ, *ইনতিশারুল খাত্তিল 'আরাবী ফিল 'আলিমিশ শারকী ওয়াল গারবী* (মিসর: মাতবা'আ হিনদিয়া বিল মুসিকী), পৃ.৭।

[৮৭] মুসনাদ লিপি: এর সাহায্যে ইয়েমেনে হিময়ারী ভাষা লিপিবদ্ধ করা হত।

Dhaka University Institutional Repository

অথবা সিরিয়ায় গমনাগমনের পথে নাবাতীদের সাথে হিজাজীদের সংশ্রব লাভের সুবাদে তা সম্ভব হয়ে ওঠে।[৮৮]

- কারো কারো মতে- প্রাচীন আরবী হরফের সর্বপ্রথম যে নমূনাটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে উম্মুল জিমালে প্রাপ্ত ২৫০ খ্রিস্টাব্দের একটি প্রস্তরফলক। ষষ্ঠ শতাব্দীতে উম্মুল জিমাল থেকে প্রাপ্ত দ্বিতীয় প্রস্তরফলক থেকে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, নাবাতিয়ান লিপি থেকেই আরবী লিপির উদ্ভব।[৮৯]

- আধুনিক গবেষকদের মতে- লিপিশিল্প বর্তমানের নিপুণ শৈল্পিক অবস্থায় পৌঁছার পূর্বে ৪টি প্রধান সোপান অতিক্রম করে। আর সে সোপানগুলোকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. **ভাবদ্যোতক লিখনপদ্ধতি (Idiogram):** এ রীতিতে ধ্বনি বা শব্দের পরিবর্তে নয়, কেবল ভাব ও মর্মের পরিবর্তে চিত্র ও চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় বলে একে 'ভাবদ্যোতক লিখনপদ্ধতি' নামে অভিহিত করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২টি ধাপ রয়েছে-

ক. মূল চিত্র ও প্রতিকৃতির সাহায্যে লেখার প্রচলন (যেমন- হায়ারোগ্লিফস, চৈনিক, অ্যাসুরিয়ান ও হায়ছি)

খ. প্রতীক ও সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে লেখার প্রচলন (যেমন- মিসরের হায়ারোগ্লিফস ও চৈনিক)

২. **ধ্বন্যাত্মক লিখনপদ্ধতি (Onamatopoetic):** এ পদ্ধতিতে ভাব ও মর্মের পরিবর্তে নয়, কেবল প্রত্যেক ধ্বনির জন্য পৃথক পৃথক চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় বলে একে 'ধ্বন্যাত্মক লিখনপদ্ধতি' নামে অভিহিত করা হয়। এ পদ্ধতিতেও ২টি ধাপ রয়েছে-

ক. শব্দচিত্রের সাহায্যে লেখার প্রচলন

---

[৮৮] ড. খলীল ইয়াহইয়া নামী, 'আসলুল খাত্তিল 'আরবী ওয়া তাতাওয়ারাহু ইলা মা কাবলাল ইসলাম', *মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব* (আল-জামি'আতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৫), খ.৩, স.১, পৃ.১০২।

[৮৯] মোহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: যোগাযোগ পাবলিশার্স, অক্টোবর-২০০২), পৃ.১৬।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বর্ণের সাহায্যে লেখার প্রচলন [৯০]

কোন কোন গবেষকের মতে- আরবী লিপি সরাসরি অ্যারামাইক বা সিরিয়ক লিখনরীতি থেকে উদ্ভূত হয়।[৯১] অ্যারাম বংশোদ্ভূত সিরিয়করা অ্যারামীয় লিখনরীতির বিকাশ সাধন করে দু'টি লিখনপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তা হলো-

১. প্রাচীন রীতি। যা অবলম্বন করে তারা ইঞ্জিল ও ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করত। এ রীতির বর্ণগুলো ছিল খাঁড়া ও চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। এটি 'সতরঞ্জলি খত'[৯২] নামে পরিচিত।

২. সহজ রীতি। এর হরফগুলো ছিল ধনুকাকৃতির মত গোলাকার। এটিই মূলত নাসখী রীতি।

প্রাক ইসলামী যুগে শিল্পচর্চার উপর কোন প্রকার বিধি-নিষেধ না থাকায় শিল্পীরা ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উৎকর্ষ সাধনে যথেষ্ট প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উপর ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা আরোপিত হয়। তাই তখন চিত্রশিল্পীগণ সাধারণভাবে সমাজের চোখে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল না। তবে ইসলাম পূর্ব যুগেও মক্কার পবিত্র কা'বা ঘরকে ওকাজ মেলার সময় ক্যালিগ্রাফি তথা সুন্দর হস্তাক্ষরে সাজানো হত এবং কবিরা সেখানে প্রাধান্য পেত। এমতাবস্থায় ইসলাম সুন্দর হস্তলিপি ও ক্যালিগ্রাফির অনুমোদন দেয় এবং অনুমোদিত শিল্পচর্চার দিকে শিল্পীরা আকৃষ্ট হয়। ফলে ইসলামের প্রথম যুগ হতেই ক্যালিগ্রাফি শিল্প প্রশংসিত এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে।[৯৩]

অতএব বলা যায়- ইসলামের প্রাথমিক যুগেই প্রচলন হয়ে দৈনন্দিন বিষয়ে লেখার জন্য দ্রুত লিখনের উপযোগী লিপি ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ বা আনুষ্ঠানিক কোন বিষয় লেখার জন্য বিশেষ লিপিশৈলী ব্যবহৃত হয়। আর এই শেষোক্ত লিপি থেকেই পরবর্তীকালে ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ঘটে।

---

[৯০] *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪-৮।

[৯১] Khalil Siman, *Linguistics in the Middle ages* (Leiden: E J Brill, 1968), p.9.

[৯২] সতরঞ্জলি লিপি: খ্রিস্টীয় ৩য় শতাব্দীর শুরুতে বুলাস ইবন আরাকা বা আতকা আর-রাহাভি এটি উদ্ভাবন করেন। এরপর লোকদের মাঝে তা বিস্তার লাভ করে।

[৯৩] Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, Tr. Copy (London: Oxford University Press, 1968), p.504.

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফি উদ্ভবের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে লিপিকার কর্তৃক লেখার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতিকে উপস্থাপন করা যায়। মহানবী (সা.) এর উপর অবতীর্ণ বাণী লিখে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গৃহীত হয়। আর তাই এ ব্যাপারে সুন্দর হস্তলিখনে উৎসাহিত করা হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. হামিদুল্লাহ বলেন- ‘কুরআন সংরক্ষণ প্রচেষ্টা থেকেই ক্যালিগ্রাফি এবং বাধাই শিল্পের সুত্রপাত ঘটেছে।’[৯৪]

আরবদের আগে পৃথিবীর অন্য কোন জাতি শিল্প হিসেবে ক্যালিগ্রাফির চর্চা করেননি। তারাই ক্যালিগ্রাফিকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে এবং অন্যান্য শিল্পের উপর একে প্রাধান্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বিজ্ঞানরূপে একে সাজিয়ে তুলেছে। তাদের এ লিপিশিল্পকে ‘আর্ট অব হেভেন’ বলা হয়। এর দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য ও নিপুণ আঁচড় এ উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন- ‘Calligraphy is perhaps the only Arab art which today has Cristian and Moslem representatives in Constatntinople, Cairo, Beirut and Damascus whose productions excel in elegance and beauty of any masterpieces that the ancients ever produced.’[৯৫] তবে এ শিল্পের উৎপত্তি ও প্রাথমিক পর্যায়ের বিকাশ যদিও আরবদের হতে শুরু হয়; কিন্তু এর পূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয় পারস্যবাসীদের দ্বারা। বলতে গেলে তাদের হাতেই এ শিল্প ইতিহাসের বিভিন্ন চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এখনও তার চিরন্তন, সক্রিয় ও প্রভাবশালী উপস্থিতি বজায় রেখেছে।

১.২.২ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশধারা

ইসলামের গৌরবময় অভ্যুদয়ের পরপরই প্রাচীন পারস্য, মিসর ও আরব ভূখণ্ডে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা ব্যাপক প্রসার পায়। এর ফলে কুরআন কেন্দ্রিক আরবী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের যে

---

[৯৪] ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *Intruduction to Islam*, অনু. মুহাম্মদ লুতফুল হক (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫), পৃ.২৪১।

[৯৫] P K Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan, 1968), p.424.

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময়কর বিকাশ ঘটে অন্যভাষাগুলোর ক্ষেত্রে সে বিকাশধারা লক্ষ্য করা যায় না। মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিভিন্ন মুসলিম জনপদে বিকশিত এ শিল্পের বিকাশের নিম্নোক্ত কারণ চিহ্নিত করা যায়:

১. ইসলাম যেহেতু মূর্তি বা জীব-জন্তুর ছবি অঙ্কনকে সমর্থন করে না, তাই মুসলিম শিল্পীগণ তাদের মনের অতৃপ্ত ক্ষুধা মিটানোর জন্য সুষমামণ্ডিত ক্যালিগ্রাফিকে বেছে নিয়েছেন।

২. সাম্রাজ্য বিস্তার বা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে মুসলমানরা অন্য ভাষার যে জনপদেই গিয়েছে, সেখানেই ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবী ভাষা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং ঐ ভাষা শিল্প-সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছ।

৩. আরবী হরফের আকার-প্রকরণগত সহজাত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা ক্যালিগ্রাফারদের নিকট বরাবরই ভিন্ন মাত্রায় ও নান্দনিক সৌন্দর্যে ধরা দিয়েছে।

আরবী হরফকে বৃত্ত বা বৃত্তাংশে যেমন রূপ দেয়া যায়, তেমনি তার গতিকে সহজেই সমান্তরাল কিংবা উল্লম্ব অবয়বে নিয়ে যাওয়া যায়। আবার এ গতিকে হ্রস্ব বা প্রলম্বিত করারও সুযোগ থাকে। আরবী লিপির এ অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে ধারণ করে মুসলিম ক্যালিগ্রাফারগণ কুরআনের আয়াত, রাসূল (সা.)-এর বাণী, সাধক কবিদের কবিতার পঙ্‌ক্তিমালাকে বিষয়বস্তু করে বিভিন্ন রঙে-ঢঙে বা বিন্যাসে ছন্দায়িত ও ব্যঞ্জনাময় অসংখ্য ক্যালিগ্রাফি সৃষ্টি করেছেন। পূর্ণাঙ্গ ও নান্দনিক শিল্প হিসেবে ক্যালিগ্রাফি এভাবেই জায়গা করে নিয়েছে পাণ্ডুলিপি, পশুর চামড়া, পাথর ফলক, ধাতবপাত্র, ধাতব মুদ্রাসহ নানাবিধ স্থাপত্যকর্মে। স্বমহিমায় স্থায়ী আসন করে নিয়েছে শিল্পপ্রেমী মানুষের মন-মানসে।[৯৬]

ইসলামী শিল্পকলা প্রথম বিস্তার লাভ করে মরুময় অঞ্চলে তাবুতে থাকা মানুষদের মধ্যে। তাঁবুতে বসবাসকারী মানুষের নিকট খুব বেশি আসবাবপত্র থাকে না। কারণ যাযাবর জীবনে একজায়গা হতে অন্য জায়গায় যেতে হলে বেশি জিনিসপত্র নিয়ে চলাফেরা করা খুবই কষ্টকর। তাই তাঁবুতে

---

[৯৬] আরিফুর রহমান, 'আরবী ক্যালিগ্রাফির কলা-কৌশল', *ক্যাটালগ: আরিফুর রহমানের ৫ম একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী* (ঢাকা: ২০০২), পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

বসবাসকারী মানুষ প্রধানত তাদের শিল্পবোধের তৃপ্তি খুঁজেছেন বয়নশিল্পের মাধ্যমে। তাঁবুতে তারা গোড়া থেকেই সুন্দর গালিচা বুনতে পেরেছে। এসব গালিচা তাঁবুর মধ্যে বিছিয়ে তাদের চাদরের অভাব পূরণ করতে চেয়েছে। মরুভূমিতে পানির অভাব থাকায় পানি যোগাড় করে হিসাব করে খরচ করতে না পারলে জীবন চলত না। এ প্রয়োজনে মৃৎপাত্র গড়ার দিকেও তাদের প্রবল ঝোঁক ছিল। তারা গালিচা, কাপড় ও মৃৎপাত্রের উপর ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নক্‌শা এঁকেছে।[৯৭] আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তারা প্রাণীর ছবি অঙ্কণ পুরোপুরি বর্জন করে আঙ্গুর লতা-পাতা ও ফুল দিয়ে নক্‌শা করে এবং পবিত্র কুরআনের বাণী দ্বারা চিত্রিত করে মনের সৌন্দর্যবোধকে প্রকাশ করে তৃপ্তি খুঁজেন। সমগ্র মুসলিম জগতে চকচকে টালি দ্বারা সুউচ্চ মিনার, মসজিদের দেয়াল ও রাজপ্রাসাদসমূহ অলঙ্কৃত করতেন। পুরুষদের জন্য স্বর্ণালঙ্কার নিষিদ্ধ থাকায় মুসলিম ক্যালিগ্রাফারগণ তার বিকল্প হিসেবে ধাতব চরিত্রের চকচকে মৃৎপাত্র নির্মাণে ব্রতী হন এবং দ্যুতিময় মৃৎপাত্র নির্মাণ করেন। যাকে ‘লাস্টার’ বলে অভিহিত করা হয়।[৯৮]

আরবী ভাষার হস্তলিখন শিল্পের উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হওয়ার মূলে রয়েছে- প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এবং আল-কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুতকরণের উদ্দীপনা। মহানবী (সা.) সুন্দর হস্তাক্ষরের বিকাশ সাধনে তাঁর অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করেন। ফলে শিল্পীগণ তাদের শিল্পকর্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য হস্তলিখনকে আর্ট হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। উপরন্তু আল-কুরআনের বহুল পরিমাণে অনুলিপি তৈরির প্রয়াসে বিভিন্নভাবে আরবী লিখনশিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। মসজিদ কিংবা প্রাসাদগাত্রে জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি উপস্থাপন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনভিপ্রেত হওয়ায় শিল্পীগণ আরবী লিখনশিল্পকে অলঙ্করণ[৯৯] বা সাজসজ্জার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন।[১০০]

---

[৯৭] *ইসলামী শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩-১৪।

[৯৮] *ইসলামী সভ্যতা ও শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০।

[৯৯] Muslim ornaments are distinct in character being purely of abstruct and geometric configurations as against anthropomorphous and figural. Both the Semetic abhorrence and the Islamic canonical ban on figural representations are said to have shaped the character of the Muslim ornaments. They are also distinct in execution bing in shallow relief and dominated by

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতেই মুসলমানরা আল-কুরআন পঠন-পাঠনের দিকে আত্মনিয়োগ করেন। তারা সুন্দর হস্তাক্ষরে কুরআন লিখন ও সংরক্ষণকে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে মনে করেন। তখন কলমের সাহায্যে কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ সুন্দরভাবে লেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে শিল্পীরা এ কাজে ব্যাপক অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কুরআনের বাণীর সাথে প্রথম দিকে কাতিবগণ ড্রইং এর পরিবর্তে লতা-পাতা ও আলপনার ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে কাতিবগণ কুরআনের বাণীকে এমনভাবে লিখতে শুরু করেন যাতে করে হরফ বা হরফ সমষ্টি নিজেই লতা-পাতা ও আলপনার রূপ লাভ করে। পবিত্র কুরআনের বাণী প্রচার ও প্রসার লাভের সাথে সাথে ক্যালিগ্রাফি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হয়ে উঠে। কেননা এতে করে কুরআনের বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আরবকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সূতিকাগার বলা যায়।

বিশেষত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য এবং বৈদেশিক শাসকবর্গের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পরস্পরের সাথে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে স্পষ্ট ও সুন্দর হাতেরলেখার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার জন্য মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.) কে নিয়োগ করেন। কারণ হযরত আলী (রা.) এর লেখা খুবই সুন্দর ও স্পষ্ট ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.) বিভিন্ন দেশের শাসকদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠান। এসব চিঠি বিশুদ্ধ, সাবলীল, মনোহর ও সুস্পষ্ট হরফে লেখা হয়েছিল।[১০১]

---

profuse use of colours. (Shah Muhammad Shafiqullah, *Calligraphic Art in Sultanate Archetecture*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2012, p.149)

[১০০] ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা* (রাজশাহী: সাজ্জাদুর রহিম, ১৯৯৬), পৃ.২৬৪।

[১০১] *ইসলামী শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা.) নিজে লিখতে পারতেন না। তাই তাঁর সাহাবীগণ আল-কুরআনের বাণী পাথর, দেয়াল কিংবা গাছের ছালে লিখে রাখতেন। যারা এসব আয়াত বা বাণী মনোরম ও সুন্দর করে লিখতেন তারাই ছিলেন কাতিব। রাসূল (সা.) এর জামাতা হযরত আলী (রা.)ও একজন ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি কুরআনের আয়াতকে চমৎকার করে লিখে রাখতেন। তিনি বলতেন, 'সুন্দর হস্তাক্ষর সত্যকে স্বচ্ছ করে তুলে।' রাসূল (সা.) এর সময়ে মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে ক্যালিগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফারদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। মুসলিম শাসকগণ শিল্পীদেরকে আর্থিক সহায়তা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন।[১০২]

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশধারার বর্ণনায় যদিও বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন- জাহেলী যুগ, ইসলামী যুগ, খোলাফোয়ে রাশেদীনের যুগ, উমাইয়া যুগ, আব্বাসী যুগ, ফাতেমী যুগ, উসমানী তুর্কী যুগ ও আধুনিক যুগ। তবে রাসূল (সা.) এর সময় থেকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ধাপে ধাপে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। উন্নয়নের এ ধারাগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির যুগকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়:

ক. প্রাথমিক যুগ: উমাইয়া খিলাফতের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৬১১-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

খ. উমাইয়া যুগ: উমাইয়া শাসনামল অর্থাৎ ৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

গ. আব্বাসী যুগ: আব্বাসী খিলাফত আমল অর্থাৎ ৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত

ঘ. আধুনিক যুগ: অর্থাৎ ১২৫০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

ক. প্রাথমিক যুগ

ইসলামের অভ্যুদয়ের পর রাসূল (সা.) এর যুগ থেকেই ক্যালিগ্রাফি বিশেষ মাত্রা পেতে শুরু করে। মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল (সা.) এর প্রতি যে প্রত্যাদেশ

[১০২] মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

অবতীর্ণ হয়েছে। সেখানে তিনি লেখাপড়া করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন-

-إقرأ باسم ربك الذى خلق- خلق الانسان من علق...الذى علم بالقلم

অর্থ- পাঠ কর! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি (তোমাকে) সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে।...যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।[১০৩]

ইসলাম পূর্ব যুগেই ভাস্কর্য ও চিত্রকলা মানসম্মত পর্যায়ে উপনিত হয়। কিন্তু এ দু'টি বিষয়ের প্রতি নিরুৎসাহিত তথা নিষিদ্ধ করায় শিল্পীগণ ইসলামী যুগে ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে শ্রম দিতে শুরু করেন। তাদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলে ক্যালিগ্রাফির চমৎকার সব ধারা সৃষ্টি হতে থাকে। রাসূল (সা.)-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ক্যালিগ্রাফির প্রসার ও বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন। তিনি নিরক্ষর আরবদের মধ্যে ক্যালিগ্রাফির প্রসার ও ব্যাপক প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণের পরপরই রাসূল (সা.) একে শিক্ষাগারে পরিণত করেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা.) কে ক্যালিগ্রাফি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়োগ দেন।[১০৪] তিনি ক্যালিগ্রাফিতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। বদর যুদ্ধে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন যুদ্ধবন্দিদের রাসূল (সা.) মসজিদে নববীতে মুসলিম বালকদেরকে শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে মুক্তিদানের সুব্যবস্থা করেন। তার মধ্যে ক্যালিগ্রাফি শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ থেকে ক্যালিগ্রাফির প্রতি রাসূল (সা.) এর ভালবাসা সহজেই অনুমেয় হয়।

তাঁর আমলে মদীনায় নির্মিত অন্য নয়টি মসজিদেও মসজিদে নববীর মত লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাসূল (সা.) শিক্ষিত সাহাবীদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করতেন। তাদের মধ্যে ক্যালিগ্রাফারগণও থাকতেন। যাতে তারা মাদ্‌রাসা নির্মাণ করে একে

---

[১০৩] *আল-কুরআন*, সূরা আলাক, আয়াত:১-৪।

[১০৪] ইযযুদ্দীন ইবনুল আছির, *উসদুল গাবাহ* (তেহরান: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি), খ.২, পৃ.১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারণ করতে পারে। বর্ণিত আছে- হযরত মা‘আয ইবনু জাবাল (রা.) লেখা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিকট একের পর এক কাতিবদের পাঠাতেন।[১০৫]

রাসূল (সা.) এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হলে তিনি নির্দেশ দিতেন সেগুলোকে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতেন। আর এজন্য তিনি কয়েকজন সাহাবীকে নিজের কাতিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তারা পবিত্র কুরআনের বাণীসমূহ চামড়া, পাথর, হাড় ও খেজুরের ডালপালা বা পত্রে লিখে রাখতেন। পবিত্র কুরআনের লিখিত এ অংশগুলো ছিল ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রাথমিক পর্যায়ের অনুপম নিদর্শন। নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, রাসূল (সা.)এর কাতিবদের সংখ্যা ছিল ৪৩ জন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

১. হযরত আবু বকর (রা.) (৫৭৩-৬৩৪ খ্রি.)
২. হযরত উমর (রা.) (৫৮১-৬৪৪ খ্রি.)
৩. হযরত উসমান (রা.) (৫৭৯-৬৫৬ খ্রি.)
৪. হযরত আলী (রা.) (৬০১-৬৬১ খ্রি.)
৫. হযরত আবু সুফিয়ান ইবন হারব ইবন উমাইয়া (রা.) (৫৮০-৬৪০ খ্রি.)
৬. হযরত মু‘আভিয়া (রা.) (৫৪৭-৬৮৩ খ্রি.)
৭. হযরত ইয়াজিদ ইবন আবি সুফিয়ান (রা.) (জ. ৬৩৯ খ্রি.)
৮. হযরত সা‘ঈদ ইবনুল ‘আস (রা.) (মৃ. ৬৭৮ খ্রি.)
৯. হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.) (৬১০-৬৬০ খ্রি.)
১০. হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) (৫৯৪-৬৫৬ খ্রি.)
১১. হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা.) (৫৯৪-৬৫৬ খ্রি.)
১২. হযরত সা‘দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) (৫৯৫-৬৬৪ খ্রি.)
১৩. হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা.) (৫৮৬-৬২৫ খ্রি.)

---

[১০৫] *উসদুল গাবাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২২।

Dhaka University Institutional Repository

১৪.হযরত আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) (মৃ. ৬২৯ খ্রি.)

১৫.হযরত উবায় ইবন কা'ব (রা.) (৬২০-৬৩৪ খ্রি.)

১৬.হযরত শুরাহবিল ইবন হাসানাহ (রা.) (৫৭৩-৬৩৯ খ্রি.)

১৭.হযরত আলা ইবনুল হাদরামী (রা.) (মৃ. ৬০৫ খ্রি.)

১৮.হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা.) (৫৮৩-৬৩৬ খ্রি.)

১৯.হযরত মুগিরা ইবন শু'বা (রা.) (৫৭৩-৬৩৪ খ্রি.)

২০.হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.)

২১.হযরত মা'আয ইবন জাবাল (রা.) (৬০৩-৬৩৯ খ্রি.)

২২.হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) (৫৯৪-৬৫৩ খ্রি.) প্রমুখ।

তাদের মধ্যে হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা.), হযরত উবায় ইবন কা'ব (রা.), হযরত মা'আয ইবন জাবাল (রা.) ও হযরত মু'আভিয়া (রা.) প্রায় অধিকাংশ সময় রাসূল (সা.) এর নিকট থাকতেন এবং লেখালেখির কাজে বেশি আঞ্জাম দিতেন।[১০৬] রাসূল (সা.) এর পর তাঁর খলীফা ও সাহাবীগণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্যালিগ্রাফির প্রসারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ফলে অতি অল্প দিনের মধ্যে নিরক্ষর আরবজাতির মধ্যে এমন অনেক লোক তৈরি হয় যারা লেখাপড়া শিখে ফেলে এবং তাদের মধ্যে জন্ম নেয় বিভিন্ন পর্যায়ের সুদক্ষ ক্যালিগ্রাফার। দিওয়ান লেখক, পত্র লেখক ও মুসহাফ লেখক তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[১০৭]

রাসূল (সা.) এর উপর অবতীর্ণ অহী, তাঁর মুখ নিঃসৃত অমর বাণীমালা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের নিকট চিঠি প্রেরণ এবং বিশেষতঃ হস্তলিখিত কুরআনের অনুলিপি করণের মাধ্যমেই ক্যালিগ্রাফি বিকাশ লাভ করতে থাকে। কুদরত উল্লাহ খোনসারী আরবী ও ফারসী ভাষার Writing style এর শিকড় খুঁজতে গিয়ে বলেন- 'It is in the period of prophet Mohammad (SM) the

---

[১০৬] মুহাম্মদ 'আলী আস-সাবুনী, *আত-তিবয়ান ফি উলুমিল কুরআন* (বৈরুত: আলামুল কুতুব, ১৯৮৫), পৃ.৫২।
[১০৭] *ইনতিশারুল খাত্তুল 'আরাবী ফিল 'আলিমিশ শারকী ওয়াল গারবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

Dhaka University Institutional Repository

writers of reavelation (Wahi) used the Arami or Hamidi or Nabati hand writing. After a words from the Arami hand writing a new style of hand writing was derived and originated. This was Kufic style of hand writing. For some centuries this was the common and unique written style of Arabic and Persian language.’[১০৮] রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে এ ধারা অব্যাহত থাকে। অতপর ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দীওয়ান বা রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ এবং নামের তালিকা প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রি বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু কাতিবের প্রয়োজন হয়, ফলে কোন বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ না করেও হস্তলিখন শিল্পের ক্রমোন্নয়ন সাধিত হতে থাকে।[১০৯]এ সময় প্রাদেশিক গভর্নরগণ নিজেদের জন্য কাতিব নিয়োগ করতেন। এভাবে তাঁর আমলেই বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ের সূত্র ধরে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি আরব দ্বীপের সীমানা অতিক্রম করে বহির্জগতে পদার্পন করে।

এরপর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আঞ্চলিক পরিভাষার মাধ্যমে পঠিত কুরআনের অনুলিপিসমূহকে বাতিল করে দিয়ে মহানবী (সা.) এর স্ত্রী হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত বিশুদ্ধ কপি হতে অনুলিপি প্রস্তুত করে সর্বত্র কুরআন শরীফ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ কাজে অনেক ক্যালিগ্রাফারকে নিয়োগ করা হয়। ফলে এ প্রক্রিয়াটি পরোক্ষভাবে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখে। তৎকালীন সীলমোহর, মনোগ্রাম, দলীল-দস্তাবেজ, রাজকীয় ফরমান, রাষ্ট্রীয়পত্র, নথিপত্র, স্থাপত্য বিষয়ক অলঙ্করণ যেমন- মসজিদ, রাজপ্রাসাদ, তোষাখানা প্রভৃতির দেওয়াল গাত্রে, কাঠের দরজায়, আসবাবে যেমন- সিন্দুকে আলমারীতে কিংবা সুসজ্জিত আসনে রুচিশীল নক্‌শার সাথে নামাঙ্করণের ক্ষেত্রে কোন মূল্যবান বাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করা হত।

---

[১০৮] ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ.২৫৫-২৫৬।
[১০৯] *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫-২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আলী (রা.) নিঃসন্দেহে একজন খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তাকে সকল শীর্ষ ক্যালিগ্রাফারদের আধ্যাত্মিক শিক্ষক বলে মনে করা হয়। তিনি প্রথম লিপিকে শিল্পমানে উন্নীত করেন। তাঁর খিলাফতকালে কুফায় চারুশিল্প ও ললিতকলার বেশ প্রসার ঘটতে শুরু করে। তদুপরি তখন ইরাক, পারস্য, সিরিয়া ও মিসর এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে আরবী ভাষার পাশাপাশি ইসলামী ক্যালিগ্রাফিরও প্রভূত বিস্তার লাভ করে। তিনি সেমিটিক লিপিকে আরবী লিপিতে সফলভাবে রূপান্তর করেন এবং একে শিল্পমানে উন্নীত করেন। এভাবে আরবী লিপি সেমিটিক লিপি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক লিপিতে রূপ লাভ করে।[১১০]

খ. উমাইয়া যুগ

চিত্র-৩: উমাইয়া যুগের কুফী রীতির ক্যালিগ্রাফি ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’

উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) ইসলামী ক্যালিগ্রাফির আরো উন্নয়ন সাধিত হয়। কারণ এ সময় আরবী ভাষা মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে। প্রশাসন কাঠামোর সর্বস্তরে আরবী ভাষা চালু হয়। ফলে একদিকে ধর্মীয় অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার কারণে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের জনজীবনের সর্বস্তরে আরবী একমাত্র ভাষা হিসেবে গৃহীত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা মাতৃভাষায় রূপান্তরিত হয়। এ যুগে খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফারগণের কঠোর সাধনা, গবেষণা ও অধ্যাবসায়ী অনুশীলনের ফলে আরবী ক্যালিগ্রাফি শিল্প হিসেবে একটি মানসম্পন্ন পর্যায়ে পৌঁছে। বাস্তবিক পক্ষে উমাইয়া যুগে কুফী রীতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগে হযরত আলী (রা.) এর সুযোগ্য অনুসারী আবুল আসওয়াদ আদ্ দুয়ালী (রহ.) কুফী লিপিরীতির উন্নতি সাধন করেন। তারপর প্রথিতযশা লিপিকার কুতবাহ আল-

---

[১১০] Annemarie Shcimmel, *Islamic Calligraphy* (Leiden: E J Brill, 1970), p.23.

Dhaka University Institutional Repository

মুহাররির কুফী রীতির চারটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অতপর এ যুগে যারা এ বিষয়ে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাদের মধ্যে খালিদ ইবনে হিয়াজ (রা.) ছিলেন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লিপিকার। রাসূল (সা.) এর মসজিদে সোনালি শিলালিপি তারই শৈল্পিক দক্ষতার পরিচায়ক। তিনিই সর্বপ্রথম সোনালি হরফে কুরআন শরীফের অনুলিপি তৈরি করেছেন। এ যুগে আরো যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে মালিক ইবনু দিনার, রাশিদ আল-বাসরী ও মাহদী আল-কুফী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১১১]

ইসলামের আবির্ভাব ঘটে খুবই সরল ও অনাড়ম্বর ধর্ম হিসেবে, নিরাভরণ মরুচারী আরব জীবনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আরবদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে এ অনাড়ম্বর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। সৃষ্টি হয় ইসলামী নক্শাকলা, মৃৎপাত্র ও বয়নশিল্প। শাসকগোষ্ঠীর মনে জাগে জীবনকে অলঙ্কৃত করার নানা অভিলাষ। উমাইয়া আমলের শিল্পকলা ছিল বাইজান্টাইন প্রভাবে প্রভাবিত।[১১২] এ যুগে আরবী লিপি বিভিন্ন জড়তা ও সেকেলে অবস্থা (Primitiveness) থেকে পরিত্রাণ পেতে থাকে। সেই সাথে ভাষাকে আরো গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য সহজতর পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা অব্যাহত থাকে।[১১৩] এ আমলে আরবী লিপিতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংযোজন ও দিক দেখা যায়। সেগুলো হলো-

১. ইজাম[১১৪](Letter-Pointing): একই ধরনের আকৃতি সম্পন্ন বর্ণগুলোকে পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য বিন্দু প্রয়োগ করাকে ইজাম বলে। আরবী বর্ণমালার ২৯টি হরফের মোট ১৯টি আকার রয়েছে। তার মধ্যে কোন কোন আকৃতিতে ২টি করে বর্ণ লেখা হয়। যেমন- د د, رز, س

---

[১১১] নূরুল ইসলাম, *কুফী লিপি রীতি, উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ-০৪), পৃ.৩৮।

[১১২] এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮), পৃ.২৭।

[১১৩] *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৫-২৬৬ ।

[১১৪] ইজাম: এটি আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ অস্পষ্টতা দূরীভূত করা। আরবদের প্রচলিত প্রবচন-اعجمت الكتاب। (অর্থ- আমি গ্রন্থের অস্পষ্টতা দূরীভূত করলাম) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। হরফে নুকতার প্রয়োগ বা বর্জনের মাধ্যমে হরফগুলোর অস্পষ্টতা দূরীভূত করা হয় বিধায় এগুলোকে হরুফে মু'জাম বলে। (আবুল ফাদল জামালুদ্দীন ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব* (ইরান: নাশরু আদাবিল হাওযা, ১৪০৫ হি.), খ.১২, পৃ.৩৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

ش, ض ص, ظ ط, غ ع আবার কোন কোন আকৃতিতে ৩টি করে বর্ণ লেখা হয়। যেমন- ب ت ث ও ج ح خ তবে কোন আকৃতিতে শুধু ১টি করে বর্ণই লেখা হয়। আর তা হলো- ا

ইজামের যথেষ্ট গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হযরত উসমান (রা.) একবার জনৈক ব্যক্তিকে মিসরের গভর্ণররূপে নিয়োগ ও প্রেরণ প্রসঙ্গে লিখেন- اذا جاءكم فاقبلوه অর্থ- সে যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাকে বরণ করে নিবে। লোকেরা একে এভাবে পড়লো- اذا جاءكم فاقتلوه অর্থ- সে যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাকে হত্যা করো। আর এটাই ছিল তার মহাবিপর্যয়ের কারণ। যাতে শেষ পর্যন্ত তাকে প্রাণও দিতে হলো। উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আমলে ইরাকের গভর্নর ইউসুফ আস-সাকাফী (৬৬০-৭১৪ খ্রি.) আরবী ভাষাকে সর্বজনীন ও সহজকরণে সর্বপ্রথম ইজামের প্রচলন করেন। তবে অনেকের মতে- ইজাম ইবনু মারওয়ানের খিলাফতের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল।[১১৫] আবার কেউ কেউ বলেন- হরফের উৎপত্তির সাথে সাথেই নোক্তার ব্যবহার শুরু হয়।

২. তাশকীল[১১৬](Vocalization): সূচনালগ্ন থেকে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত আরবী হরফে কোন হরকত (জবর, যের ও পেশ) ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। যেমন- কেউ যদি حمل শব্দটি লিখে তাহলে এটা জানার কোন সুযোগ নেই যে, এটি কি اسم (বিশেষ্য পদ), নাকি فعل (ক্রিয়াপদ) আর فعل হলে তা معروف (কর্তৃবাচ্য) নাকি مجهول (কর্মবাচ্য)। আরববাসীগণ তাদের স্বভাবগত মেধা ও যোগ্যতা বলে শব্দগুলোকে সুন্দর ও বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করতে পারত। ফলে তখন আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণের জন্য হরকত আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের আমলের শেষের দিকে যখন ইসলামের আলো বিভিন্ন দিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল এবং আরব-অনারব দেশসমূহ একের পর এক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া শুরু

---

[১১৫] নাসীরুদ্দীন আল-আসাদ, *মাসাদিরু শি'রুল জাহিলী* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৬), পৃ.৩৪-৪১।

[১১৬] তাশকীল: এটি আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হরফে হরকত প্রদান করা। আরবদের প্রবচন- شكلت الكتاب واشكلته (অর্থ- আমি গ্রন্থটিকে হরকত প্রদান করলাম) থেকে গৃহীত হয়েছে। (*লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ.৩৫৮)।

Dhaka University Institutional Repository

করল। তখন সর্ব সাধারণের মাঝে বিশেষত- পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে ভুল-ভ্রান্তি হতে লাগল। ফলে কুরআনের শব্দরূপ নির্ধারণে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি হয়। এক ব্যক্তি আল-কুরআনের আয়াত ان الله برئ من الله ورسوله (সূরা তাওবাহ, আয়াত-৩)-এর رسوله শব্দটির ل কে যের দিয়ে পড়েছে। যার অর্থ উদ্দিষ্ট অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে আবুল আসওয়াদ খুবই মর্মাহত হন। তিনি বুঝতে পারলেন যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যথাশীঘ্র এর সমাধান করা উচিত। অতপর তিনি গভর্নর যিয়াদকে বলেন- কাজটি খুবই দ্রুত সমাধান করা উচিত।

৩. হরফের ধারাক্রম: বর্তমানে আমরা আরবী হরফের যে ক্রমধারা পেয়েছি প্রথমে তার প্রচলন ছিল না। প্রাচীন যুগে আরবী হরফের আবজাদি[১১৭] বিন্যাস প্রচলিত ছিল। বর্তমানে প্রচলিত ক্রমবিন্যাসটি উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আমলে নসর ইবনু আসিম ও ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামুর আল-উদ্‌ওয়ানী প্রমুখ উদ্ভাবন করেন। এতে সম-আকৃতি বিশিষ্ট হরফগুলো পাশাপাশি রাখা হয়েছে। যেমন- আবজাদি বিন্যাসের আদি হরফ আলিফ ও বা দ্বারা আরবী হরফসমূহের এ নতুন বিন্যাস প্রক্রিয়াও সূত্রপাত হয়েছে। এরপর 'বা' এর সম-আকৃতির 'তা' ও 'ছা'কে রাখা হয়েছে। তারপর 'জিম' হরফটি উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তার সম-আকৃতির 'হা' ও 'খা'কে রাখা হয়েছে। অতপর 'দাল' এর পর 'যাল' উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'হা' হরফটি যেহেতু কোথাও কোথাও হরফে ইল্লত (Vowels) এর মত অন্তর্নিহিত তাই সেগুলোর পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে 'রা' ও 'যা' কে একসাথে রাখা হয়েছে।

৪. লেখার নব নব পত্রের উদ্ভাবন: ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশের সূচনালগ্নে প্রাচ্যের দেশসমূহে লেখার পত্র হিসেবে শুধু প্যাপিরাস ব্যবহৃত হতো। ধারণা মতে, চীনারাই সর্বপ্রথম কাগজ উৎপন্ন করেছিল। আরব ব্যবসায়ীরা প্রথম প্রথম দেশের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সেখান থেকে কাগজ আমদানি করত। মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম কাগজ উৎপন্ন হয় সমরকন্দে। হিজরী ৮৭ সালে আরবরা

---

[১১৭] আবজাদি: মুখস্ত করার সুবাদে আরবী ভাষার ২৮টি হরফকে ভাগ করে যে ৮টি শব্দে বিন্যস্ত করা হয়েছে আবজাদ তার মধ্যে প্রথম শব্দ। আরব-মাশরিকে এ শব্দগুলোর সাধারণত ক্রম এরূপ: ابجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت ثخد ضظغ

Dhaka University Institutional Repository

এটি জয় লাভ করে। ১৩৪ হিজরীতে চীনা পদ্ধতিতে লিনেন, শন বা শন জাতীয় আঁশ বা ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা তৈরি কাগজ শিল্পের প্রবর্তন করে।[১১৮]

৫. বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ও শৈলীর আবির্ভাব: উমাইয়া যুগের শ্রেষ্ঠতম ক্যালিগ্রফার হলেন- কুতবাহ আল-মুহাররির।[১১৯] তিনি সর্বপ্রথম আল-খাত্তুল জলিল লিপিশৈলী উদ্ভাবন করেন। এটি একটি বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট লিখনরীতি। এ লিপি দ্বারা মিহরাব, মসজিদ ও দালানের দেয়ালে লেখা হত।

কিছুদিন পরই তিনি এর চেয়েও অপেক্ষাকৃত ছোট লিখনরীতির উদ্ভাবন করেন। যার নাম 'তুমার[১২০] লিপি'। অতপর ক্রমান্বয়ে মুখতাসারু তুমার, মুহাক্কাক, ইশআর, আশরিবাহ, সুমায়ঈ, মুদাওয়ার ও নরজসি ইত্যাদি লিখনরীতি উদ্ভাবন করেন। সম্ভবত ১৩৬ হিজরীতে তিনি সুলুস ও সুলুসাইন রীতিদ্বয়ও উদ্ভাবন করেন। সুলুস লিপিশৈলী থেকে সুলুসে খাফীফ ও সুলুসে ছাকীল এবং পরবর্তীকালে ছাকীল থেকে মিফতাহ, যনবুরী ও হারাম লিপিরীতি সৃষ্টি হয়। আবার হারাম থেকে উহুদ লিপিরীতি তৈরি হয়। আর সুলুসাইন থেকে ক্রমান্বয়ে মুআমরাত, মানসুর, দিবাজ ও খিরফাজ প্রভৃতি লিখনরীতি সৃষ্টি হয়।[১২১]

উমাইয়া যুগের খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে খালিদ ইবনুল হাইয়াজ উল্লেখযোগ্য। তিনি পবিত্র মুসহাফ লেখার জন্য জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। খলিফা ওয়ালিদ তাকে কুরআন, কবিতা,

---

[১১৮] ইসলামিক ফাউন্ডেশন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.২, পৃ.৪৩৫।

[১১৯] মুহাররির অর্থ লেখক। ইসলামের প্রাথমিককালে এ শব্দটি সুদক্ষ ক্যালিগ্রাফারদের উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আর কুতবাহ ছিল এ উপাধিতে ভূষিত সর্বপ্রথম নিপুণ ক্যালিগ্রাফার। এর দীর্ঘদিন পর এ শব্দের পরিবর্তে সুদক্ষ ক্যালিগ্রাফারদের জন্য একচ্ছত্রভাবে খাত্তাত (Calligrapher) শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। (মাহমুদ শুকর জাব্বুরী, *আল মুফাসসাল ফী তারিখিল 'আরব ক্বাবলাল ইসলাম*, বৈরুত: দারুল 'ইলম, ১৯৭১, খ.১, পৃ.১৩৮)।

[১২০] তুমার: তুমার শব্দের অর্থ- এক হাত প্রস্থ বিশিষ্ট বড় ধরনের পাতা। খলীফাগণ বিভিন্ন অনুলিপি, রাজা-বাদশাহ ও বিশিষ্ট লোকদের নিকট প্রেরিত চিঠি-পত্র ও নির্দেশনামা ইত্যাদিতে স্বাক্ষর করার কাজে এ লিপি ব্যবহার করতেন। (মুহাম্মদ আরশাদুল হাসান, *আল-ওয়াজিযু ফী তারিখিল খাত্তিল 'আরাবী*, ঢাকা: নুন ওয়াল-কালাম পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ.৩৮)।

[১২১] *আল-খাত্তুল 'আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬২।

Dhaka University Institutional Repository

আরবদের ইতিহাস ও দৈনন্দিন ঘটনাবলি লেখার কাজে নিজ দরবারে নিয়োগ দান করেছিলেন। তিনি মসজিদে নববীর কিবলার দিকের দেয়ালে পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শামস থেকে শেষ পর্যন্ত মোট ২৪টি সূরার ৯৩টি আয়াত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[১২২] আবু ইয়াহইয়া মালিক ইবনু দিনার আল-ওয়াররাক ও শুয়াইব ইবনু হামযা আল-কাতিবও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন। মালিক ইবনু দিনার খুবই ধার্মিক ও ইবাদতকারী ছিলেন। তিনি স্বহস্তে লেখা কুরআন বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[১২৩] শুয়াইব ইবনু হামযা সুন্দর ক্যালিগ্রাফির জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি খলিফা হিশামের ব্যক্তিগত কাতিব ছিলেন।

গ. আব্বাসী যুগ

আব্বাসী আমল (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) ছিল ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক উন্নতির যুগ। এ যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় আরবী লিপিরও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন রীতি বা শৈলীর উদ্ভব হয় এবং শৈল্পিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যের চরম বিকাশ ঘটে। সেই সাথে ক্যালিগ্রাফির সৌন্দর্য, রূপসজ্জা ও কুরআনসহ অন্যান্য গ্রন্থের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির জন্য বাধাইশিল্পেরও সূচনা হয়। তাছাড়া এ যুগে প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ খলীল ইবনে আহমদ (মৃ.৭৮৬ খ্রি.) এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কুফী লিপিশৈলীর উৎকর্ষতার চরম শিখরে পৌঁছে।

এ যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। সেজন্য লিখনশিল্পকে আরো স্পষ্ট, সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সময় ক্যালিগ্রাফারগণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বিভিন্ন প্রশাসনিক অফিসে সরকারী চিঠিপত্র ও দলীল-দস্তাবেজের অনুলিপি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ক্যালিগ্রাফারদের নিয়োগ দেয়া হতো। যাদের হস্তলিখন দ্রুত ও সুন্দর হতো তারা অধিক মর্যাদার অধিকারী হতেন এবং অর্থ

---

[১২২] *আল-ফিহরিস্ত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬।
[১২৩] আবু আবদুল্লাহ কুতায়বা, *আল-মা'আরিফ*, পৃ.৪৭০ও ৫৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জন করতে পারতেন। এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থাদি বিভিন্ন ভাষা হতে আরবী ভাষায় অনুদিত হতো। মুদ্রণ যন্ত্র ও ছাপাখানার অভাবে এসব গ্রন্থের অধিক পরিমাণে অনুলিপি ক্যালিগ্রাফারদের দ্বারা সম্পন্ন করা হতো।[১২৪]

আব্বাসী আমলে অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপিগুলোকে আরবরা যাতে সহজে বুঝতে পারে ও জ্ঞানকে সহজবোধ্য করতে পারে, সে লক্ষ্যে শাসকরা চিত্রিত পাণ্ডুলিপিকে অনেক সংখ্যায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন হিফজ করে যারা হাফেজ হয়েছেন তাদের মত একই পর্যায়ের সম্মানে ক্যালিগ্রাফারগণ সম্মানিত হন।[১২৫] এ যুগে স্বরচিহ্নের প্রয়োগগত সমস্যার সমাধানকে ক্যালিগ্রাফির গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইতোপূর্বে হরফের বিপরীত রঙের কালি দিয়ে নোক্‌তা যোগে স্বরচিহ্ন প্রয়োগ করা হতো। এতে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় হতো।
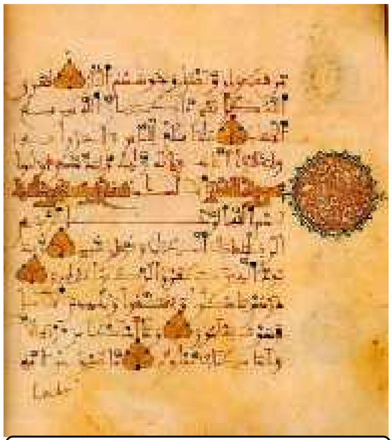
চিত্র-৪: ত্রয়োদশ শতাব্দীর আন্দালুসীয় ক্যালিগ্রাফি

এ অবস্থায় লিখনশিল্পের গতি সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের লিপিপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এ সময় থেকে এমন সব নব নব ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা সংঘটিত হয় যা ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তখন বাগদাদ ছিল ইসলামী ক্যালিগ্রাফি উৎপাদনের বিরাট কারখানা স্বরূপ। সুদীর্ঘ ৫০০ বছর যাবত বাগদাদ ছিল আব্বাসী খলীফাদের রাজধানী। এ সময় বাগদাদে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চারুকলা হিসেবে সুসংহত হয় এবং এ শিল্পের অনেক উস্তাদ শিল্পীর আবির্ভাব ঘটে ও তাদের নিকট অসংখ্য শিক্ষার্থী উস্তাদদের অনুসারী হিসেবে তাদের প্রবর্তিত শিল্পরীতিকে এগিয়ে নেন। ফলে নতুন নতুন রীতির উদ্ভব ঘটতে থাকে এবং তা

---

[১২৪] *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭-৮৯।

[১২৫] *ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি), ব.৩, স.১, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল পুরনো রীতিসমূহের উপর প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। এসব পরিবর্তন সাধারণত তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। যথা-

প্রথমত: রাজনীতিবিদ, কবি ও ক্যালিগ্রাফার আবু আলী ইবনে মুকলাহ (মৃ. ৯৪০ খ্রি.) এবং তাঁর ভাই আলেম ও ক্যালিগ্রাফি শিল্পী আবু আব্দুল্লাহ ইবনে মুকলাহ'র (মৃ. ৯৪৯ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য অবদান। এ ভ্রাতা শিল্পীদ্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি ফর্মে অনুপাত বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি প্রদান করা। যা লিপিকে পুনরাবৃত্তির উপযোগী করে তুলে এবং পঠনে অধিক সহজবোধ্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। যদিও এ ভ্রাতৃদ্বয় এ রীতি গড়ে তুলতে পুরোপুরি সফল হননি, তথাপি অনুপাতভিত্তিক লিখনের বিষয়টি শুধু তাদের দু'জনের সাথেই সম্পৃক্ত। এ ছাড়াও ক্যালিগ্রাফির জন্য গৃহীত ও সর্বজনস্বীকৃত 'আকলামুস সিত্তাহ' তথা মুহাক্কাক,[১২৬] রায়হানী,[১২৭] সুলুস, তাওকী,[১২৮] রুক'আহ[১২৯] ও নাসখী[১৩০] এ ছয়টি লিপিশৈলী নির্বাচনও তাদের অবদান। যা

---

[১২৬] মুহাক্কাক: মুহাক্কাক শব্দের অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সৃষ্ট বা নির্ভুলভাবে উৎপন্ন রীতি। সুলুস ও নাসখী লিপির শৈল্পিক গুণাবলীর সমন্বয়েই এ লিপিশৈলীর উদ্ভব। এর উল্লম্ব রেখা একটু বেশি লম্বা এবং বক্র উপলাইনগুলো নমনীয় বক্রতায় লম্বাভাবে হয়ে ঠিক প্রবাহের মত সৃষ্টি করে। এর ঋজুদণ্ড এবং বক্রাকৃতি রেখা ও আনুভূমিক বাহুর আনুপাতিক ব্যবহার হয় যথাক্রমে তিন চতুর্থাংশ ও এক চতুর্থাংশ। এর হরফগুলো বেশ বলিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট। (*ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪)

[১২৭] রায়হানী: রায়হানী লিপিশৈলী নাসখী লিপি হতে উদ্ভুত হলেও সুলুস ও মুহাক্কাক-এর সাথে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এর উপলাইনগুলো নাসখীর মত। উল্লম্ব রেখাগুলো সুলুস এবং বক্র ঢালগুলো মুহাক্কাক লিপির মত। এর সাথে স্বরচিহ্ন বা তাশকীলগুলো আলাদা ছন্দায়িত লালিত্যের জন্য অনেকে এর উৎস আল-রায়হান বা কলমিলতা মনে করেন। (*মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০)

[১২৮] তাওকী': তাওকী' অর্থ- হাল্কা বা ছোট্ট, স্বাক্ষর বা Signature। এ লিপির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর খাঁড়া দণ্ডগুলো রুক'আহর দণ্ড অপেক্ষা প্রচলিত। হরফগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িত সুষম ও সমন্বিত। আনুপাতিক হারে সরল ও সোজা দণ্ডের ব্যবহার হবে শব্দ সমষ্টির এক চতুর্থাংশ। আর গোলায়িত অংশ ও আনুভূমিক বাহুর ব্যবহার হবে তিন চতুর্থাংশ। এর উল্লম্ব দণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে জড়িত ও সমন্বিত হয়ে থাকে। এ লিপিকে রিয়াসী বা কার্যনির্বাহীও বলা হয়। *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫)

[১২৯] রুক'আহ: রুক'আহ শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রপাতা। এর হরফগুলো জ্যামিতিক গঠনের মত এবং পূর্ণ হরফগুলো তেজোদীপ্ত। এ লিপির উল্লম্ব রেখার মাথায় আঁকশী বা কাটা থাকেনা। মাঝের কাঁসাকৃতি অংশগুলো ভরাট হয়ে থাকে। এর বন্ধনীগুলো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ লিপিতে শব্দের শেষ হরফকে পরের শব্দের প্রথম হরফের সাথে মিলানোর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এর রেখাগুলো সর্পিল সর্পের মত লীলায়িত ভঙ্গিতে অথবা জলধারার তরঙ্গের মত সাবলীল ছন্দে প্রসারিত। (*ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫)

[১৩০] নাসখী: নাসখ শব্দের অর্থ নকল করা বা অনুলেখন। বর্ণমালার লম্ব ও আনুভূমিক বাহু ঢালু করে যদি উপস্থাপন করা হয় এবং তাতে কোনরূপ কোণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে তাকে নাসখী লিপি বলে। এ লিপির

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে এ লিপিশৈলীগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।[১৩১]

দ্বিতীয়তঃ আব্বাসী আমলের প্রথম দিকের দু'জন ক্যালিগ্রাফার ছিলেন সিরীয় বংশোদ্ভূত। তারা হলেন- আল-দাহ্হাক ইবনে আযলান এবং ইসহাক ইবনে হাম্মাদ। শিল্পসম্মত উপস্থাপন ও দক্ষ হাতের ক্যালিগ্রাফির জন্য তারা দু'জন সুপরিচিত ছিলেন। এর মধ্যে ইসহাক তাঁর হরফের তীক্ষ্নতা ও স্পষ্ট লাইনের জন্য সুলুস লিপিতে সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সুলুস ও সুলুসাইন লিপিকে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত করেছিলেন। তাঁর ছাত্র ইউসুফ আস-সাজ্জী (মৃ. ৮২৫ খ্রি.) এ লিপির দু'টি নতুন ধারার উদ্ভাবন করেন। যাকে 'খাফীফ আল-সুলুস' এবং 'খাফীফ আল-সুলুসাইন' বলা হয়। তিনি 'জালীল' লিপিরও সংস্কার করেন। এর লাইনের প্রশস্ততাকে মসৃণ এবং গোলায়িত অংশকে আরো সুন্দর করেন এবং বড় মাথাওয়ালা হরফকে একটু ডিম্বাকৃতি করে দেন। ফলে এটি একটি আকর্ষণীয় লিপিতে পরিণত হয় এবং এটি দ্রুত খলীফা আল-মানসুরের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) উজির 'ফাদল ইবন সাহল' এর নজর কাড়ে। তিনি এ লিপিকে সরকারী অফিসে ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং এর নাম দেন 'রিয়াসী' বা কার্যনির্বাহী।

ক্যালিগ্রাফির ক্ষেত্রে ইবরাহীম আস-সাজ্জী ও তাঁর ছাত্র ইবনু মুকলাহ'র শিক্ষক আল-আহওয়াল আল-মুহাররির প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ইবরাহীমের নিকট থেকে সুলুস ও সুলুসাইন লিপিদ্বয় শিক্ষা লাভ করেন এবং এতদুভয় থেকে 'কালামুন নিস্ফ' নামে লিখনরীতি উদ্ভাবন করেন। এছাড়া তিনি মুসালসাল, ঘুবার আল-হালবাহ, মুআমিরাত, কাসাস ও হাওয়ায়িজি ইত্যাদি নামে আরো কতগুলো লিপিরীতি উদ্ভাবন করেন।

আনুভূমিক ও উল্লম্ব রেখাগুলো সামনে পেছনে সর্বত্র সমান। এ উল্লম্ব ও আনুভূমিক বক্রতাও গভীর ও সমান্তরাল। এর শব্দগুলো পরস্পর ফাঁক ফাঁক ও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। এ লিপিশৈলীতে স্বরচিহ্ন বা হরকত ও বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। (*ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪)

[১৩১] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস*, ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়তঃ ইউসুফ আস-সাজ্জীর ভাই ইবরাহীম আস-সাজ্জীও (মৃ. ৮১৫ খ্রি.) একজন খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তাঁর প্রিয় ছাত্র আল-আহওয়াল আল-মুহারবির অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি রিয়াসী লিপিকে সংস্কার ও উপযোগী করে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহার করেছেন। তাঁর এ লিপিবৈচিত্রে গদ্য রচনা, কাব্য সংকলন, নিবন্ধ ও ধর্মীয়গ্রন্থ এমনকি কবুতর ডাকবার্তায় এক নতুন আবহ তৈরি করে। ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কারসিভ বা গোলায়িত ধারায় কয়েকটি নতুন শৈলীর আবির্ভাব ঘটে।[১৩২]

আব্বাসী শাসনামলের সবচেয়ে কীর্তিমান ক্যালিগ্রাফার হচ্ছেন ইবনে মুকলাহ (মৃ. ৯৪০ খ্রি.)। তিনি আল-আহওয়াল আল-মুহাররিরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে চূড়ান্ত রূপ দান করেন। তাঁর পরবর্তীকালের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার হলেন আলী ইবনে হিলাল (মৃ. ১০২২ খ্রি.)। যিনি ইবনুল বাওয়াব নামে পরিচিত। তিনি ক্যালিগ্রাফি শিল্পে সৌন্দর্য বর্ধন করেন এবং ইবনে মুকলাহ ভ্রাতৃদ্বয়ের শিল্পরীতিকে অধিকতর পরিমার্জিত করেন। তাছাড়া 'আল-মানসুব আল-ফায়িক' বা স্বচ্ছন্দ বা সু-আনুপাতিক মানসুব নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ অভ্যন্তরীণ চিত্রকর (Interior Painter)। তিনি পবিত্র কুরআন মজিদের ৬৪টি কপি নিজ হস্তে করেছিলেন। এছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের উন্নততর পদ্ধতি শিক্ষাদান, উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে পূর্ণতাদান ও এর ব্যাপক প্রচলন করেন। এ আমলের আরেকজন কীর্তিমান ক্যালিগ্রাফার হচ্ছেন মাসুদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাতিব আল-ইস্পাহানী। যিনি মুহাক্কাক লিপিতে কুরআন শরীফ লিখেন।[১৩৩]

আব্বাসী আমলের শেষ দিকে ইয়াকুত আর-রুমী আল-হামাভি আল-বাগদাদী (মৃ. ৬২১ হি.) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে অভিনবত্ব ও উৎকর্ষের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পদার্পন করে। তারপর জামালুদ্দীন

---

[১৩২] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১।
[১৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াকুত আল-মুস্তা'সিমী (মৃ. ১২৯৮ খ্রি.) এর হাতে আরো অধিকতর লালিত্য ও সুষমামণ্ডিতরূপে প্রকাশ পায়। তিনি এ যুগের সবচেয়ে খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তাঁর পূর্ণনাম ইয়াকুত ইবনু আব্দুল্লাহ আল-মুস্তা'সিমী। তিনি রোমীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। খলীফা মুস্তা'সিম বিল্লাহ তাকে ছোট বেলায় ক্রয় করে নিয়ে লালন-পালন করেছিলেন বলে তাকে 'আল-মুস্তা'সিমী' বলা হয়। তিনি ইবনুল বাওয়াবের ঐতিহ্যিক ধারাকে আরও শাণিত করেন এবং ছয়টি লিপিশৈলীরই পরিপূর্ণতা দান করেন। তিনি কলমের মাথাকে তীর্যকভাবে কাটেন এবং নতুন লেখা ও নতুন পদ্ধতিতে বিন্যাস করেন। তাই তাকে 'কিবলাতুল কুত্তাব' উপাধি দেওয়া হয়।[১৩৪]

আল-মুস্তা'সিমীর পর ছয়জন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফারের জন্ম হয়। তারা প্রত্যেকেই এককেজন এককে লিপিতে পারদর্শিতার ছাপ রাখেন। তারা হলেন-

সুলুস লিপিতে- ইয়াহ্ইয়া আস-সুফি

নাসখী লিপিতে- আবদুল্লাহ আস-সায়রাফি

রায়হানী লিপিতে- মুবারক শাহ্ আস-সায়ুকী

মুহাক্কাক লিপিতে- আবদুল্লাহ আরগুন

তাওকী' লিপিতে- মুবারক শাহ্ কুতুব

রুক'আহ লিপিতে- আহমদ সোহরাওয়ার্দী তাইয়িব শাহ্।[১৩৫]

তৎকালীন ইসলামী জাহানের কেন্দ্রীয় এলাকা ছাড়াও অন্যান্য এলাকায় বিচিত্র ধরনের লিখনরীতির উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন রীতি ছিল উত্তর আফ্রিকান, আন্দালুসীয় ও পশ্চিম আফগানিস্তান রীতি। যা মূলত অনেকগুলো রীতির সমষ্টি। এগুলোর নাম বেশ জটিল হওয়ায় এগুলোকে 'মাগরিবী' রীতি নামেও অভিহিত করা হয়। যাতে

---

[১৩৪] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, পৃ.৩৩।

[১৩৫] *আল-খাত্তুল 'আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০।

Dhaka University Institutional Repository

বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্রলিপি অন্তর্ভুক্ত আছে। সাধারণত ভোতা ডগা বিশিষ্ট কলম এবং বাদামী রংয়ের কালি দ্বারা এসব লিপি লেখা হয়। এছাড়া চীনা মুসলমানরাও ক্যালিগ্রাফির ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব লিপিশৈলী উদ্ভাবন করেন যা মূলধারা থেকে স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে কলমের পরিবর্তে ব্রাশ ব্যবহার করা হয়। যা একটি জীবন্ত ঐতিহ্য হিসেবে আজও টিকে আছে। ১৩৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে 'শেখ হামদুল্লাহ' নামক আনাতোলিয়ার একজন ক্যালিগ্রাফার এ শিল্পের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং মাত্র দু'বছরের মধ্যে এ কাজ সম্পাদন করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উমাইয়া যুগের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার কুতবাহ আল-মুহাররিরের হাত ধরে ক্যালিগ্রাফি যে মৌলিকত্ব অর্জন করে এবং বিভিন্ন নিয়ম-কানুন রচিত হয়, আব্বাসী আমলে দাহ্হাক ইবনু আযলান, ইবনু হাম্মাদ, ইবনু মুকলাহ, ইবনুল বাওয়াব ও ইয়াকুতের মাধ্যমে তা আরো সুষমামণ্ডিত হয় এবং বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তী যুগে ক্যালিগ্রাফারগণ পূর্বসূরীদের উদ্ভাবিত লিখনপদ্ধতি বা লিপিশৈলীর চর্চা ও বিকাশধারা অব্যাহত রাখেন।

ঘ. আধুনিক যুগ

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ক্যালিগ্রাফির আধুনিক যুগ শুরু হলেও মূলত উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশের দশক পর্যন্ত সময়কালটি হচ্ছে এ শিল্পের পরিপূর্ণতা অর্জনের যুগ। এ সময় এমন সব শিল্পকর্ম তৈরি হয় যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল শিল্পকর্মকে ম্লা ান করে দেয়। এসব শিল্পকর্ম ক্যালিগ্রাফি শিল্পের জন্য একটি স্থায়ী মানদণ্ড স্থাপনে সক্ষম হয়। বিশেষ করে তুর্কী খিলাফতের অবসানের পর থেকে এর পুনরুজ্জীবন ঘটে। আরব জাতীয়তাবাদের বহুধা বিভক্ত অঙ্গনে তারই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ঘটেছে বিমূর্ত চিত্রাঙ্কনের পটভূমিকায়; অক্ষর সৌন্দর্য বা কালিমার মহিমা আরোপের সার্থক সমন্বয়ে। প্রথমে লেবাননের শিল্পীরা এবং পরবর্তীকালে জর্দান, মিসর, ইয়েমেন, ওমান, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার এসব দেশের প্রতিভাবান কোন কোন শিল্পী আরবী রেখালিপির ট্রাডিশনকে পুনরুজ্জীবিত করার পরীক্ষা-

Dhaka University Institutional Repository

নিরীক্ষায় লিপ্ত হন যে, আধ্যাত্মবোধের চেয়ে ঐতিহ্য চেতনাই তাদের প্রধান উপজীব্য বলে মনে হয়। বিশেষত ইরানে আধুনিক ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ঐতিহ্যগত শুদ্ধতা অনেক বেশি অবদান রেখেছে বলে ধারণা করা হয়।[১৩৬]

ইসলাম প্রচারই হলো আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রসার ও উন্নতির একমাত্র লক্ষ্য। এর মাধ্যমে ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং তা উন্নতির চুড়ান্ত শিখরে পৌঁছে যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে তা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পূর্বদিকে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও মালাই দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত পশ্চিমে মরক্কোর প্রত্যন্ত অঞ্চল ও আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত, উত্তরে তুর্কিস্তানের উচ্চভূমি থেকে ইউরোপ পর্যন্ত এবং দক্ষিণে জাঞ্জিবারের নিম্নভূমি পর্যন্ত সুবিশাল এলাকায় তার চর্চা হয়ে থাকে। তদুপরি তা প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী ও নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ অতিক্রম করে সুদূর আমেরিকায়ও পদার্পন করে। এ বিস্তীর্ণ এলাকার বিভিন্ন ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের অসংখ্য জাতি যেমন- আরব, তুর্কী, পারসিক, ইন্ডিয়ান, মালয়, আফগান, তাতার, কুর্দি, মুঘল, বার্বার, সুদানী, হাবশী ও সাওয়াহিলি ইত্যাদি আরবী লিপি ও বর্ণমালা ব্যবহার করতে থাকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে আরবী বর্ণমালায় লিখিত ভাষার সংখ্যা একশতের কম নয়।[১৩৭]

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক তুর্কী বিশেষজ্ঞ মরহুম মাহমুদ ইয়াযীর মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু আরবরাই নয় বরং তুর্কী, ইরানী, মিসরীয়, তিউনিসীয়, আলজেরীয়, মরক্কান, আন্দালুসীয়, আফগান, মধ্য এশীয়, ভারতীয়, জাভানীজ, কুর্দী, লায, বুলগেরীয়, পোমাক, বসনীয়, আলবেনীয় ও সির্কাসীয় নির্বিশেষে সকল মুসলিম জাতির লোকেরাই ক্যালিগ্রাফি শিল্প তৈরি করেছেন। এসব জাতি ছাড়াও আরো অনেক জাতির মধ্যে এমন অসংখ্য মহান অলঙ্করণ শিল্পী, চিত্রশিল্পী, ধর্মীয় পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি, বাদক, গায়ক, চিকিৎসক, শাসক,

---

[১৩৬] *ক্যাটালগ: নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৬ (ঢাকা: সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র), পৃ.৩।
[১৩৭] *আল-কুরআন ফি কুল্লি লিসান* (দাক্ষিণাত্য: হায়দরাবাদ, ১৯৪৬), পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

পীর, মাশায়েখ, ধর্মতাত্ত্বিক, বিচারক, মুফতী, পরামর্শক, সরকারের মন্ত্রী, পাশা, জেনারেল, শাহ ও সম্রাটের উদ্ভব ঘটে; যাদের সকলেই তাদের ক্যালিগ্রাফিক মাস্টার পিসের জন্যে তাদের গোটা জীবন ব্যয় করেছেন এবং দৃষ্টিশক্তি নিঃশেষ করেছেন। তিনি পরোক্ষভাবে এ মহান কর্মে ইস্তাম্বুলের অবস্থানের কথা উল্লেখ করে বলেন- 'ইস্তাম্বুল নগরী শুধু তুর্কী শিল্পীদের বা ইসলামী জাহানেরই নয় বরং সমগ্র মানব জাতির সুন্দর ক্যালিগ্রাফি সমূহের প্রদর্শনী কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এটি নান্দনিকতার এক গৌরবময় অধ্যায়ে পরিণত হয়।'[১৩৮]

স্পেনেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। তাদের সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্য ও অলঙ্করণ শিল্পের নিদর্শন হচ্ছে আল-হামরা প্রাসাদ। ধ্বংসাবস্থায়ও পৃথিবীতে যার কোন তুলনা নেই। জে স্টাইগসকি বলেন- 'শিল্পকলার ইতিহাসে এর মর্যাদা অপরিসীম। আল-হামরা অদ্বিতীয় অতি সুক্ষ্ম কারুকার্য, জটিল খোদাই কাজ এবং অতি উজ্জ্বল মোজাইকের সঙ্গে মনোরম ও আকর্ষণীয় কুফী ও অন্যান্য লিপি স্টাইলের সংমিশ্রণে অলঙ্করণ এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে।'[১৩৯] লিপিমালা জ্যামিতিক নক্শার প্যাঁচান ব্যান্ডের সাথে এমন দক্ষতায় খোদাই করা হয়েছে যে, দর্শকদের নজরে রং-বেরংয়ের ধাঁধার সৃষ্টি করে। হরফগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে এমন সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে যে, মনে হবে একটি ফোয়ারা হতে পানি নির্গত হচ্ছে। আরবী লিপিমালার খুব ঘন ঘন ও ঝুলন্ত লতা-পাতা এবং ছোট ডালপালা দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা মুরদের শাসনামলে স্পেনে উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছিল। খিলানাকৃতি কুলুঙ্গিতে যে কলম আছে তাতেও শিলালিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। এরূপ একটি শিলালিপিতে লেখা আছে, 'এ জলধারাটি তুলনাবিহীন। মহান আল্লাহর ইচ্ছা এরূপ যে, অসাধারণ সৌন্দর্যে অপরাপর সবকিছুকে অতিক্রম করে।' আল-হামরার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- এটি কুলুঙ্গিতে স্থাপিত এবং 'আল্লাহ ব্যতীত অপর কেহ পরাক্রমশালী নয়' লিপিমালা দ্বারা সুশোভিত কলামের চতুস্পার্শ্বে এক সময় উৎকীর্ণ ছিল।

---

[১৩৮] নূর হোসেন মজিদী, *মাহজুবাহ* (ইরানঃ জানুয়ারি-২০০৬), পৃ.২।

[১৩৯] *Encyclopedia of Islam*, vol.1, p.278.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বে যারা ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকের কাজেই নিজস্ব ধারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। এদের মধ্যে- আলজেরিয়ার রশিদ কুরাইশী, জর্ডানের রফিক লোহান, প্যালেস্টাইনের ইয়াসির ডুইক, ইরানের এম. এহসায়ী, আর. মাফি, কাতারের আলী হাসান আল-জাবের, ওমানের মুহাম্মদ বিন ফাদেল বিন সাঈদ আল-হাসনী, সিরিয়ার আব্দুল লতিফ আল-স্মৌদ ও মালয়েশিয়ার পনিবিন আমিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে রশিদ কুরাইশী তার ক্যালিগ্রাফি প্রিন্টের জন্য সমগ্র বিশ্বে সুনাম অর্জন করেন। রশিদ কুরাইশীসহ উল্লিখিত প্রত্যেক শিল্পীই আরবী লিপির সাহায্যে ক্যালিগ্রাফি চিত্র নির্মাণ এবং বিভিন্নভাবে বর্ণবিন্যাসের মাধ্যমে নিজস্ব স্টাইল সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে যে সকল ক্যালিগ্রাফি চিত্র নির্মিত হয়েছে তার সবই প্রায় আরবী হরফে।[১৪০] এজন্য অঁরি মাতিস, পল ক্লী, পাবলো পিকাসো, পিয়েত মন্ড্রিয়ানের ন্যায় জগদ্বিখ্যাত কালজয়ী শিল্পীরা মুসলিম লিপিশৈলীর রং ও রেখার দ্যোতনায় মুগ্ধ হয়ে পাশ্চাত্যের শিল্পকলার আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[১৪১]

১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশে যে শিল্পধারার সন্ধান পাওয়া যায় তার বেশির ভাগই ইসলামী শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত। যেমন- রেহেল, শেরওয়ানী, কার্পেট ক্যালিগ্রাফি, মসজিদ গাত্রের অলঙ্করণ এবং ঈদ ও মুহররম সংক্রান্ত চিত্রাবলি। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত ঢাকার বেচারাম দেউরীর মীর্জা গোলাম হোসেনের পুত্র মীর্জা বাহাদুর হোসেন অঙ্কিত ক্যালিগ্রাফি চিত্র, নুসরত জং (১৭৯৬-১৮২৩ খ্রি.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পী আলম মুসাসহ আরো কয়েকজনের অঙ্কিত ঈদ ও মুহররমের মিছিল সংক্রান্ত চিত্রাবলি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।[১৪২] পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির কর্মীগণ

---

[১৪০] ড. আব্দুস সাত্তার, *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধানে* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৫), পৃ.১৭১।

[১৪১] সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত তৃতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে ড. নাজমা খান মজলিসের ক্যালিগ্রাফির উপর লিখিত অভিভাষণ, পৃ.৩।

[১৪২] ড. আব্দুস সাত্তার, 'বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা', *সাহিত্য সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা (ঢাকা: সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র), পৃ.৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ষাটের দশকে বাংলায় ক্যালিগ্রাফি করা যায় কি না সে বিষয়ে পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নেন। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আখতারুল আলম, হেমায়েত হোসেন প্রমুখ এ সংগঠনে জড়িত ছিলেন। তাদের উৎসাহে শিল্পী আব্দুর রউফ রেনেসাঁ সোসাইটির রেনেসাঁ অংশটি ক্যালিগ্রাফি করে ষাটের দশকে অনেক কৌতুহল সৃষ্টি করেন। পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক শিল্পী সাদেকীন তাঁর ছবির উপাদান নিয়েছেন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি থেকে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো- একই সময় বাঙালী শিল্পীগণ প্রায় সজ্ঞানে ধর্ম উল্লেখ বর্জন করেছেন।[১৪৩]

তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশের কতিপয় ক্যালিগ্রাফার সমকালীন ইসলামী লিপিকলার পুনরুজ্জীবিত করার নবপ্রয়াসে ক্যালিগ্রাফির উপর অনবদ্য চর্চা ও সাধনা করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে শিল্পী মুর্তজা বশীর (১৯৩২), শিল্পী আবু তাহের (১৯৩৬), শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী (১৯৩৭), শিল্পী সবিহ-উল আলম (১৯৪০), শিল্পী মীর রেজাউল করিম (১৯৪২), শিল্পী মনিরুল ইসলাম (১৯৪৩), শিল্পী সাইফুল ইসলাম (১৯৪৬), শিল্পী এ এইচ এম বশির উল্লাহ (১৯৪৭), শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার (১৯৪৮), শিল্পী কামরুল হাসান কালন (১৯৪৯), শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী (১৯৫৪), শিল্পী ভাস্কর রাসা (১৯৫৭), শিল্পী ফরেজ আলী (১৯৫৭), শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ (১৯৫৭), শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল (১৯৫৮), শিল্পী আরিফুর রহমান (১৯৫৯), শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন (১৯৬৪), শিল্পী বশির মেসবাহ (১৯৬৪), শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ (১৯৬৮), শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান (১৯৭১), শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম (১৯৭৪), শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ (১৯৭৫), শিল্পী আমিরুল

চিত্র-৫: শিল্পী সাইফুল ইসলামের ক্যালিগ্রাফি 'বিসমিল্লাহ'

[১৪৩] নজরুল ইসলাম, 'সমকালীন শিল্প ও শিল্পী', *বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পত্রিকা*, (ঢাকা: বাশিএ, ১৯৯৫), পৃ.১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হক (১৯৭৮), শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার (১৯৭৮), শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী (১৯৭৯), শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ (১৯৮৩) ও শিল্পী সাইফুল্লাহ সাফা (১৯৮৪) প্রমুখ অন্যতম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১.৩ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলী

মানব সভ্যতার বিকাশলগ্ন হতে সুন্দর হস্তলিখন শিল্পের ব্যাপক কদর চলে আসছে। যার নান্দনিক মহিমা প্রাচ্যদেশ তথা চীন, মিসর, আরব, ইরান, ইরাক ও প্রতীচ্যের গ্রীস ও রোমের হস্তলিখন শিল্পে সুদীর্ঘ পরম্পরা গড়ে উঠেছে। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ করে- আরবী, গ্রীক, চীনা, ল্যাটিন, ফারসী ও উর্দূ ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয়ে বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। তবে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির মূলভিত্তি হচ্ছে আরবী লিপি। কারণ আরবী হরফের অলঙ্করণ ও লিখনপদ্ধতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় বার শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ললিতকলা হিসেবে লিপিশিল্পের চর্চা হয়ে আসছে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। স্থাপত্য, চিত্রকলা, মৃৎপাত্র ও ধাতবপাত্রসহ ইসলামী শিল্পকলার পাশাপাশি লিপিকলার যে উৎকর্ষ সাধিত হয় ও বিকাশ ঘটে তা বিশ্বের ললিতকলার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক A. H. Christie বলেন- 'Arabic script, the sole contribution to Islamic art is a universal mark of muslim dominance or influence wherever it spread.'[১৮৮] অর্থাৎ মুসলিম কর্তৃত্ব

[১৮৮] A. H. Christie, *Islamic Minor Arts and their Influence upon European work*, LI, ND, p.113.

Dhaka University Institutional Repository

বা প্রভাব যেখানেই ছড়িয়ে পড়েছে তার সার্বজনীন নিদর্শন হিসেবে আরবী হস্তলিপির একক অবদান রয়েছে।

পবিত্র আল-কুরআনের প্রথম লিপি হচ্ছে জযম লিপি। এটি 'দিরাজ বা তাহরীর' লিপি নামেও পরিচিত ছিল। এ লিপির কয়েকটি আঞ্চলিক রূপ ছিল। যথা- আনবার অঞ্চলে আম্বরী, হিরাতে হিরী, মক্কায় মাক্কী এবং মদীনায় মাদানী লিপি হিসেবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মূলত সামান্য পার্থক্য বাদ দিলে ওগুলো জযম লিপি হিসেবে পরিচিত ছিল। মক্কা-মদীনার কুরআন কপির জন্য এ লিপিকেই আদর্শলিপি হিসেবে ধরা হয়েছিল। কুফা নগরীর প্রতিষ্ঠার পর এটি কুফী লিপিতে পরিণত হয় এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে কুরআনের
এ লিপি ব্যবহার করা হয়। তৎকালীন সময়ে মদীনায় আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিন ধরনের লিপি ছিল। যথা-

১. মুদাওওয়ার (مدور) বা গোলায়িত

২. মুছাল্লাছ (مثلث) বা কৌণিক

৩. তাঈম (تعيم) বা গোলায়িত ও কৌণিক লিপির মিশ্রিতরূপ

তবে এ তিনটি ধারাকে মূলত দু'টি ভাগেই ভাগ করা যায়। যথা-

১. মুকাওওয়ার (مكور) বা গোলায়িত ধারা

২. মাবসুত (مبسوط) বা কৌণিক ধারা [১৪৫]

অতপর এ ধারায় আরবী লিপির আরো উন্নতি সাধিত হতে থাকে। এ সময় ভিন্ন কিছু ধারারও উদ্ভব হয়। এর মধ্যে মাইল (ميل) তথা সামনে ঝোকপ্রবণ, মাসক (مسك) তথা প্রসারিত এবং নাসখ (نسخ) তথা উৎকীর্ণ লিপি উল্লেখযোগ্য। যার মধ্যে প্রথম দু'টি কৌণিক ধারা ও শেষেরটি গোলায়িত ধারার অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম সাম্রাজ্য ও সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে সরকারী ও

---

[১৪৫] *আল-ওয়াজিযু ফী তারিখিল খাত্তিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১।

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী পর্যায়ে লেখার পরিধি ব্যাপক পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় এবং অতি দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য কৌণিক পদ্ধতির পরিবর্তে গোলায়িত পদ্ধতির লেখা সামগ্রিকভাবে সমাদৃত হয়। ফলে গোলায়িত লিখনপদ্ধতি হতে অনুরূপ বেশি করে লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে এবং লিপিকারদের দ্বারা তার বিকাশ ঘটে।

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির কয়েকটি মৌলিক রীতি (Style) বা শৈলী রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটির আকৃতি ও চেহারা ভিন্ন ভিন্ন। কোনটি মোটা, কোনটি সরু; কোনটি বাঁকা, কোনটি সোজা; কোনটি সরল, কোনটি জটিল; কোনটি দীর্ঘ, কোনটি খাটো; কোনটি প্যাঁচানো, আবার কোনটি জ্যামিতিক আকৃতির। যেমন- আরবী বর্ণমালার প্রথম হরফ আলিফ। এই আলিফকে বিভিন্ন স্টাইলে লেখা যায়। এভাবে প্রত্যেক হরফের বিভিন্ন আকৃতি রয়েছে। যেগুলোর কোনটি লম্বা, খাটো, সোজা, বাঁকা, মোটা, কিংবা পাতলা। কিন্তু এগুলোর কোনটিই নির্দিষ্ট নিয়মের বাইরে যায়নি। বরং এর বেশ কিছু নিয়ম-কানুন আছে। নির্দিষ্ট একটি বাক্য বিভিন্ন রীতি বা স্টাইলে লিখতে গেলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, সেটিই ঐ স্টাইলের নিয়ম-কানুন। আর এ নিয়ম-কানুন কতটুকু বিশুদ্ধভাবে পালন করা হয়েছে, তা যাচাই করার জন্য নির্দিষ্ট মাপজোখ রয়েছে। যাকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে 'খাত আল-মানসুব'[১৪৬] (الخط المنسوب) তথা লিপিকলার মাপকাঠি বা মানদণ্ড বলা হয়।[১৪৭] যে কলমে লেখা হয় সে কলমের একটি নোক্তা বা ডট্ হচ্ছে ঐ মাপকাঠির একক। ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীগুলো শুধু শৈলী নয় বরং এটি প্রজ্ঞার বিভূষণ, চিত্রকর্মে বিমূর্ততা এবং নিবেদনের একটি মনোমুগ্ধকর একটি সম্পূর্ণতা।[১৪৮]

---

[১৪৬] Khat al-Mansub means the 'proportionate writting'. No single discovery in the entire field of Islamic calligraphy was more decisive than that of Ibn Muqlah. (P I S Mustafizur Rahman, *Islamic Calligraphy in the medieval India*, Bangladesh: University Press Limited,1979, p.6)
[১৪৭] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১।
[১৪৮] *Islamic Calligraphy in the medieval India*, ibid, p.48.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি শৈলী[১৪৯] বা রীতি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে এক রীতির সাথে আরেক রীতির সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোথাও উল্লম্ব রেখার তীর্যকতা, আনুভূমিক রেখার সম্প্রসারণ মাত্রা কিংবা হরফের আকৃতিগত সামান্য ভিন্নতা একটি থেকে আরেকটিকে পৃথক করে। লিপিশৈলীই ক্যালিগ্রাফির প্রধান উপজীব্য। শৈলী ব্যতীত ক্যালিগ্রাফি হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে অনেক সাধনার পরই সে পথে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। তা নাহলে বিচ্যুতির আশঙ্কা রয়েছে। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন ছন্দ জেনেই ছন্দ ভাঙ্গার কাজটি করা যায়। তেমনি চিত্রকর্মের ক্ষেত্রেও শিল্পতত্ত্বের কলাকৌশল জেনে ও মেনে নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো উচিত।

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি তার সুদীর্ঘ বিকাশধারায় বিভিন্ন যুগে বা বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের লিপিশৈলীর উদ্ভব হয়। যার সবগুলো এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই ঐ শৈলীগুলা থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচলিত লিপিশৈলীগুলোর বৈশিষ্ট্য, উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ সচিত্র উপস্থাপন করা হল।

১.৩.১ কুফী লিপি (الخط الكوفى)

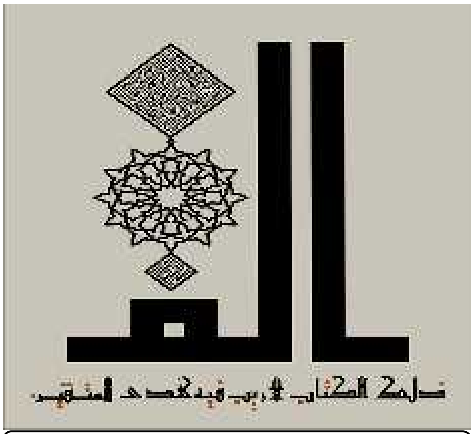

চিত্র-৬: চতুষ্কৌণিক কুফী লিপির ক্যালিগ্রাফি 'আলিফ-লাম-

কুফী (كوفى) লিপি ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহুল প্রচলিত অতি প্রাচীনতম একটি লিখনপদ্ধতি। এ লিপি সুনির্দিষ্ট কতিপয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। অর্থাৎ আনুপাতিক পরিমাপ,

[১৪৯] Indeed there are more styles of writting Arabic than of any other language. However, there main stages in the development of Islamic calligraphy may be briefly indicated. (Muhammad Mohor Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. IB, Islamic Foundation, Dhaka, 2003, p.877).

Dhaka University Institutional Repository

তীক্ষ্ম ত্রিকোণ ও চৌকোণাবিশিষ্ট, লম্বা ও খাটো উল্লম্ব রেখা এবং বিস্তৃত ও সমতল আনুভূমিক রেখার সমন্বয়ে গঠিত। এটি একটি কৌণিক জ্যামিতিক ধারার উল্লম্ব ও আনুভূমিক রেখাপ্রধান লিপি। ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কুফা[১৫০] নগরী প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শতাব্দীকাল পূর্বে 'সুরইয়ানী সতরঞ্জলি' থেকে এর উদ্ভব হয়।[১৫১] কারো কারো মতে- নাবাতী লিপি থেকে[১৫২] আবার কোন কোন মনীষীর মতে- হযরত আলী (রা.) মাকালী বৈশিষ্ট্যের বর্ণমালা থেকে এ রীতির উদ্ভাবন করেন।[১৫৩] ইসলাম পূর্ব যুগে হিরা নামক শহরে এ লিপির প্রচলন ছিল বলে একে হিরি লিপিশৈলী নামে অভিহিত করা হয়। হিরার পাশে কুফা নগরী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে এ রীতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হত বলে এটি কুফী লিপিরীতি নাম ধারণ করে।[১৫৪] কুফা শহরের নাম থেকেই কুফী লিপির নামকরণ করা হয়। ৬৩০খ্রিস্টাব্দে ইরাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে কুফা নগরীর গোড়াপত্তন হয়।[১৫৫]

কুফা নগরীর প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ধারার লিপির বিকাশ শুরু হয় এবং সর্বত্র এর ব্যবহার বেড়ে যায়। ফলে এ লিপি অল্প দিনের মধ্যে বিভিন্ন দেশে পৌঁছে একটি নতুন মাত্রা পায়। ফলে স্থান, কাল ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি লাভ করে। আবু হাইয়ান আত্-তাওহীদির বর্ণনা মতে- এ সময় কুফী লিপির ১২টি প্রকরণ সৃষ্টি হয়। আর তা হলো- ইসমাইলী, মাক্কী, মাদানী, আন্দালুসী, শামী, ইরাকী, মিসরী, আব্বাসী, বাগদাদী, মুশা'আব, রায়হানী ও মুজাওয়ার। এসবের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।[১৫৬]

---

[১৫০] The city of Kufa was established in Iraq in the year 641 AD. It flourished in a short time from a soldiers camp into an urban centre with vital cultural activities. Among these activities was the refinement of the Arabic script into an elegant and rather uniform script, which came to be known as Kufic or Kufi. (M A Ghafoor, *The Calligraphers of Thatta,* University of Karachi (Karachi: 1978).

[১৫১] *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৬।

[১৫২] 'কুরআন মজিদের কতিপয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, *ত্রৈমাসিক প্রত্যাশা*, ব.৫, স.১-২, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর-২০১৪, পৃ.৫৭।

[১৫৩] *মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখনশিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৬।

[১৫৪] *ইনতিশারুল খাত্তিল 'আরাবী ফিল 'আলিমিশ শারকী ওয়াল গারবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮।

[১৫৫] *মাওসূ'আতু আল-খাত্তুল আরাবী: আল-খাত্তুল কুফী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫।

[১৫৬] *আল-খাত্তুল 'আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম যুগের মুসলমানদের একনিষ্ঠতা, অনমনীয় ধর্মীয় অনুভূতি আরবদেরকে কুরআন শরীফের সুদৃঢ় ও লীলায়িত বাক্যালঙ্কারে অনুপ্রাণিত করে। তারা পবিত্র কুরআনের অমোঘ বাণীকে লিপিবদ্ধ করার জন্য কুফীলিপিকেই উপযুক্ত মনে করতেন। তাই যখন অহী নাযিল হত তখন তা সুদৃঢ় ও সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করার জন্য তারা এ লিপি ব্যবহার করতেন। ইসলাম পরবর্তী যুগে আল-কুরআন লেখার ক্ষেত্রে কুফী লিপি দীর্ঘদিন অপ্রতিদ্বন্ধী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে কুফী লিপির যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় কুফী লিপিতে সর্বপ্রথম কুরআন লিপিবদ্ধ করে কুরআনের বিভিন্ন অনুলিপি তৈরি করা হয়। হযরত আলী (রা.) একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। এ লিপির উন্নয়নে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি লাম-আলিফের মাথাকে দুই শিংবিশিষ্ট করে একটি নতুন ধারার কুফী লিপির প্রচলন করেন।[১৫৭] এ লিপির ব্যবহার প্রাচীন আরবী দলীল, শিলালিপি ও মুদ্রায় দেখা যায়। এ লিপির টানগুলো কৌণিক ও সরু।

উমাইয়া যুগে বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফারগণের কঠোর সাধনা, গবেষণা ও অনুশীলনের ফলে কুফীরীতি শিল্প হিসেবে মানসম্পন্ন পর্যায়ে উপনিত হয়। হযরত আলী (রা.) এর শিষ্য আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী এ লিপির প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি বিন্দুর আকারে স্বরচিহ্ন প্রবর্তন করেন। তারপর কুতবাহ আল-মুহাররির এ লিখনরীতির বিভিন্ন উপরীতি আবিষ্কার করেন। অতপর খালিদ ইবনুল হাইয়াজের অবদান বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মসজিদে নববীর মিহরাবে স্বর্ণালি হরফে লিখা সূরা আশ-শামস তারই শৈল্পিক দক্ষতার পরিচায়ক। তিনি পবিত্র মুসহাফ লেখার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।[১৫৮]এক্ষেত্রে আরো যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে মালিক ইবনু দিনার, রশিদ আল-বাসরী ও মাহদী আল-কুফী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এভাবে পরবর্তীতে প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত এ লিপিতে কুরআন লিখিত হয়েছে।

---

[১৫৭] ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি), খ.১০, পৃ.৫৫।
[১৫৮] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.২৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

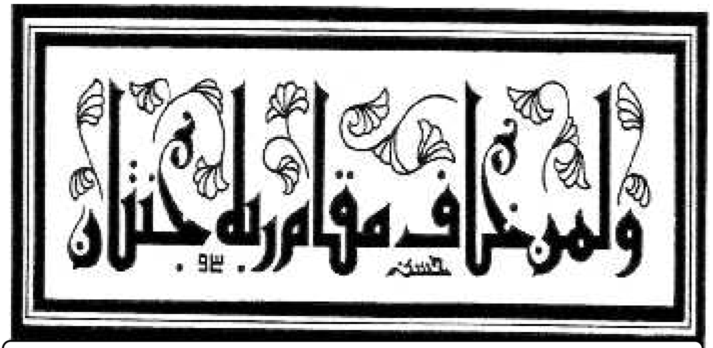

চিত্র-৭: যুখরুফাহ পদ্ধতিতে হাসান হাবশ-এর ক্যালিগ্রাফি

কুফী লিপিশৈলীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- শিরঃকোণ (Vertical) ও তীর্যক রেখা (Oblique line)। প্রাক ইসলামী যুগে যে ধরনের প্রাচীন বক্রাকার লিখন ব্যবহৃত হতো তাতে আরবী লিপিমালার মূল আঙ্গিক গঠনের উদ্ভব হয়। যেমন- একটি হরফের সাথে আরেকটি হরফের সংযোগ রক্ষাকারী বন্ধনী (Ligature)। এ ধরনের বন্ধনীর ব্যবহারে অক্ষরগুলো যে সাবলীল ও ছন্দময় গীতিময়তা লাভ করে তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বর্ণের উল্লম্ব ও লম্বদণ্ড এবং আনুভূমিক বাহু লেখার সময় এমনভাবে সাজানো হয় যে, তা কোন না কোন ভাবে কোণের সৃষ্টি হয়।[১৫৯] কোনরূপ বক্রতা ও ধনুকাকৃতি এতে দেখা যায় না। প্রথমদিকে বর্ণের গোলাকার রূপের কিছুটা সংমিশ্রণ থাকলেও দ্বিতীয় হিজরীতে এসে পুরোপুরি কৌণিক রূপ লাভ করে। এ রীতির লেখাকে রোলার দ্বারা পরিমাপকৃত রেখা বলে মনে হয়। এতে বর্ণের লম্বদণ্ড সাধারণত খর্বাকৃতির হয় এবং আনুভূমিক ও সমান্তরাল রেখাগুলোকে দীর্ঘায়িত করে অন্য হরফের সাথে এমনভাবে সংযোজন করা হয় যে, এ প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট সারিতে মূল বক্তব্য নিহিত থাকে।

তবে এ লিপিগুলো ছিল বেশ ত্রুটিপূর্ণ। কেননা এতে ছিল না কোন স্বরচিহ্ন বা নোক্‌তা, কিংবা এক হরফ থেকে অন্য হরফের পার্থক্য বুঝার জন্য কোন হরকত (যবর, যের ও পেশ)। ফলে এ জাতীয় লেখার পাঠোদ্ধার খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এজন্য হযরত উসমান (রা.) কুফীরীতিতে মুসহাফের ৬টি কপি করে ৪টি মক্কা, বসরা, কুফা ও শাম ইত্যাদি শহরে প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট দু'টির মধ্যে একটি সাধারণ লোকদের জন্য। অন্যটি নিজের কাছে রাখেন। সাথে সাথে তিনি প্রত্যেকটি মুসহাফের সাথে একজন করে পাঠকারীও পাঠান। পরে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে

---

[১৫৯] *মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখনশিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৫।

Dhaka University Institutional Repository

এসে সিরিয়ক লিপির প্রভাবে এতে নোক্তা ও হরকতের প্রবর্তন হয় এবং এর লিখনরীতি ধীরে ধীরে বক্রাকার হতে থাকে। ফলে এ রীতির লেখার পাঠোদ্ধারের যে কষ্ট হত তা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।[১৬০]

চিত্র-৮: নবম শতাব্দীর কুফী লিপিতে কৃত কুরআনের পাণ্ডুলিপির

পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে বিভিন্ন ধরনের জড়ানো, পাথরের সাথে বোনা, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নক্শায় কুফী লিপিশৈলীর অপূর্ব অলঙ্করণ রীতি প্রকাশ ঘটে।[১৬১] হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে কুফী লিপিশৈলী অন্যান্য দেশে বিলুপ্ত হলেও ককেসীয় লিপিকাররা হিজরী অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এ রীতির চর্চা অব্যাহত রাখেন। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এসে কুফী লিপিশৈলী একেবারে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ সময় মিহরাব, গম্বুজ, মিনার, মিম্বার, রিহাল, দরজা, জানালা, বাক্স, ধাতুর বর্ম, হেলমেট, তলোয়ার, বল্লম-কোঁচা, ঝুড়ি, গহনা ইত্যাদিতে এ লিপির চমৎকার সব শিল্পকর্ম সূচিত হয়। তখন মুসলিম জীবনবোধ যেমন সুষমামণ্ডিত ও জাঁকালো হতে থাকে তেমনি মুসলিম সংস্কৃতি ফুল-ফসলে ভরে উঠে। ফলে কুফী লিপিশৈলীতেও জাঁকজমক আসতে থাকে এবং এর অলঙ্করণ প্রভা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। পঞ্চদশ শতকে উসমানী ধারার ইস্টার্ণ কুফী যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ কুফী লিপিতে আমরা নান্দনিকতা দেখতে পাই মিসরের রাজধানী কায়রোতে।

পবিত্র কুরআন কপি করার জন্য এ লিপিটি প্রায় তিনশত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে সেখানেই এ লিপিশৈলী পৌঁছেছে। তবে কুরআনের কপিতে পরবর্তীতে স্থানীয় ক্যালিগ্রাফারদের মাধ্যমে এ লিপির পরিবর্তন হতে থাকে এবং বিভিন্ন

---

[১৬০] ড. আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফী, *ফিকহুল লুগাহ* (কায়রো: দারু নাহদাতি মিসর, ১৯৭৩), পৃ.২৫৩।
[১৬১] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

ধারার সৃষ্টি হয়। সুদান ও ইথিওপিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে ওয়েস্টার্ন কুফী, স্পেন ও আলজেরীয় প্রভৃতি দেশে আন্দালুসিয়ান কুফী, ইরাকের পূর্বাঞ্চল, আরব উপদ্বীপ, পারস্য ও ভারতীয় উপমহাদেশে এ লিপি ইস্টার্ন কুফী নামে পরিচিত।[১৬২] এছাড়া আল-জালী (الجالى) নামে এক ধরনের বলিষ্ঠ কুফী লিপি রয়েছে। যা রাজকীয় চিঠিপত্র ও শিলালিপিতে ব্যবহৃত হত। মাজাল্লাত ছিল দলীল-দস্তাবেজে ব্যবহৃত কুফী। বিখ্যাত লিপিকার ইবনে মুকলাহ (মৃ. ৯৪০ খ্রি.) কুফী লিখনরীতির চরম উৎকর্ষতা সাধন করেন। তিনি আব্বাসী খলীফা আল-কাহির বিল্লাহ'র (২৮৬-৩৩৯ খ্রি.) দরবারের সুযোগ্য লিপিকার ছিলেন।

আল-কুরআন লিপিবদ্ধ করণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কুফীরীতিটি ছিল অনান্য রীতির চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আব্বাসী আমলের শেষ দিকে এ রীতির ২০টির বেশি প্রকরণ লক্ষ্য করা যায়। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী কুফীরীতির শতাধিক প্রকরণের অস্তিত্ব দেখা যায়। এ প্রকরণগুলো তাদের আকার আকৃতি কিংবা যুগ বা স্থানের আলোকে নাম ধারণ করে। তবে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে এ লিপিশৈলীগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. স্মারক কুফী (الكوفى التذكارى): এ লিপি অধিকতর কঠিন ছিল। যে কেউ এ লিপি সহজে আয়ত্ত্ব করতে পারত না। এটি শিরঃকোণ বিশিষ্ট। শক্ত উপাদানসমূহ যথা- উটের হাড়, পাজর, মৃৎপাত্র, সাদা পাথর, কাঠ কিংবা ধাতবপাত্রে এ লিপির দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধারণত এগুলোতে আয়াত, হাদীস, দু'আ বা কারো মৃত্যু সন খোদাই করে লেখা হত।
২. সহজ কুফী (الكوفى اللين): এ লিপি অধিকতর সহজ ও অনায়াসসাধ্য ছিল। এগুলো প্রধানত বক্রাকৃতি ছিল। অপেক্ষাকৃত নরম উপাদানসমূহ, যেমন- চামড়া, তালপাতা, পার্চমেন্ট ও প্যাপিরাস ইত্যাদিতে এ লিপির প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও দলীল-দস্তাবেজে এ লিপির ব্যবহার হত। এজন্য একে 'পত্রলেখার কুফী' নামেও অভিহিত করা হয়।

[১৬২] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মুসহাফী কুফী (الكوفى المصحف): এ লিপি স্মারক কুফীর চেয়ে অনায়াসসাধ্য ও সহজ কুফীর চেয়ে কঠিন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- শিরঃকোণ ও তীর্যক রেখা। এতে বর্ণের উল্লম্ব ও লম্বদণ্ড এবং আনুভূমিক বাহু লেখার সময় এমনভাবে সাজানো হয় যে, তা কোন না কোন ভাবে কোণের সৃষ্টি করে। কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে সাধারণত এ লিপি ব্যবহৃত হত বলে একে 'মুসহাফী কুফী' বলা হয়।[১৬৩]

দশম শতাব্দীতে আব্বাসী আমলে প্রাচ্যদেশীয় কুফী নামে একটি লিপিশৈলীর উদ্ভব হয়, যার উল্লম্ব দণ্ডের মাথা তীর্যক ও নক্শাকৃত এবং সমান্তরাল হরফগুলো ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর। ইরানে কুফী লিপির অলঙ্কৃত ধারাটি পৃথিবী বিখ্যাত। এ লিপিটিতে খাটো উল্লম্ব রেখাগুলো সামান্য বামে ঝুঁকে থাকে এবং লম্বা ও উল্লম্ব রেখা সোজা থাকে। আবার খাটো-লম্বা উভয় উল্লম্ব রেখা সামনে ঝুঁকে থাকে। পাশ্চাত্যের গবেষকগণ একে ঝোঁকপ্রবণ লিপি বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ লিপিতে যে সমস্ত হরফের মাথা গোলাকার সেগুলোকে ফুল ও পাতা অলঙ্করণ করা হয় এবং নীচের ঢালগুলোকে গোলাকৃতি করা হয়।

দশম শতাব্দীর শেষদিকে পারস্যবাসীদের হাতে পারসীয় কুফীরীতির প্রভাবে অন্য একটি পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। আদর্শ কুফীরীতির (Standard Kufic) কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে 'ইরানী কুফীরীতি' সেলজুকদের হাতে প্রভূত বিকাশ লাভ করে। তারা 'আলঙ্কারিক কুফী' (Ornamental Kufic) নামে একটি কুফীরীতি উদ্ভাবন করে। এতে যে সকল হরফের মাথা গোলাকার সেগুলোকে ফুল ও লতা-পাতা দিয়ে অলঙ্করণ করা হয় এবং নিচের ঢালগুলোকে গোলাকৃতি করা হয়। এ ধরনের আলঙ্কারিক কুফীকে ফুল ও লতা-পাতা সমন্বিত কুফী (المورق الكوفى) নামে অভিহিত করা হয়। তাছাড়া আনুভূমিক বাহুগুলোকে সোনালি ফুল, লতা-পাতা ও শাখা-প্রশাখা দ্বারা অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত করে সেই কুফীকে 'পুষ্পসজ্জিত কুফী' (الكوفى المزهر)

[১৬৩] *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৫-১৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

নামে অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্যের চারুশিল্পীগণ এ ধরনের লেখাকে অ্যারাবেস্কু (Arabesque) নামে অভিহিত করে থাকে।[১৬৪]

১.৩.২ আল-আকলামুস সিত্তাহ

কারসিভ[১৬৫] তথা গোলায়িত ধারার প্রধান ছয়টি শৈলী বা রীতিকে আল-আকলামুস সিত্তাহ (Six Scripts) বা শিশ কালাম বলে। এগুলো হচ্ছে- সুলুস, নাসখী, মুহাক্কাক, তাওকী‘, রায়হানী ও রুক‘আহ। এগুলোর প্রবর্তন করেন আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে মুকলাহ।[১৬৬] আবুল ফজল বলেন, আল-আকলামুস সিত্তাহ ইবনে মুকলাহ কর্তৃক কুফী ও মাকালী লিখনবৈশিষ্ট্য হতে উৎসারিত হয়েছে।[১৬৭] তাঁর হাতেই এ লিখনপদ্ধতি ব্যাপক বিকাশ লাভ করে। তিনি একে সংশোধন করে জটিল, নিপুণ, জ্যামিতিক ও গাণিতিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করেন এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারায় দাঁড় করেন। এ ছয়টি লিপিশৈলীর অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধনের জন্য তাকে ক্যালিগ্রাফির গোলায়িত ধারার প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তবে লেখার পরিমাণ অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় দ্রুততম ও সহজ গতিতে লেখার কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তিনি ৩১০ হিজরী মোতাবেক ৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বৃত্ত ও বিন্দুকে লেখার মূল সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে আরবী লিখনের এ ছয়টি প্রধান পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।[১৬৮]

ইবনে মুকলাহ’র সুলুস, নাসখী, রায়হানী, মুহাক্কাক, তাওকী‘ ও রুক‘আহ পদ্ধতির ধারণাও কুফী রীতির রিয়ালাইজেশন এবং পাহলভী ও ‘এভেস্টা-ই হ্যান্ড রাইটিং’-এর প্রভাবজাত বলে পণ্ডিতগণ

---

[১৬৪] অ্যারাবেস্কু: শব্দটি অ্যারাবিক শব্দ থেকে উদ্ভূত। অঙ্কন ও অঙ্গসজ্জার জন্য যে আরবী লিপি ব্যবহৃত হত তাকেই অ্যারাবেস্ক বলে।

[১৬৫] Cursive styles of calligraphy apeared during the 10th century. They were easier to write and read and soon replaced the earlier geometric style, except for decorative purpose. (Lois lamya Al-faruqi, *Islam and Art* (Islamabad: National Hijrah Council,1985)

[১৬৬] *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫।

[১৬৭] Abul Fadl, Ain-i-Akbari, Eng. Tr. H Bluclaman (Calcatta: 1873), vol.I, p.99.

[১৬৮] Qadi Ahmad, Gulistan-i-Hunr, Eng. Tr. entitled Calligraphers and Painters, T Minor sky, Freer Gallary of Art (Washington: 1959), *op.cit*, p.56.

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা করেন। কুফিক কৌণিক বর্ণমালাও মাকালী লম্বদণ্ড ও সরল রেখার প্রতিনিধিত্ব করে। অথচ এসব পদ্ধতিতে ব্যবহৃত গোলায়িত বর্ণমালা ও উল্লম্ব দণ্ডের সমাবেশ আনুপাতিক হারে ঘটেছে। আধুনিক পণ্ডিতদের কেউ কেউ নাসখী ব্যতীত অপর পাঁচটি পদ্ধতিকে নাসখের ভিন্নরূপ এবং লিখনশিল্পের অলঙ্করণ পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করেন।[১৬৯] তারপর ইবনে বাওয়াব এগুলোকে ইবনে মুকলাহ'র পদ্ধতি অনুসারে আরো উৎকর্ষ প্রদান করেন এবং ইয়াকুত আল-মুস্তা'সিমী এতে প্রভূত সৌন্দর্য বর্ধন করেন। তিনি অপূর্ব লেখনির মাধ্যমে এবং বিশেষভাবে কলম কেটে ব্যবহারের জন্য এগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন।

১.৩.২.১ সুলুস লিপি (الخط الثلث)

চিত্র-৯: সুলুস লিপির ক্যালিগ্রাফি 'আল্লাহ'

সুলুস (ثلث) অর্থ এক তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ বক্রাকার অংশ খাড়াদণ্ডের এক তৃতীয়াংশ। ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীসমূহের মধ্যে সুলুস লিপি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ লিপিকে 'সুলতানুল খুতুত' (سلطان الخطوط) বা লিপির রাজা কিংবা 'উম্মুল খুতুত' (أم الخطوط) বা লিপির জননী বলা হয়।[১৭০] কারণ এ লিপি আয়ত্ত্ব করতে পারলে অন্যান্য লিপিগুলো আয়ত্ত্ব করা সহজ হয়ে যায়। রাসূল (সা.)-এর সময় (৫৭০-৬৩৩ খ্রি.) থেকে এ লিপির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ পবিত্র কুরআন বেশির ভাগই এ লিপিতে লিখিত হয়। মূলত এটি আয়ত্ত্ব করার পরই

---

[১৬৯] M Ziauddin, *Muslim Calligraphy*, p.60.

[১৭০] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১।

Dhaka University Institutional Repository

কাউকে ক্যালিগ্রাফার হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৭১] এটি স্থুল প্রকৃতির গোলায়িত ধারার লিপি। সুলুস লিপি তুমার (طومار) লিপির এক তৃতীয়াংশ হয়ে থাকে। তুমার লিপিতে আলিফের বিস্তার ঘোড়ার ২৪টি পশমের বিস্তারের সমপরিমাণ। সে হিসেবে সুলুস লিপির আলিফের বিস্তার হবে ৮টি পশমের সমান।[১৭২] তাছাড়া ইবনে মুকলাহ'র খাত আল-মানসুবের নিয়ম অনুসারে আলিফের পরিমাণ হবে, যে কলমে আলিফটি লিখা হবে ঐ কলমের ছয় বা সাতটি ফোটা বা নোক্তা বরাবর লম্বা এবং আলিফটির বিস্তার হবে কলমের নিবের অর্ধ নোক্তার সমান। এ লিপিতে হরফসমূহের অগ্রভাগ সুচালো ও সামান্য বাকানো থাকে। যা শুধু কলমের কিনারা দিয়েই লেখা সম্ভব। তথাপি হরফগুলোকে যতটুকু প্রসারিত করা যায়, তার চেয়ে সেগুলোকে বেশিরভাগই গোলাকার রূপ দেয়া হয়।

সুলুস লিপির লম্বালম্বি দণ্ড এবং বক্রাকার রেখার অনুপাত নাসখী লিপির তুলনায় তিন গুণ বড়। নাসখীতে যে খাড়াদণ্ড এবং বক্ররেখা যুক্ত হয়েছে তা সুলুস লিখনপদ্ধতিতে প্রকাশ পেয়েছে। এ রীতিতে খাড়াদণ্ডসমূহ ছোরার মত মনে হয় এবং জলস্রোতের মত সাবলীলভাবে নিম্নাংশে পরিসমাপ্তি ঘটে। যেহেতু এ লিখনপদ্ধতি মূলত স্থাপত্যিক অলঙ্করণ অথবা অন্য কোন লিপিমালায় ব্যবহৃত হয়। সেহেতু এর হরফগুলো খুবই মোটা ও বলিষ্ট।

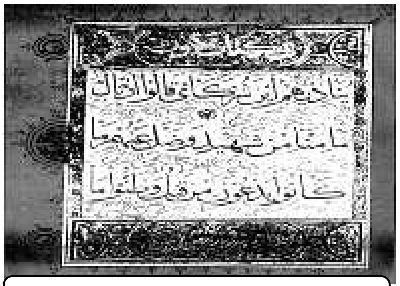
চিত্র-১০: অষ্টম হিজরীর কুরআনের পাণ্ডুলিপি

সুলুস লিপি মোট দু'প্রকার। যথা-

১. ثقيل (ছাকীল) বা মোটা
২. خفيف (খাফীফ) বা পাতলা

ছাকীল লিপিটি পুরোপুরি মোটা যা ঘোড়ার ৮টি পশমের বিস্তারের সমপরিমাণ। আর খাফীফ লিপিটির বিস্তার ছাকীলের তুলনায় সামান্য কম। শায়খ যায়নুদ্দীন আবদুর রহমান আস-সায়িগ ছাকীল ও খাফীফের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে

---
[১৭১] *তারিখুল খাত্তিল 'আরাবী ওয়া আদাবিহী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১।
[১৭২] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন- উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, ছাকীলে খাড়া দণ্ডগুলো কলমের ৭টি নোক্তার সমপরিমাণ এবং খাফীফে ৫টি নোক্তার সমপরিমাণ হয়ে থাকে।[১৭৩]

ইবনে মুকলাহ হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে সুলুস লিপির আবিষ্কার করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে গাণিতিক ও জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বিস্তার করেন। পরে ইবনে বাওয়াব (মৃ. ১০২২ খ্রি.) একে আরও পরিশীলিত করেন এবং সবশেষে ইয়াকুত আল-মুস্তা'সিমী (মৃ. ১২৯৮ খ্রি.) একে পরিপূর্ণতা দান করেন এবং একে ধর্মীয় গ্রন্থাবলি ও কুরআনে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেন। পরবর্তীতে এ লিপিটি পবিত্র কুরআন ও ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে এত বেশি ব্যবহার করা হয় যে, একে ধর্মীয় লিপির মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এ লিপিতে আরো আলঙ্কারিক সৌন্দর্য প্রদান করার ফলে আল-কুরআনের সাধারণ লিপি থেকে সুরার হেডিং, টাইটেল ও ফলোকোণ প্রভৃতিতে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এ লিপির কুরআনের কপি খুবই দুর্লভ হয়ে যায়। তবে ইবনে বাওয়াবের স্বহস্তে লিখিত সুলুসে জালী লিপিতে কুরআনের সাতটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।[১৭৪] শিলালিপি মৃৎপাত্র, ধাতবপাত্র, কাষ্ঠখোদাই, মিনা করা টালী, পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় ধর্মীয় লিপির মর্যাদা লাভ করে। নবম শতাব্দীর শেষার্ধে ইবনে মুকলাহ কর্তৃক এ লিপিশৈলীর উৎকর্ষতা লাভ করে এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইয়াকুত আল-মুস্তা'সিমী প্রভৃত উন্নয়ন সাধন করেন।

চিত্র-১১: সুলুস লিপির ক্যালিগ্রাফি 'মুহাম্মাদ'

ভারতীয় উপমহাদেশে এসে স্থানীয় প্রভাবে সুলুস লিপি কিছুটা প্রভাবিত হয়। কুতুব মিনারে উৎকীর্ণ এ লিপিটি উপমহাদেশের প্রভাবের উৎকৃষ্ট নজীর। তাই বলা যায়- সুলুস একটি নিশ্চল স্মারক লিপি যা প্রধানত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও উৎকীর্ণ লিপি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ লিপি সুলতানী আমলে বাংলায়

[১৭৩] আবুল আব্বাস আহমদ কালকাশান্দি, *সুবহুল 'আশা* (কায়রো: আল-মাতবা'আতুল আমিরিয়্যাহ, ১৯১৬), খ.৩, পৃ.১০৪।
[১৭৪] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২।

Dhaka University Institutional Repository

বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ স্টাইলের সাধারণ হস্তাক্ষরকে বিভিন্নভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে যে অসাধারণ ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করা হয়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে- আলজেরিয়ার রশিদ কুরাইশী। তিনি সমগ্র ক্যানভাসকে অনেকগুলো ক্ষেত্রে বিভক্ত করে প্রতিটি ক্ষেত্রকে দৃষ্টিনন্দন করেন। তিনি কখনও ছোট বড় হরফের সমাবেশ ঘটিয়ে তার মাঝে শক্তিশালী বর্ণসাদৃশ্য ফর্ম সংযোজন করে চিত্রের কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর বর্ণ বিন্যাসের অভিনব কৌশলের কারণে সাধারণ হস্তাক্ষরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

নাসখী লিপির মত সুলুস লিপিরও কতগুলো উপধারা লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুলুসে জালী বা আলঙ্কারিক সুলুস। যার লম্বালম্বি দণ্ডগুলো কখনো ফুল, লতা-পাতা এমনকি জীব-জন্তু ও মানুষের মস্তকের আকৃতিতে রূপান্তরিত করা যায়। 'উসমানী সাম্রাজ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে হাফিজ উসমান 'জালী' লিপির গুণগত বৈশিষ্ট্য উপলব্দি করে এর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। সে যুগে সুলুস লিপি চর্চায় আরো যারা প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে মাহমুদ জালাল উদ্দিন, মুহাম্মদ ইজ্জত, আব্দুল্লাহ জুহরী ও ইব্রাহীম আফিন্দী উল্লেখযোগ্য।[১৭৫]

১.৩.২.২ নাসখী লিপি (الخط النسخى)

চিত্র-১২: নাসখী লিপিতে লিখিত সূরা আল-ফাতিহা

নাসখ (نسخ) অর্থ নকল করা, অনুলিপি বা অনুলিখন (Transcription)। কাতিবগণ চিঠিপত্র ও গ্রন্থাদি বিশেষত পবিত্র মুসহাফের লিখন ও অনুলিপি তৈরির ক্ষেত্রে এ লিপির উপর নির্ভর করত বলে একে নাসখী নামে অভিহিত করা হয়। এর সংজ্ঞায় ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী বলেন- 'বর্ণমালার লম্ব ও আনুভূমিক বাহু

াগুক্ত, পৃ.১০১।

Dhaka University Institutional Repository

যদি ঢালু করে উপস্থাপন করা হয় এবং তাতে কোনরূপ কোণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে তাকে নাসখী লিপি বলে’ ।[১৭৬]

এটি পবিত্র কুরআনের লিপি হিসেবে সমধিক পরিচিত। এটি নাবাতীদের গোলাকার লিখনপদ্ধতি থেকে উদ্ভূত। জাহিলী যুগে সিরিয়ার সাথে আরবের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সময় আরবরা পথিমধ্যে অবস্থিত হুরান নগরীর নাবাতীদের নিকট থেকে এর শিক্ষা অর্জন করে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ লিপিতে কুরআন লিখিত হওয়ায় এর গুরুত্ব অনেক বেশি। এর উল্লম্ব ও আনুভূমিক রেখাগুলো সামনে-পেছনে সর্বত্র সমান। এদের বক্রতা গভীর ও সমান্তরাল। শব্দগুলো পরস্পর ফাঁক ফাঁক ও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। এ লিপি স্বভাবে শক্তিশালী (Bold) এবং এর হরফগুলো তুঘরার মত একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে এ লিপির ক্যালিগ্রাফিতে বিভিন্ন ধরনের জ্যমিতিক ফর্মের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এ লিপিশৈলীতে স্বরচিহ্ন বা হরকত ও বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে আলী মুকলাহ (মৃ. ৯৪০ খ্রি.) এ লিখনপদ্ধতির প্রচলন করেন। জ্যামিতি শাস্ত্রে তাঁর এমন বুৎপত্তি ছিল যে, তিনি মুসলিম লিপিকলার বিকাশে এক অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। যার মূলভিত্তি ছিল বৃত্ত ও বিন্দু। তিনি খাঁড়াভাবে সাজানো ৫/৭টি বিন্দুর সাহায্যে আলিফের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। আলিফের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বৃত্তের মাধ্যমে অন্যান্য আরবী হরফের পরিমাপ নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ একটি আলিফের দৈর্ঘ্য একটি বৃত্তের ব্যাসের সমতুল্য। এভাবে সামঞ্জস্যতা, ভারসাম্য ও সাবলীল ছন্দ রক্ষার জন্য ب , و ,ق হরফগুলোর বক্রতা নির্ধারিত হয়। লিপিকলার ক্রমবিকাশে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে উদ্ভুত এ কৌশল প্রয়োগ করেই ইবনে মুকলাহ্ বক্রাকার ছয়টি লিপিশৈলী আবিষ্কার করেন যা ‘আল-আকলামুস সিত্তাহ’ (الاقلام الستة) নামে পরিচিত।[১৭৭] ইবনে মুকলাহ কর্তৃক এ ছয়টি লিপির উপর গবেষণা ও আনুপাতিক সম্পর্ক আবিষ্কার করার পর গ্রন্থ কপি করার জন্য এ লিপি ব্যাপক খ্যাতি

---

[১৭৬] *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা* প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৫।

[১৭৭] Yasin Hamid Safadi, *Islamic Calligraphy* (London: 1978), pp.17-21.

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে। আব্বাসী আমলের আরেক বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ইবনে বাওয়াব এ লিপিকে কুরআনের লিপি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

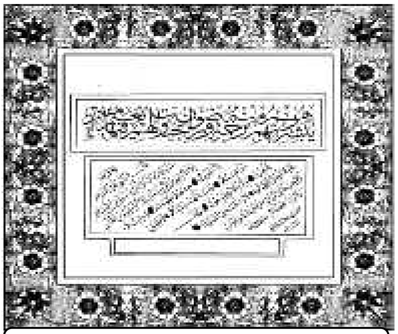

চিত্র-১৩: সালেহ জাবুরীর নাসখী লিপির ক্যালিগ্রাফি

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইয়াকুত আল-মুস্তা'সিমী এ লিপিকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত ও নিপুণতা প্রদান করেন। তিনি কলমের নিবকে তীর্যকভাবে কাটেন। ফলে এ লিপির হরফগুলোতে পুরুত্ব কমে যায় এবং আরো সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কী ক্যালিগ্রাফারগণ কুরআন কপি করার জন্য এ লিপিকে বেশি ব্যবহার করেন। ক্যালিগ্রাফারগণ এ কাজে তাদের নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন। তারা 'খাদিমুল কুরআন' বা কুরআনের সেবক নামে উপাধি লাভ করেন। এরূপ কর্মস্পৃহার সাথে সাথে এ লিপি একটি নবতর পর্যায়ে এসে উপনীত হয়। উনিশ শতকে ইস্তাম্বুলের মোস্তফা ইজ্জত আফিন্দী (মৃ.১৮৭৬ খ্রি.) ও মুহাম্মদ সিকভী আফিন্দীর (মৃ.১৮৮৭ খ্রি.) হাতে এ লিপি সর্বোচ্চ শিল্পমানে উন্নীত হয়। কুরআন লিখনে এ লিপি আজও সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।[১৭৮] শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্যালিগ্রাফারগণ এ লিপির ক্রমাগত অনুশীলন করছেন। অনুশীলনের এ ঐতিহ্য আজও বহমান। এর অনুপম সৌন্দর্য এবং সবার নিকট এর অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা একে যুগের পর যুগ পৃথিবীতে টিকে থাকতে সহায়তা করবে।

ইবনে মুকলাহ'র শিষ্য আবুল হাসান আলী ইবনে হিলাল বক্রাকার লিপিশৈলীর উৎকর্ষতায় বিশেষ অবদান রাখেন। যিনি ইবনে বাওয়াব (মৃ. ১০২২ খ্রি.) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর উস্তাদ কর্তৃক আবিষ্কৃত ছয়টি লিপিশৈলীর এমন উন্নতি সাধন এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন যে, তা আল-মানসুব আল-ফায়িক (المنسوب الفائق) বা অতীব সুষমামণ্ডিত লিখনরীতি নামে অভিহিত করা হয়। তিনি বক্রাকার লিপিতে ৬৬টি কুরআন শরীফের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

---

[১৭৮] মোহাম্মদ আবদুর রহীম, *সহজ ও সুন্দর আরবী ক্যালিগ্রাফি, নাসখী লিপি* (ঢাকা: ঝিঙেফুল, ২০০৫), পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াকুত আল-মুস্তা'সিমীর মাধ্যমে আরবী হরফের লালিত্য ও সুষমা অধিকতর প্রকাশ পায়। তাকে নাসখী লিপিকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। কথিত আছে, লিপিকলার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ধর্মীয় অনুরাগ এত বেশি ছিল যে, ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করার সময় তিনি একটি মিনারের শীর্ষদেশে আত্মগোপন করে নিবিষ্টচিত্তে ও নির্বিঘ্নে লিপিচর্চা করতে থাকেন। এম. জিয়াউদ্দিন যথার্থই বলেছেন-'নাসখী স্টাইলের আবির্ভাব মুসলিম লিপিশিল্পের ইতিহাসে একটি রেনেসাঁ যুগের সূচনা করে।'[১৭৯]

মামলুক সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের আমলে (১২০৬-১২১০ খ্রি.) ভারতে নাসখী লিপিরীতির ব্যবহার শুরু হয়। এর পূর্বে এটি আফগানিস্তান ও খোরাসানে বিস্তার লাভ করেছিল। আফগানিস্তানের গজনীতে নাসখী লিপির কয়েকটি শিলালিপিও পাওয়া যায়। এগুলোতে ৩য় সুলতান মাসউদের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে। বর্ণিত আছে- আফগানিস্তান ও খোরাসান অঞ্চল থেকে মুসলিম সৈনিকগণ ভারত বিজয়ের জন্য আগমন করেছিলেন। এ সূত্রে ভারতবর্ষে এ লিপির বিস্তার লাভ করে। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এর একচ্ছত্র ব্যবহার শুরু হয়। তখন থেকেই এ লিপি দৈনন্দিন কাজ এবং সরকারী বিধি-বিধান, সিদ্ধান্তবলি, পাণ্ডুলিপি, পাঠ্যগ্রন্থ ও মুদ্রাগাত্রে লিপিবদ্ধকরণে ব্যাপক ব্যবহার হতে থাকে। বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলে (১৩৩৫-১৫৩৫ খ্রি.) নাসখী রীতিতে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি আজও বিভিন্ন জাদুঘর ও লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে। তন্মধ্যে 'ফরহাঙ্গে ইবরাহিমী' নামক একটি ফারসী অভিধানের পাণ্ডুলিপি অন্যতম। এটি 'শরফনামা' নামে পরিচিত। এর লেখক ইবরাহীম কাওয়ান ফারুকী।

চিত্র-১৪: নাসখী রীতির ক্যালিগ্রাফি 'ছানা'

[১৭৯] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সময়ের কপিগুলোতে নাসখী লিপির অধিকাংশ নিদর্শন দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেখ হামদুল্লাহ আল-আমাসী (মৃ. ১৫২০ খ্রি.) উসমানী ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর লিখিত নাসখী লিপির একটি কপি তুরস্কের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। বাংলার সুলতানী আমলে নাসখী লিপির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। বানকীপুরের খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে আরবী ও ফারসী পাণ্ডুলিপি সমূহের তালিকায় তিন খণ্ডে বুখারী শরীফের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এটি বাংলার সুলতান হোসাইন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযদান বখশ একডালা দূর্গে নাসখী লিপিতে রচনা করেন। এছাড়াও সুলতান মাহমুদের একান্ত সচিব মোস্তফা আফিন্দী এ লিপিশৈলীতে প্রভূত সৌন্দর্য বর্ধন করেন।[১৮০]

এ সকল পাণ্ডুলিপি নাসখী লিপিতে লিখিত। এছাড়া তখনকার সময়ে বাংলায় বিভিন্ন রঙের সমন্বয়ে সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিও তৈরি করা হয়। এসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে বর্তমানেও কয়েকটি অবশিষ্ট রয়েছে। তন্মধ্যে সুলতান নুসরত শাহের আমলে (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.) ফারসী ভাষায় লিখিত 'সিকান্দার নামা' উল্লেখযোগ্য। যা বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও সুলতান রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের আমলে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) উৎকীর্ণ দেওতলা শিলালিপির অঙ্গসৌষ্ঠব বিচার করে নাসখী লিপির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলায় মুঘল আমলে লিখিত নাসখী লিপির একটি কুরআনের নমুনা বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।[১৮১] সহজসাধ্য ও সাবলীল রীতি হিসেবে বর্তমান পৃথিবীর সর্বত্রই ছাপার অধিকাংশ কাজে, বিশেষত পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে এ লিপিরীতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

১.৩.২.৩ মুহাক্কাক লিপি (الخط المحقق)

মুহাক্কাক (محقق) অর্থ যথারীতি সৃষ্ট বা নির্ভুলভাবে উৎপন্ন রীতি। মূলত সুলুস ও নাসখী লিপির সমন্বয়েই এ লিপিশৈলীর উদ্ভব। এর উল্লম্ব রেখা একটু বেশি লম্বা এবং বক্র উপলাইনগুলো

---

[১৮০] *তারিখুল খাত্তিল 'আরাবী ওয়া আদাবিহী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০১।
[১৮১] *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

নমনীয় বক্রতায় লম্বাভাবে গিয়ে প্রবাহের মত সৃষ্টি করে। এর ঋজুদণ্ড এবং বক্রাকৃতি রেখা ও আনুভূমিক বাহুর আনুপাতিক ব্যবহার যথাক্রমে তিন চতুর্থাংশ ও এক চতুর্থাংশ। এর হরফগুলো বেশ বলিষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট। তাছাড়া এ লিপিশৈলীতে হরফগুলো হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন এর অগ্র ও শেষাংশকে এক বা একাধিক সুতার মত মনে হয়। খাঁড়া ও বক্রাকার রেখার অনুপাতে মুহাক্কাকের হরফগুলোর সাথে রায়হানী লিপির হরফের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। অবশ্য রায়হানী লিপির হরফের চেয়ে স্থুল কিন্তু সুদৃঢ়। এছাড়া অন্য যে প্রভেদ রয়েছে তা হল, মুহাক্কাকের রেখাগুলো খুব কমই বাঁকানো থাকে এবং সমান্তরাল রেখাগুলো সূচাগ্র হয় না।[১৮২] উল্লম্ব রেখার মাথায় আঁকশি বা কাটা থাকা, হরফের মাঝখানের ফাঁস আকৃতির খালি জায়গা ভরাট করা এবং পুরো লেখাটি গোলাকৃতি হওয়া ইত্যাদি দিক থেকে সুলুস লিপির সাথে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

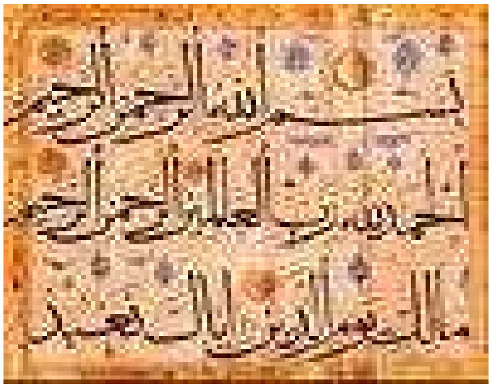

বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার কুতবাহ আল-মুহাররির প্রাথমিকভাবে এ লিপির রূপায়নের প্রচেষ্টা করেন। তবে ইবনে মুকলাহ এ লিপির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেন এবং ইবনে বাওয়াব ও ইয়াকুত আল-মুস্তা‘সিমী একে শিল্পমানে উত্তীর্ণ করেন। একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে এ লিপিতে প্রচুর সংখ্যক কুরআনের কপি করা হয়।[১৮৩] তাই এ লিপিকে আল-মাসাহিফ (المصاحف) বা কুরআনের লিপিও বলা হয়ে থাকে। ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে ইয়াকুত আল-মুস্তা‘সিমীর ছাত্র আহমদ আল-সোহরাওয়ার্দী বাগদাদে কুরআনের একটি আয়াত মুহাক্কাক লিপিতে অলঙ্কৃত করেন। যার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল চমৎকার ফুলের নক্‌শায় সমৃদ্ধ।

১.৩.২.৪ রায়হানী লিপি (الخط الريحانى)

---

[১৮২] *Islamic Calligraphy*, ibid, pp.17-20, 68-71.
[১৮৩] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-১৬: রায়হানী লিপির কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি

রায়হানী (ريحانى) লিপিশৈলী নাসখী লিপি হতে উদ্ভূত হলেও এতে সুলুস ও মুহাক্কাক লিপির প্রভাব বিদ্যমান। এর উপলাইনগুলো নাসখীর মত। উল্লম্ব রেখাগুলো সুলুস লিপি আর বক্র ঢালগুলো মুহাক্কাক লিপির মত। কারো কারো মতে, রায়হান অর্থ- তুলসী গাছ। এ লিপিতে হরফসমূহ বিশেষত আলিফ ও লামকে ধারাবাহিকভাবে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে এমনভাবে পরস্পর জড়ানো হয় যে, তা দেখতে তুলসী গাছের বিভিন্নভাবে জড়ানো ডালপালার মত মনে হয়। এ জন্য একে রায়হানী লিপি নামে অভিহিত করা হয়। এর স্বরচিহ্ন বা তাশকীলগুলো আলাদা ছন্দায়িত লালিত্যের জন্য অনেকে এর উৎস আল-রায়হান (কলমিলতা) মনে করেন। নবম শতাব্দীতে আলী ইবনে উবায়দা আল-রায়হানী কর্তৃক এ লিপিকলা আবিষ্কৃত হয় এবং উদ্ভাবকের নাম থেকেই এ লিপির নামকরণ করা হয়।[১৮৪] সুলুসের সাথে সুচাগ্র রেখার সাদৃশ্য থাকলেও রায়হানী লিপিশৈলীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এর খাঁড়া সরল রেখাগুলো জড়ানোভাবে শেষ হয় এবং কদাচিত বক্রাকার হয়, যা সুলুস ও জুলফ-ই-আরুস লিপিতে লক্ষ্য করা যায়। এর হরফগুলোর মধ্যভাগ মোটা ও নিম্নভাগ ক্রমশ সরু হয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। সেগুলো উল্লম্ব দণ্ডের মত হলেও বামে সামান্য হেলানো থাকে।

চিত্র-১৭: রায়হানী লিপির কুরআনের ক্যালিগ্রাফি

রায়হানী লিপিশৈলীতে হরফগুলোর মধ্যভাগ মোটা থাকে এবং নিম্নভাগ ক্রমশ সরু হয়ে শেষ হয়। কখনো কখনো সেগুলো খাঁড়াদণ্ডের মত হলেও বামে সামান্য হেলানো থাকে এবং একটি হরফের মাঝে আরেকটি হরফ প্রবিষ্ট হয়ে থাকে।[১৮৫] তাছাড়া এ রেখাগুলো খুব কমই সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। বক্রাকার ও খাঁড়া রেখাগুলোর

[১৮৪] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।
[১৮৫] *তারিখুল খাত্তিল 'আরাবী ওয়া আদাবিহী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২১।

Dhaka University Institutional Repository

অনুপাতের উপর সুলুসের সঙ্গে রায়হানীর পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। বড় আকৃতির কুরআন শরীফের অনুলিপি প্রস্তুত করতে এ রায়হানী লিপির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পারস্যের ইলখানী রাজত্বে এ লিপিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন- আল-হামাদানীর লিপিকলা। আলী ইবনে ওবায়দা আল-রায়হানী উদ্ভাবিত রায়হানী লিপিপদ্ধতি ইয়াকুতের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার ফলে উৎকর্ষতা লাভ করে।[১৮৬] চতুর্দশ শতাব্দীতে মামলুক সুলতান বারকুক ও তার পুত্র সুলতান ফারাজ কায়রোর একটি মসজিদে রায়হানী লিপির কুরআন শরীফের কপি উপহার পাঠান। এ লিপিটি রায়হানীর হাতে উদ্ভাবিত হলেও ইয়াকুতের হাতে সুষমামণ্ডিত রূপ লাভ করে।

১.৩.২.৫ তাওকী‘ বা ইজাযাহ লিপি (اوالاجاز التوقيعالخط)

চিত্র-১৮: তাওকী‘ লিপির ক্যালিগ্রাফি

তাওকী‘ (توقيع) অর্থ স্বাক্ষর বা Signature। আব্বাসী খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৩৩ খ্রি.) এর সময়ে এ লিপির উদ্ভব।[১৮৭] ইবনু মুকলাহ এটি উদ্ভাবন করেন। তবে কারো কারো মতে- ইবনু মুকলাহ’র পূর্বে ইউসূফ আস-সাজ্জি (মৃ. ৮২৫ হি.) সর্বপ্রথম এটি আবিষ্কার করেন। আব্বাসী খলীফা ও কাজীগণ একে দলীল-দস্তাবেজে স্বাক্ষর করার কাজে ব্যবহার করতেন। এ জন্য এটি তাওকী‘ নামে পরিচিত। এটি সুলুস ও নাসখী লিপির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত। ইবনুন নাদীম বলেন, ‘তাওকী‘ লিপিশৈলী অনেকটাই সুলুস শৈলীর ন্যায়।’[১৮৮]

আবার একে ইজাযাহ লিপিও বলা হয়। কেননা ইজাযাহ (إجازة) অর্থ অনুমোদন। যেহেতু খলীফা ও কাজীগণ একে ব্যবহার করে স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ ও অনুমোদন দিতেন। এ লিপিশৈলীতে আরো নতুনত্ব আনয়ন করেন শিল্পী মীর আলী সুলতান আত-তাবরিজী (মৃ. ৯১৯

[১৮৬] *Islamic Calligraphy*, ibid, pp.32-33.
[১৮৭] *ibid*, p.20.
[১৮৮] *আল-ওয়াজিযু ফী তারিখিল খাত্তিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১ ও ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

হি.)। এ রীতিতে আনুপাতিক হারে সরল ও ঋজুদণ্ডের ব্যবহার হবে শব্দ সমষ্টির এক চতুর্থাংশ এবং গোলাকার বর্ণ ও আনুভূমিক বাহুর ব্যবহার তিন চতুর্থাংশ হয়ে থাকে। সুলুসের সাথে এর মৌলিক নীতিমালার সাদৃশ্য রয়েছে। তবে এর হরফগুলো সুলুস লিপির চেয়ে বড় ও গোলাকার এবং অগ্রভাগ অধিকতর গোলাকৃতির। তাছাড়া এতে কোন কোন হরফের মাথা বাদ দিয়েও লেখা সম্ভব। মধ্যবর্তী আইন, ফা, ক্বাফ, মীম, ওয়াও ও লাম-আলিফ ইত্যাদি হরফের গিটসমূহ উন্মুক্ত কিংবা বিলুপ্ত করে লেখার ইখতিয়ার রয়েছে।[১৮৯]

তাওকী‘ লিপির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর খাঁড়া দণ্ডগুলো রুক‘আহর দণ্ড অপেক্ষা প্রলম্বিত। হরফগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িত ও সমন্বিত এবং সুষমভাবে লিপিকৃত। আনুপাতিকহারে সরল ও সোজাদণ্ডের ব্যবহার শব্দ সমষ্টির এক চতুর্থাংশ। আর গোলায়িত অংশ ও আনুভূমিক বাহুর ব্যবহার তিন চতুর্থাংশ। সুলুসের সাথে এর মৌলিক কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তবে এর বর্ণ ও তার শীর্ষদেশ সুলুসের চেয়ে অধিক গোলাকার হয়ে থাকে। এছাড়া এর উল্লম্ব দণ্ডগুলো পরস্পরের সাথে জড়িত ও সমন্বিত হয়ে থাকে। আবার এ লিপিকে রিয়াসী (ريلس) বা কার্যনির্বাহীও বলা হয়। খলিফা আল-মামুনের মন্ত্রী উজির ফজল ইবনু হারুন এ লিপি দেখে মুগ্ধ হয়ে একে সরকারী দপ্তরের লিপি হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং তিনি এর নাম রাখেন ‘রিয়াসী’ (ريلس)।

চিত্র-১৯: চতুর্দশ শতাব্দীর ইজাযাহ লিপির ক্যালিগ্রাফি

বর্তমানে অলঙ্কৃত লিপি হিসেবে এ লিপি বিভিন্ন গ্রন্থের শিরোনাম ও প্রচ্ছদ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ লিপির একটি চমৎকার নিদর্শন রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। যা ১৩২২ সালে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এর অভিনব লিখনকৌশল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটি কোন একটি কোন দক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতের কাজ। এতে কোন নোক্‌তা ও হরকত নেই।

[১৮৯] *আল-খাত্তুল ‘আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২।

Dhaka University Institutional Repository

এর হরফগুলো পরস্পর জড়ানো ও শৃঙ্খলিত বিধায় একে আত-তাওকী' আল-মুতাশাবিক বলে।[১৯০]

তাওকী' একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌলিক লিপিশৈলী হিসেবে দ্বাদশ শতাব্দীতে মর্যাদা লাভ করে। এ লিপির উৎকর্ষতায় আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনে খাজিনের (মৃ. ১১২৪ খ্রি.) বিশেষ অবদান রয়েছে। মামলুক ও 'উসমানী শাসনাধীন অঞ্চলে দলীলপত্র লিখনে ব্যবহৃত হত।[১৯১]

১.৩.২.৬ রুক'আহ বা রিকা লিপি (الخط الرقعه اوالرقاع)

চিত্র-২০: রুক'আহ লিপির ক্যালিগ্রাফি

রুক'আহ (رقعه) অর্থ কাগজের টুকরা। এর বহুবচন রিকা' (رقاع)। চিঠিপত্র প্রায়শ টুকরো কাগজে লেখা হয় বলে রুক'আহকে চিঠিপত্র অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ধারাটি সুলুস ও নাসখী থেকে সরাসরি এসেছে। এর হরফগুলো জ্যামিতিক আকৃতির এবং একক হরফগুলো খুব বলিষ্ঠ। এ লিপিটি সুলুসের সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও এর আকৃতি সুলুসের চেয়ে বেশ সংক্ষিপ্ত। এর গোলায়িত অংশগুলো একটু বেশি পরিমাণে গোলায়িত হয়ে থাকে। এর উল্লম্ব রেখার মাথায় আঁকশী বা কাটা থাকে না। মাঝের কাঁসাকৃতি অংশগুলো ভরাট হয়ে থাকে এবং এর বন্ধনীগুলো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া এর রেখাগুলো সর্পের মত লীলায়িত ভঙ্গিতে অথবা জলধারার তরঙ্গের মত সাবলীল ছন্দে প্রসারিত। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আব্দুল মজিদ খানের শাসনামলে রাজ্যের কর্মকর্তাদের সকল প্রকারের সরকারী চিঠিপত্র, প্রজ্ঞাপন, রেজিস্ট্রার ও লেখার ক্ষেত্রে একই ধরনের লিখনপদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্যে মমতাজ বেক এ লিপিরীতি উদ্ভাবন

---

[১৯০] মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, 'আল-খাত্তুল 'আরাবী ওয়া আছারুল হাদারি', *আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ* (লন্ডন: ১৯৯৪), ব.১, স.২, পৃ.১৯১।

[১৯১] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ.৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। রুকআ'হ লিপি প্রধানত দু'প্রকার। যথা- উসমানী রুক'আহ লিপি ও আধুনিক রুক'আহ লিপি।[১৯২]

বর্ণ বিন্যাসের দিক থেকে সুলুসের সাথে রুক'আহর সাদৃশ্য থাকলেও এর বক্ররেখাগুলো অধিকতর গোলাকৃতির এবং সমান্তরাল ও খাঁড়া হরফগুলো পরস্পর জড়িত। এ জন্য সুলুসের চেয়ে রুক'আহ লিপি বেশি আলঙ্কারিক। এম. জিয়াউদ্দীন বলেন- 'ইসলামী লিপিকলার আলঙ্কারিক শৈলীগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুষমামণ্ডিত হচ্ছে রুক'আহ'।[১৯৩] এ লিপিশৈলী টানা লেখার জন্য উপযোগী বলে এটি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও গল্প লিখন এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক গ্রন্থ লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ লিপিকে সাধারণত মধ্যম মাপের কাগজে ব্যবহার করা হয়। এটি উসমানী ক্যালিগ্রাফারদের মাঝে বেশ জনপ্রিয় ছিল। এ জন্য এ লিপিতে বেশি উন্নয়ন সাধিত হয় বিখ্যাত উসমানী ক্যালিগ্রাফার শেখ হামদুল্লাহ আল-আমাসীর (মৃ. ১৫২০ খ্রি.) সময়ে। অন্যান্য লিপির চেয়ে এটি সাধারণভাবে উন্নয়ন লাভ করে ও অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বৃহত্তর পরিসরে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানেও আরব বিশ্বে এ লিপিটি পরিমার্জিত ও সংশোধিত রূপে ব্যাপকভাবে চিঠিপত্র লেখার কাজে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এ লিপিরীতি যদিও প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও চিঠিপত্র লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজপ্রাসাদের বাইরেও তার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে এবং লিপিকার মুহাম্মদ ইজ্জত আফিন্দীর (১৮৪১-১৯০৩ খ্রি.) হাতে এটি অধিকতর

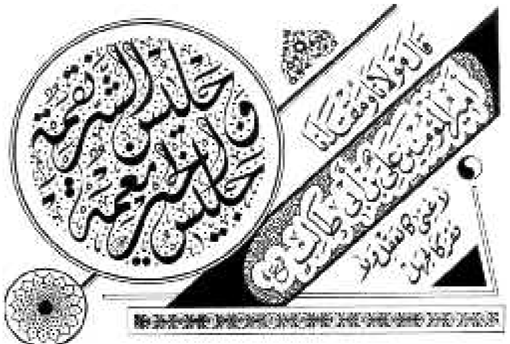

চিত্র-২১: জাওয়াদ সাবাতীর রুক'আহ লিপির ক্যালিগ্রাফি

[১৯২] *আল-ওয়াজিযু ফী তারিখিল খাত্তিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২।

[১৯৩] *Muslim Calligraphy*, ibid, p.63.

Dhaka University Institutional Repository

স্বচ্ছন্দ রূপ লাভ করে। এ সময়ে এ লিপি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ক্রমান্বয়ে এর সমাদর আরব জগতেও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে আরব দেশসমূহে এ লিপি কিছুটা পরিমার্জিত রূপে চিঠিপত্র লেখার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারত ও বাংলায় ব্যবহৃত ক্যালিগ্রাফির রীতিসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। এখানকার কয়েকটি শিলালিপিতে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে গুজরাটের কেম্বাইয়ে প্রাপ্ত শিলালিপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসবের অধিকাংশই হিজরী ৭ম শতাব্দীর প্রথমভাগে উৎকীর্ণ করা হয়। এছাড়া দক্ষিণ কৈরালা অঞ্চলেও এ রীতির বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ 'কাসরে হাতিম'-এর শিলালিপি অন্যতম। ভারতে মুসলিম শাসনের প্রথম ও মধ্য ভাগে বাংলা ও বিহার রাজ্যে এ রীতির বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন- জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের আমলে (১৪১৮-১৪৩৩ খ্রি.) উৎকীর্ণ শিলালিপির কথা উল্লেখ করা যায়। মুঘল আমলেও এ রীতিতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। এটি রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[১৯৪]

১.৩.৩ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির কতিপয় অপ্রধান ধারা

ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে প্রধান প্রধান ধারা বা লিপিশৈলীর পাশাপাশি আঞ্চলিক প্রভাবে আরও কতগুলো ধারার উন্মেষ ঘটেছে এবং এগুলোর মাঝে কিছু ধারা ইতোমধ্যে বিলুপ্তও হয়ে গেছে। আবার কোন কোনটি সংস্কার হয়ে আজও টিকে আছে। এ অপ্রধান ধারাগুলোর উদ্ভব ও এদের টিকে থাকার পেছনে কতিপয় ক্যালিগ্রাফারের স্বকীয়তা, জনসাধারণের সৌন্দর্যপ্রিয়তা এবং পর্যায়ক্রমিক কয়েকজন উৎসর্গীকৃত ক্যালিগ্রাফারের অবদান রয়েছে। নিম্নে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অপ্রধান কতিপয় শৈলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করতে প্রয়াস পাব।

১.৩.৩.১ দিওয়ানী লিপি (الخط الديوانى)

---

[১৯৪] মাহমুদ শুকর জাব্বুরী, *আল-মাদরাসাতুল বাগদাদিয়্যাহ ফিল খাত্তিল 'আরাবী*, (বাগদাদঃ ২০০১), খ.১, পৃ.৪২৩।

Dhaka University Institutional Repository

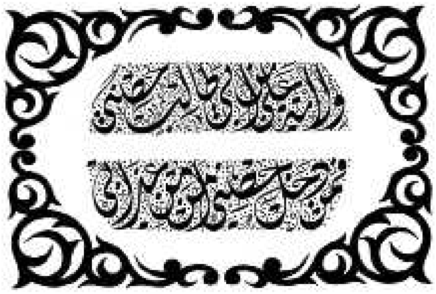

চিত্র-২২: জাওয়াদ সাবাতীর দিওয়ানী লিপির ক্যালিগ্রাফি

চমৎকার শৈলী ও নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ লিপি হিসেবে দিওয়ানী (ديوانى) লিপি ক্যালিগ্রাফিতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। লিপিশৈলীতে দক্ষতা অর্জন করার জন্য এ লিপিটি আত্মস্থ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লিপিরীতি সেলজুকদের আমলে প্রথম উৎপত্তি লাভ করে। তবে এর বিকাশ সাধিত হয় তুর্কীদের হাতে।[১৯৫] ষোড়শ শতাব্দীতে 'উসমানী তুর্কী ক্যালিগ্রাফারগণ এ লিপির আবিষ্কার ও ক্যালিগ্রাফির অন্যতম প্রধান লিপি হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সাসানীয় শাসনামলে তুর্কী ক্যালিগ্রাফারদের উদ্ভাবিত গোলায়িত লিপির একটি ধারা। রাষ্ট্রের যাবতীয় নির্দেশ বা ফরমান এ রীতিতেই লেখা হত। পরবর্তীতে লিপিশৈলীটি মিসরে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। মিসরের ক্যালিগ্রাফার আল-গাযলান মমতাজ বেক এ লিপির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর দিওয়ানী লিপির উপর মিসরে এমন মানসম্মত ক্যালিগ্রাফিকর্ম প্রকাশ হয় যাকে আল-খাত্তুল গাযলানী বলা হত। এভাবে মরহুম সাইয়েদ মুহাম্মদ আব্দুল আযীয আর-রিফাঈ (১৮৭১-১৯৩৪ খ্রি.) তাঁর একটি ফটোগ্রাফিক প্রকাশনায় দিওয়ানী লিপির ক্যালিগ্রাফিগুলো সুন্দরভাবে বিন্যাস করেন।[১৯৬] এ ধারার লিপিতে ব্যবহৃত হরফগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে জড়ানো থাকে এবং এগুলো বক্রাকার হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের আমলে বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার মুহাম্মদ ইবরাহীম মুনিফ তুর্কী তা'লিক থেকে এ লিপির আবিষ্কার করেন। অতপর ক্যালিগ্রাফার হাফিজ উসমান একে শিল্পমানে উন্নীত করেন এবং পরবর্তীকালে শেখ হামদুল্লাহ আল-আমাসী এ লিপির উৎকর্ষ সাধন

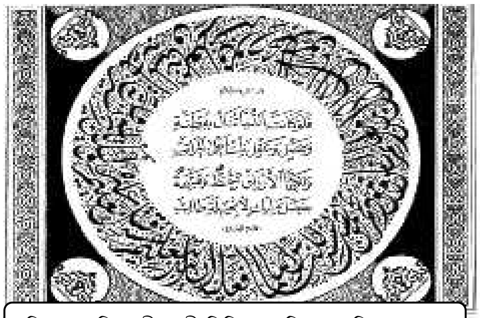

চিত্র-২৩: দিওয়ানী জালী লিপির একটি কম্পোজিশন

---

[১৯৫] *আল-খাত্তুল 'আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১১।

[১৯৬] *তারিখুল খাত্তিল আরাবী ওয়া আদাবিহী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[১৯৭] এ ধারা লিপিতে হরফগুলো বক্রাকার এবং মাত্রাধিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এতে তা'লিকের প্রভাব বিদ্যমান। ধারণা করা হয়, তা'লিক লিপি থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। এ লিপির নাম থেকেই এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। সরকারী অফিস-আদালতে এ লিপি ব্যবহৃত হয়। কারণ অত্যন্ত দ্রুত লেখার কাজে একে ব্যবহার করা যায়। এজন্য একে দিওয়ানী লিপি বলা হয়।[১৯৮]

আঞ্চলিক রীতিতে বিশেষ মোটিফে দিওয়ানী রীতির ব্যবহার হলে তা 'দিওয়ানী জালী' নামে পরিচিত। যাতে একটি হরফ আরেকটি হরফের মাঝে প্রবিষ্ট হয়। ফলে লাইনগুলো উপরে-নীচে সমতা রেখে সোজাভাবে অগ্রসর হয় এবং একে হরকত দিয়ে তাশকীল ও নোক্‌তার মাধ্যমে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়। এ লিপির আরেকটি নাম আছে। যাকে 'হুমায়ুনী' (همايونى) বা রাজকীয় লিপি বলা হয়।[১৯৯]

১.৩.৩.২ তুঘরা লিপি (الخط الطغرىاوالطرى)

চিত্র-২৪: তুঘরা শৈলীর একটি মনোগ্রাম

তুঘরা (طغرى) বা তুররা (طرى) আরবী ভাষার অনুপ্রবিষ্ট শব্দ। যা মূলত ফারসী ভাষার নিশান (نشان)-এর প্রতিশব্দ। এটি ইসলামী লিপিকলার সবচেয়ে সুষমামণ্ডিত ও চাতুর্যময় লিপিশৈলী। এর শাব্দিক অর্থ স্বাক্ষর, মনোগ্রাম, লগো ইত্যাদি। এটি তাওকী' এর সমার্থকবোধক শব্দ। প্রাথমিক পর্যায়ে তুঘরা আলঙ্কারিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্যালিগ্রাফারগণ যে কোন প্রধান রীতির অলঙ্করণের জন্য এটি ব্যবহার করত। কিন্তু পরবর্তীকালে এর বহুল প্রয়োগ ও জনপ্রিয়তার কারণে এটি আরেকটি স্বতন্ত্র

---

[১৯৭] *ইনতিশারুল খাত্তিল 'আরাবী ফিল 'আলিমিশ শারকী ওয়াল গারবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১।

[১৯৮] *তারিখুল খাত্তিল 'আরাবী ওয়া আদাবিহী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩।

[১৯৯] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

লিপিশৈলী হিসেবে বিবেচিত হয়। আরবগণ সরকারী প্রচারপত্র ও মুদ্রাসমূহে উৎকীর্ণ করে এর ব্যবহার করত। বর্তমানে একে রাষ্ট্রীয় কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতীক অর্থেও ব্যবহার করা হয়।[২০০]

আব্বাসী আমলে খলীফাগণ দলীল-দস্তাবেজ অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করার সময় এ লিপিশৈলী ব্যবহার করতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ লিপি বলতে কেবল পত্রের উপরিভাগে 'বিসমিল্লাহ'-এর উপর উৎকীর্ণ চিত্রকে বুঝানো হত। মিসরে আশরাফিয়া সাম্রাজ্যের পতনকালে সুলতান শা'বান বিন হোসাইনের আমল পর্যন্ত এ লিপি প্রচারপত্র ও দলীল-দস্তাবেজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে সুলায়মান ইবনে বায়েজীদ সর্বপ্রথম তুঘরা পদ্ধতিতে রাজকীয় স্বাক্ষর সম্বলিত সীলমোহর প্রয়োগের রীতি প্রবর্তন করেন। কেউ কেউ মনে করেন, তৃতীয় উসমানী সুলতান প্রথম মুরাদই সর্বপ্রথম এ লিপির প্রবর্তন করেন।[২০১]

এম. জিয়াউদ্দীন বলেন- The figure of the tiger has a text in Urdu which informs us that a hindu or moslem or any one who has faith in this drawing and hangs it on the wall of his house, would be safe from all sorts of evil influences. The Tughra was written at an auspicious time. A rather favourite form of Tughra used for such magical purpose is the parrot.

তুঘরা লিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- পাশাপাশি সন্নিবেশিত হরফগুলো অত্যধিক লম্বা স্বভাবের এবং এর একটি বর্ণ অন্যটির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে একটি সুন্দর দৃষ্টিনন্দন রূপ ধারণ করে। ফলে পাঠোদ্ধার কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ লিপিতে লেখার স্বাতন্ত্র্য ও মাহাত্ম্য ফুটে উঠে। একটি ক্যালিগ্রাফিতে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নাম এমন চাতুর্যের সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, তাতে তাদের গুণাবলি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এ জন্য এম. জিয়াউদ্দিন যথার্থই বলেছেন- 'আরবী লিপিমালার সর্বাপেক্ষা চাতুর্যপূর্ণ লিপিকৌশল হচ্ছে

---

[২০০] আল-শারিকাতুত তিউনিসিয়া লিত তাওযী, *আল-ক্বামুসুল জাদীদ লিত তুল্লাব*, ১৯৮৮, পৃ.৬১০।
[২০১] *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, ব.৩, স.১, পৃ.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

তুঘরা।’[২০২] এ লিপির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- কখনো কখনো হরফগুলোর উপরিভাগে মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। ফলে নিম্নাংশ দেখে মনে হবে যে, সেগুলো উপরে অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলো দেহের নিম্নভাগে খুব ভারী ও মোটা জুতা পরিধান করে আছে। এরূপ অলঙ্কৃত প্যানেলটি দেখে একটি শোভাযাত্রা বলে মনে হতে পারে।

অটোমানরা প্রায় চার শতাব্দীর অধিক সময় ধরে এ লিপিকৌশল অনুসরণ করেছিল। তবে বিভিন্ন তথ্যে প্রমাণ হয় যে, এর পূর্বেও এর প্রচলন ছিল। তাদের পূর্বে এশিয়া মাইনরে সেলজুক, বাংলায় মুসলিম ও মিসরে মামলুকদের মাঝে এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। এছাড়া মধ্যযুগে ভারত উপমহাদেশে গোলকুণ্ডা, হায়দরাবাদ ও বিজাপুর ইত্যাদি এলাকায় মুসলিম ক্যালিগ্রাফারদের লিপিকর্মে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কারো কারো মতে, তুঘরা সুলতান উগুজ খানের প্রতীক ছিল।[২০৩] মিসরে মামলুকদের আমলে (১২৫০-১৫১৭ খ্রি.) যখন এ লিপির ব্যাপক চর্চা অব্যাহত থাকে, ঠিক তখনই বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী আমলে এ রীতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনাকালে এ লিপির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শামসুদ্দীন আহমদ বলেন, ‘মুসলিম লিপিকলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং অদ্ভূত রীতি হচ্ছে তুঘরা শৈলী। বাংলার মুসলিম শাসনের প্রথম যুগেই ব্যবহৃত হয়েছে।’[২০৪] চীনা রাজদূতগণ বাংলার সুলতানদের রাজপ্রাসাদের বিশালতা ও কারুকার্যের উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। আরবী কবিতায় লেখা একটি শিলালিপিতে সুলতান রুকন উদ্দিন বরবক শাহের রাজপ্রাসাদের বিবরণ রয়েছে।[২০৫]

ক্রমান্বয়ে বাংলায় তুঘরা লিপির এতটাই উৎকর্ষ সাধন করে যে, সুলতানী আমলে এটি অত্যন্ত সাবলীল ও মাধুর্যপূর্ণ লিপিতে পরিণত হয়। এ আমলে স্থাপত্যরীতিতে আরবী শিলালিপিগুলোতে

---

[২০২] *মুসলিম লিপিকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮।
[২০৩] *আল-খাত্তুল ‘আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫।
[২০৪] *Inscription of Bengal*, ibid, vol.11, p.17.
[২০৫] *রমেশ চন্দ্র মজুমদার, মুসলিম সংস্কৃতি কমলা বক্তৃতামালা*, পৃ.৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ রীতির ব্যবহার দেখা যায়। কালো পাথরে উৎকীর্ণ এসব শিলালিপির বহু নিদর্শন বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। শিল্পীগণ অপরিসীম দক্ষতা ও সৃজনশীলতার গুণে হরফগুলোকে এমনভাবে বিন্যাস করে যে, তা আলঙ্কারিক মোটিফে রূপান্তরিত হয়। সমান্তরাল রেখা ও উল্লম্ব দণ্ডগুলো এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যে, কোন কোন তুঘরা লিপির ক্যালিগ্রাফি যুদ্ধাভিযানে সৈন্যবাহিনীর সারির মত, কোনটা নৌকা ও দাঁড়ের মত, কোনটা নামাজের কাতারসমূহের মত, কোনটা পানিতে ভাসমান হাঁসের মত, কোনটা তীর-ধনুকের মত, কোনটা দোচালা ঘরের মত, আবার কোনটা বেহালা ও বাঁশির মত। যেমন- মাহমুদ শাহের ৮৬০ হিজরীর শিলালিপি, ইউসুফ শাহের ৮৭৮ হিজরীর শিলালিপি, হযরত পাণ্ডুয়ার শিলালিপি, দারসবাড়ি, গৌড় ও হোসাইন শাহের শিলালিপি ইত্যাদি। নৌকার আকৃতিতে ঈমানে মুফাস্‌সাল দ্বারা গঠিত তুঘরায় এবং নাশপাতির আকৃতিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' কিংবা অন্য কোন ধর্মীয় বক্তব্য দ্বারা গঠিত তুঘরায় ব্যতিক্রমধর্মী অথচ সৃজনশীল আলঙ্কারিক মোটিফ প্রকাশ পায়।

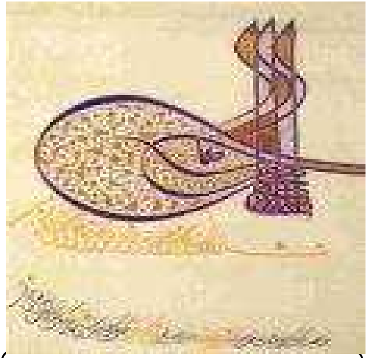
চিত্র-২৫: তুঘরা লিপির ক্যালিগ্রাফি 'বিসমিলাহ"

পবিত্র কুরআনের আয়াত বা সূরার অংশ বিশেষকে যে কোন প্রাণী যথা বাঘ, হাতি, ময়ুর ইত্যাদির আকৃতিতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। পাপাডোপোলা বলেন- 'আরবী লিপিকলার অসামান্য রৈখিক গুণাবলি এবং নির্বস্তুক বহিঃপ্রকাশের যে ধারা রয়েছে তা তুরস্কে তুঘরা নামে এক আকর্ষণীয় লিপিশৈলীতে রূপান্তরিত হয়।' মূলতঃ এটি আলাদা ধারার কোন লিপিশৈলী নয়, বরং সুলুস, নাসখী প্রভৃতি লিপিকে চাতুর্যপূর্ণ বিশেষ কৌশলে ছাঁচে ফেলে এটি করা হয়। ভন হোমারের মতে, সুলতান প্রথম মুরাদ লিখনশাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন বিধায় তাঁর হাতের অঙ্গুলিগুলোর বিভিন্ন নিদর্শনের অনুকরণে তুঘরার গোড়াপত্তন করেছিলেন।[২০৬] বিভিন্ন ধরনের তুঘরার কথা জানা যায়। যথা- সেলযুক বাংলার সুলতানী আমল, মিসরের মামলুক ও উসমানী আমলের তুঘরা।

[২০৬] মুসবাহ আমীন, 'ক্যালিগ্রাফিতে তুগরা শৈলী', *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*, জুন-২০০৬, পৃ.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুদ্দীন আহমদ যথার্থই বলেছেন- হোসেন শাহী আমলে আলঙ্করিক লিপিকলার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাছাড়া তাঁতীপাড়া জামে মসজিদে উল্লম্ব হরফে সাড়ে সতের ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও অর্ধ ইঞ্চি পুরুত্বে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। যা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা হয়।[২০৭] ঢাকা ডিসি রোড মসজিদে ১০৫২ সালে উৎকীর্ণ মুঘল চিত্রেও এ রীতির ব্যবহার দেখা যায়। শিল্পী এখানে তুঘরার অনুকরণে আলিফ ও লামসহ অন্যান্য হরফগুলোর লম্বসমূহকে উপরের দিকে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছেন। তবে সুলতানী আমলের তুঘরা লিপিতে যে সাবলীলতা ও মাধুর্য দেখা যায়, এতে তা দেখা যায় না। ড. হাবিবা খাতুন বলেন, 'The Tughra style is currently used by the calligraphers of Bangladesh.'[২০৮]

১.৩.৩.৩ তা'লিক লিপি (الخط التعليق)

চিত্র-২৬: তা'লিক লিপির ক্যালিগ্রাফি

তা'লিক (تعليق) অর্থ ঝুলন্ত (Hanging)। এটি ফারসী লিপিকলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি লিপিশৈলী। আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে এ লিপি তীর্যকভাবে লিখিত হয় বলে একে দেখতে ঝুলন্ত মনে হয়। তাই একে তা'লিক বলে। আরব ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত 'খাত্তুল কুরআন' হিসেবে ব্যবহৃত গোলাকার আরবী লিখনপদ্ধতি ফিরামুজ থেকে উদ্ভূত। অপরাপর বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন- তা'লিক নবম শতাব্দীতে প্রচলিত রিয়াসী লিপিশৈলী থেকে বিবর্তন হয়েছে। এ লিপিতে তাওকী' ও রুক'আহ লিপিশৈলীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট।[২০৯] আলঙ্কারিক দৃষ্টিতে তীর্যকভাবে

---

[২০৭] Dr. Sayed Mahmudul Hasan, *Glimpses of Muslim Art and Archetecture* (Dhaka: IF,1983), pp .13&28.

[২০৮] মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ক্যালিগ্রাফিতে সীরাতচর্চা', *ষাণ্মাসিক শিল্পকলা*, ব.২৪, স.১ (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ২০০৪), পৃ.১৪।

[২০৯] Yasin Hamid Safadi, *op. cit.*, p.27.

Dhaka University Institutional Repository

লিখিত হয় বলে এটিকে ঝুলন্ত মনে হয়। রিফাঈ বলেন- 'আজদুদ্দৌলা আল-দায়লামির কাতিব হাসান আল-ফারিসি নাসখী, রুক'আহ ও সুলুস লিখনশৈলীর সমন্বয়ে তা'লিক পদ্ধতির প্রাথমিক নীতিমালা উদ্ভাবন করেন।' আবার উবাদাহ'র মতে, প্রাচীন পাহলভীর প্রভাবে আরবী লিপি পারস্যবাসীদের হাতে তা'লিক লিখনরীতির রূপ পরিগ্রহ করে।[২১০] তবে এসব মতামতের মধ্যে আরব ঐতিহাসিকদের মতকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা এ লিপির পূর্বে পারস্যে কুফীলিপির প্রচলনই অধিক পরিমাণে ছিল। তারা কুরআনসহ অন্যান্য ধর্মীয়গ্রন্থ কুফীরীতি থেকে সম্পন্ন ফিরামুজ অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করত। তবে তা'লিকের উৎপত্তি ও বিকাশের পথে তাওকী', রুক'আহ, রিয়াসী ও নাসখী ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

তা'লিক লিপির গঠনশৈলী ও বিন্যাস এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, তা নাসখী ও নাসতা'লিক পদ্ধতির মধ্যবর্তী অবস্থানে বিরাজমান। এ লিপি কবিতা, দিওয়ান ইত্যাদি লেখার জন্য তুরস্কে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে সরল ও ঋজুদণ্ডের ব্যবহার অপ্রতুল এবং খাঁড়া ও লম্বদণ্ডের সারি আনুপাতিক হারে কম। তাছাড়াএ লিপি লিপিশৈলী ডানদিক থেকে বামদিকে এবং উপরের দিক থেকে নীচের দিকে ধাবমান। দ্রততার উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতিতে হরফগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত করা হয়। এজন্য এতে উল্লম্ব রেখা ছেড়ে কোণাকুণি রেখা অঙ্কনের প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। তা'লিক লিপিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- তা'লিক আনজাহ ও তা'লিক জালী।[২১১]

চিত্র-২৭: তা'লিক লিপিতে লিখিত কুরআনের আয়াত

ষোড়শ শতাব্দীতে সাফাভী আমলে (১৫০২-১৭৩৭ খ্রি.) তা'লিক লিপিশৈলীর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। পারস্যের মৃৎপাত্রেও এ রীতির ব্যবহার দেখা যায়। তাজ-ই-সালমানী ও আব্দুল হাই এ পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং এর প্রাথমিক বিকাশে বিশেষ অবদান রাখেন। এ লিপির খ্যাতিমান

---

[২১০] *ইনতিশারুল খাত্তিল 'আরাবী ফিল 'আলিমিশ শারকী ওয়াল গারবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩।
[২১১] *আল-ওয়াজিযু ফী তারিখিল খাত্তিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফার ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুনশী গনাবাদী।

তা'লিক লিখনরীতিতে প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে- ১০১০-১০১১ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। যা ডি. এস মারগালিউথ কর্তৃক ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে Royal Asiatic নামক ম্যাগাজিনে প্রকশিত হয়। এতে প্রাথমিক তা'লিক রীতির নিদর্শনাদি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সরকারী রেজিস্ট্রার, দলীল-দস্তাবেজ, ও কাব্যগ্রন্থ প্রভৃতিতে ফারসী লিপিশৈলী প্রকাশ পায়। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় গ্রন্থাদি বিশেষত কুরআন, হাদীসসহ অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি নাসখী লিপিতে লিখে তার মাঝখানে অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্পনীর অধিকাংশই তা'লিক লিপিতে লেখা হত।[২১২]

১.৩.৩.৪ নাসতা'লিক লিপি (الخط النستعليق)

নাসতা'লিক (نستعليق) শব্দটি নাসখ ও তা'লিক শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। নাসখ অর্থ রহিতকরণ, আর তা'লিক হচ্ছে একটি পদ্ধতি। অতএব তা'লিক পদ্ধতি বাতিল করে যে পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে তাকে নাসতা'লিক বলা হয়। আরবী নাসখ এবং ফারসী তা'লিক লিখনপদ্ধতির সংমিশ্রণে এ নামে একটি স্বতন্ত্র লিপির উদ্ভব হয়। অথবা নাসখ-ই-তা'লিক এর শব্দগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সংক্ষিপ্তরূপ নাসতা'লিক হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এটিকে নাসখ-ই-তা'লিক নামে অভিহিত করা হলেও পরবর্তীতে তা বহুল ব্যবহারের ফলে নাসতা'লিক-এ রূপান্তরিত হয়েছে।[২১৩] এ লিপিরীতিকে 'হস্তলিপি শিল্পের বধু' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এটি ফারসী লিপিকলাকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেয়।[২১৪] আরব ঐতিহাসিকদের মতে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার মীর আলী আত-তাবরীজির (মৃ. ১৪১৬ খ্রি.) প্রচেষ্টায় নাসতা'লিক লিপিশৈলীর উদ্ভব

---

[২১২] *ইনতিশারুল খাত্তিল 'আরাবী ফিল 'আলিমিশ শারকী ওয়াল গারবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪।
[২১৩] ইনতিশারাতে ওয়াযারাতে ফারহাঙ্গ ও হুনর, *মাসিক হুনর ও মর্দুম* (তেহরান: ১৩৪৩), স.২৮, পৃ.৩১।
[২১৪] গোলাম রেজা রাহপেইমা, 'ইসলামী সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিধানে হস্তলিপিশিল্পের ভূমিকা', *মাসিক নিউজ লেটার*, স.১১-১২,নভেম্বর-ডিসেম্বর-২০০৩, পৃ.৪১।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। লিপি বিশেষজ্ঞের মতে, তিনিই এ রীতির প্রথম প্রচলন করেন। তিনি মুসলিম লিপিকলার সর্বোৎকৃষ্ট ও সুষমামণ্ডিত শৈলীর গঠন ও ছন্দ বিন্যাসের জন্য কতিপয় নিয়ম প্রবর্তন করেন।

চিত্র-২৮: নাসতা'লিক লিপির একটি অনন্য ক্যালিগ্রাফি

সাফাদী বলেন- 'All important sources agree that the parsian calligrapher Mir Ali Sultan al Tabrizi was the founder of this script and he is also credited with devising the complex rules which govern it.'[২১৫] এটি নাসখী ও তা'লিক লিপিপদ্ধতির মার্জিত ও সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষত কুফীর কোণাকৃতি নাসখের বিপরীতে সাবলীল, বক্রাকার, স্বাচ্ছন্দ্যময়, লীলায়িত ছন্দের প্রকাশে নাসতা'লিক সার্বজনীন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ লিপি বিশেষভাবে গোলাকৃতি ও মসৃণ আরবী নাসখী ও ফারসী নাসতা'লিক লিপিতে লিখিত হয়ে থাকে।

নাসতা'লিক রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- খাঁড়া দণ্ডগুলো দীর্ঘ এবং সমান্তরাল রেখাগুলো গোলাকৃতি। এর বক্রাকার রেখাগুলো এমন গোলাকার রূপ ধারণ করে যে, তা যেন একফালি চাঁদ বা ডিম্বাকার বস্তু। ইয়াসিন হামিদ সাফাদী বলেন- 'It's clarity and geometric purity combine to make Nasta'liq seemingly casual elegance which belies its highly sophisticated and stricly applied rules.' অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে মার্জিত রূপে নাসতা'লিক লিপিশৈলীর সৃষ্টিতে এর স্পষ্টতা ও জ্যামিতিক স্বচ্ছতা সমন্বিত করে। যা অত্যন্ত পরিশীলিত ও সঠিকভাবে প্রয়োগকৃত নিয়ম-কানুনের ধারণা দেয়। এ পদ্ধতিতে শব্দে ব্যবহৃত বর্ণের গোলায়িত পরিসরকে বিস্তৃত ও বাঁকসমূহ ঢালু করা হয়। আবার লিপিমালাকে উত্তাল তরঙ্গে মধ্যভাগের ঢালু পরিসরের সাথে তুলনা করা যায়। এম. জিয়াউদ্দীন বলেন, এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ ও সোজা তরবারি বা

[২১৫] Yasin Hamid Safadi, *op. cit.*, p.27.

Dhaka University Institutional Repository

খড়গের আকৃতিতে তীব্রভাবে সূচালো হয়। সোজা সমতল বা তরবারির ন্যায় ক্রমবর্ধমান সামান্য বাঁক তার লম্বসমূহে সহজভাবে মাঝখান দিয়ে ধাবিত হয়।[২১৬]

চিত্র-২৯: নাসতা'লিক লিপির ক্যালিগ্রাফি 'সূরা আল-কাওসার'

উপরন্তু সরলীকরণের মাধ্যমে কোন কোন বর্ণের দাঁত লোপ করে কলম এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে, তার ক্রমশ ঢালুরূপ লেখার তড়িৎ গতিতে সহায়তা দান করে। যেমন- সিন (س) ও শিন (ش) বর্ণের উদাহরণ পেশ করা যায়। সাধারণভাবে লেখার সময় সিন ও শিন হরফদ্বয়ের তিনটি খাঁড়া দাঁত থাকে। কিন্তু নাসতা'লিক লিখনপদ্ধতিতে তিনটি দাঁত লোপ করে ঢালুভাবে উক্ত হরফদ্বয়কে এভাবে [illegible], [illegible] লেখা হয়। বর্ণের এ ঢালু বিন্যাসকে অনেক সময় আঁকা-বাঁকা ও তরঙ্গায়িত বলেও মনে হয়।

পারস্যের সাফাভী সুলতান শাহ তাহ্‌মাসপের শাসনামলে (১৫২৪-১৫৭৬ খ্রি.) নাসখীর পরিবর্তে নাসতা'লিক অধিকতর মর্যাদা লাভ করে। কাব্য, মহাকাব্য ও অন্যান্য সাহিত্যকর্মের অনুলিপি তৈরি করার ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিক লিপিতে পরিণত হয়। শাহ আব্বাসের শাসনামলে (১৫৮৮-১৬২৯ খ্রি.) অসংখ্য লিপিকার নাসতা'লিক লিপিশৈলী চর্চা করে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষত ক্ষুদ্র চিত্র সম্বলিত ফারসী লিপিতে তার ব্যবহার ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ মাহমুদ এ লিপিতে কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করেন। মীর আলীর পর অনেক মুসলিম ক্যালিগ্রাফার বিশেষত পারসীয় ক্যালিগ্রাফারদের প্রচেষ্টায় নাসতা'লিক রীতির চরম উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। সুলতান আলী আল-মাশহাদী এ রীতির প্রভূত সুষমা ও মাধুর্য বৃদ্ধি করেন। শাহ আব্বাসের শাসনামলকে এ রীতির স্বর্ণযুগ বলা হয়। তাঁর আমলে অসংখ্য

---

[২১৬] Ziauddin,'A Mograph of Muslem Calligraphy', *Visva Bharati Studies* (Calcutta:1969), p.42.

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফার নাসতা'লিক লিপিশৈলী চর্চা করে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। আল-হুসাইনী তাঁর জীবনকালে শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার হিসেবে কিংবদন্তীতে পরিণত হন। তাঁর লিপিচিত্র ছিল খুবই উন্নতমানের ও শৈল্পিক চাতুর্যময়। তাঁর পৃষ্ঠপোষক শাহ্ আব্বাস তাকে মহাকবি ফেরদৌসির শাহনামা গ্রন্থটির অনুলিপি করতে বলেন এবং সম্মানী বাবদ ৭০ তুমান প্রদান করেন। এ সময় যে সকল খ্যাতনামা লিপিকার নাসতা'লিক লিপিশৈলীতে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান আল-খাওয়ারেজমী, কাসেম সাদী, কামাল উদ্দিন হিরাতী, গিয়াস উদ্দিন আল-ইস্পাহানী ও ইমাদ উদ্দিন আল-হুসাইনী উল্লেখযোগ্য।[২১৭]

মূলত ভারতবর্ষে মুঘলদের আগমনের পর নাসতা'লিক লিখনশৈলীর প্রসার ও বিকাশ সাধিত হয়। যেহেতু মুঘলরা এ রীতিকে অত্যাধিক গুরুত্ব ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, তাই এটি অপরাপর সকল লিপিরীতির উপর রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রাধান্য পায়। অলঙ্করণ মোটিফ বা কৌশল হিসেবে মুঘল আমলের ইমারত গাত্রে অন্যান্য লিখনপদ্ধতির চেয়ে এ রীতির উৎকীর্ণ করার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। রাষ্ট্রীয় রেজিস্ট্রার, চিঠিপত্র, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি, শিলালিপি এমনকি মুদ্রাগাত্রেও এ লিপির ব্যবহার করা হত। শাহ্ শাসনামলে এ রীতি আল-কুরআনের বহু অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়। তাঁর আমলে ক্যালিগ্রাফারগণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশের জাতীয় জাদুঘর ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মুঘল আমলের নাসতা'লিক পদ্ধতিতে লিখিত বিভিন্ন লিপি এ রীতির বহুল প্রচলনের সাক্ষ্য বহন করে। মুঘল আমলে ইমারতের গায়ে অলঙ্করণের কৌশল হিসেবে এ রীতির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তবে এ লিপির মূল চর্চাকেন্দ্র ছিল ইরান। এখানে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ নিশাপুরী এ লিপিতে কুরআন লিপিবদ্ধ করেন।[২১৮] নাসতা'লিক লিপি থেকে কয়েকটি লিপির উদ্ভব হয়। তা হলো- শাফিয়া, হিলালী, তাহরীরি ও জুলফ-ই-আরুস ইত্যাদি।

---

[২১৭] *Muslim Calligraphy*, ibid, pp.55-56.

[২১৮] Annemarie Schimmel, *Calligraphy and Islamic Culture*, p.30.

Dhaka University Institutional Repository

১.৩.৩.৫ শিকাসতা লিপি (الخط الشكسته)

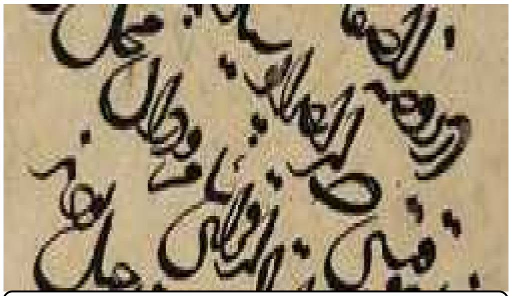

চিত্র-৩০: শিকাসতা লিপির দ্রুত লিখনের ক্যালিগ্রাফি

শিকাসতা (شكسته) ফারসী শব্দ। যার অর্থ ভঙ্গুর বা খাপছাড়া (Broken)। তা'লিক ও নাসতা'লিক থেকে উদ্ভূত শিকাসতা লিপি মূলত এক ধরনের সংকেত লিপি। দ্রুত লিখনের জন্য উপযোগী এ লিপি নাসতা'লিকের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এ লিপিতে ব্যবহৃত হরফসমূহের একটিকে অপরটির সাথে এমনভাবে সংযোগ করা হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণমালার আসল রূপ অবশিষ্ট থাকে না। বরং সেগুলোকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা আকৃতির মনে হয়। যেহেতু এ লিপিশৈলীতে হরফগুলো বিক্ষিপ্ত, খাপছাড়া ও অবিন্যস্তভাবে সেট করা হয়, সেহেতু এ লিপিশৈলীকে শিকাসতা (Broken style) নামে অভিহিত করা হয়। সাফাদীর মতে, তা'লিক ও নাসতা'লিকের সমন্বয়ে শিকাসতা লিখনপদ্ধতির উদ্ভব হয়।[২১৯] আবার রিফাঈ বলেন, তা'লিক ও দিওয়ানী পদ্ধতিদ্বয় থেকে এর উদ্ভব হয়। কেউ কেউ মনে করেন, শিকাসতা হলো প্রাচীনতম ফারসী লিপিরীতি।

এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, কাগজ হতে কলম না তুলে ডানের হরফকে বামের হরফের সাথে যোগ করে দেয়া এবং এভাবে আগাগোড়া লেখার কাজ সম্পন্ন করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে বর্ণমালার নো্কতা বা স্বরচিহ্ন ব্যবহার করা হয় না। এ লিখনপদ্ধতিতে আলিফ, দাল বা ওয়াওকে তাদের পরবর্তী হরফের সাথে যোগ করে দেয়া হয়। তাছাড়া প্রয়োজনবোধে ب, ع, ن, ى ও لا বর্ণসমূহের আকৃতি পরিবর্তন করে লেখা হয়। আর বাকি হরফগুলো নাসতা'লিকের মতই লেখা হয়।[২২০] এ লিপির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এর হরফগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং এগুলো সমান্তরাল অথবা লম্বালম্বিভাবে বিন্যস্ত থাকে। এতে হরকত ও স্বরচিহ্নের ব্যবহার দেখা যায় না।

---

[২১৯] Yasin Hamid Safadi, op. cit, p.30.

[২২০] E H Palmer, *Oriental Penmanship* (London: 1889), p.24.

Dhaka University Institutional Repository

যদিও প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এটি খুবই অবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ, তবুও এ প্রক্রিয়ায় লিপিকরণের জন্য যথেষ্ট অভ্যাস ও মননশীলতার প্রয়োজন হয়।

মুঘল ভারতেও শিকাসতা লিপিরীতির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- নওয়াব সুবিদ খানের লিপিকর্ম। এ রীতির খ্যাতনামা লিপিকার ছিলেন দরবেশ আব্দুল মজিদ তালিকানী। তিনি রাসূল প্রেমের চতুষ্টয় পঙ্‌ক্তি এ শৈলীতে উপস্থাপন করেন। এছাড়া প্রসিদ্ধ ক্যালিগ্রাফার ওয়ারিস আলী, ইস্পাহানের মুহাম্মদ রেজা ও মুঘল ভারতে মুহাম্মদ শাহের আমলের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার মুহাম্মদ সাদিক এ রীতিতে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। পারস্যে সাফাভী আমলের শেষভাগে সপ্তদশ শতাব্দীতে এ রীতির বহুল প্রচলন ছিল। জটিলতা ও অসংলগ্ন রীতি সত্ত্বেও এ রীতিতে দ্রুত লেখা যায়। ফলে বিচারালয়, সচিবালয় এবং ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক চিঠিপত্রে এ লিপির ব্যাপক প্রচলন ছিল। সাধারণভাবে ফারসী ও উর্দূ হস্তলিখনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। [২২১]

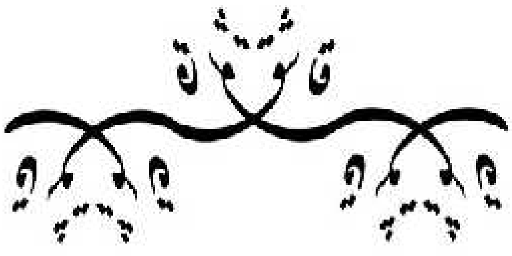

চিত্র-৩১: শিকাসতা লিপির একটি ভিন্নধর্মী ক্যালিগ্রাফি

সপ্তদশ শতাব্দীতে এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তবে জটিলতা ও অসংলগ্ন লিখনরীতি সত্ত্বেও এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লিপিশৈলীটি অতি দ্রুত লেখার জন্য বেশি উপযোগী। এ জন্য আদালত, সচিবালয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এ রীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এ লিপিতে বক্ররেখাগুলো কলমের দ্রুত আঁচড়ে অবিন্যস্ত রেখামালায় পরিণত হয়। সুদক্ষ লিপিকার হরফগুলোর অংশবিশেষকে দ্রুত লিখনরীতি দ্বারা সুষমামণ্ডিত এক আলঙ্কারিক লিপিতে রূপান্তরিত করেন। তবে পঠনের জন্য এ লিপিশৈলী খুবই জটিল। [২২২]

---

[২২১] Yasin Hamid Safadi, *op. cit*, p.30.

[২২২] *Muslim Calligraphy*, p.63.

Dhaka University Institutional Repository

শিকাসতার একটি উপরীতি হচ্ছে 'শিকাসতা আমীয'। এটি সাধারণত অফিস-আদালতে বহুল প্রচলিত এ শৈলীতে হরফগুলো মূলরীতির হরফ অপেক্ষা দীর্ঘ এবং মাত্রাধিকভাবে অসংলগ্ন। সাধারণত শিকাসতা আমীয রঙিন অথবা অলঙ্কৃত কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়।

১.৩.৩.৬ ঘুবার লিপি (الخط الغبار)

চিত্র-৩২: ঘুবার লিপিতে লিখিত আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপি

ঘুবার (غبار) অর্থ উড়ন্ত বা ক্ষুদ্র বালুকণা। এটি বক্রাকার লিপিকলার অন্যতম একটি প্রকরণ। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার উল্লম্ব দণ্ড ও আনুভূমিক বাহু অতীব ক্ষীণ ও সরু। এটি খুবই সাধারণ ও প্রাঞ্জল রীতিতে লিপিকৃত। কেননা এ ধারার লিপিতে লিখিত হরফগুলো এতই সুক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র যে, তা দেখে মনে হয় যেন উড়ন্ত বালুকণা। তা দেখতে আতশী কাঁচের সাহায্য নিতে হয়। এটি খুব ছোট কাগজে ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষুদ্রাকৃতির হরফে লিখতে হয়। আগেকার যুগে যুদ্ধের সময় এ লিপিতে লিখে কবুতরের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করা হতো। এজন্য অনেকে একে 'খাত্তুল জানাহ' নামেও অভিহিত করেছেন। নবম শতাব্দীতে খলীফা আল-মামুনের রাজদরবারে দলীল-দস্তাবেজে ব্যবহৃত রিয়াসী লিপি থেকে আল-আহওয়াল আল-মুহাররির এ লিপির উদ্ভাবন করেন। এর প্রকৃত নাম ঘুবার আল-হালবাহ (غبار الحلبه)। এতে নাসখী ও সুলুসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগত ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ অসাধারণ দক্ষতা ও শৈল্পিক গুণাবলি সম্পন্ন ক্যালিগ্রাফার ব্যতীত কোন লিপিকারের পক্ষে এত ক্ষুদ্র হরফে কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ বা রাজকীয় চিঠিপত্র লেখা সম্ভব নয়।[২২৩]

মুসলিম জাহানের অনেক ক্যালিগ্রাফার এ লিপিশৈলীর চর্চায় সুনাম অর্জন করেন। ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ ওরফে ইবন আল-জামাকজালী (মৃ. ১৩৮৬ খ্রি.) ও কাশিম ঘুবারি (মৃ. ১৬২৪ খ্রি.) তুরস্কের হাফিজ উসমান ও মিসরের হাসান আব্দ আল-জাওয়াদ ও তাহির আল-কুরদী এদের

---

[২২৩] *আল-খাত্তুল 'আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাফিজ উসমান ঘুবার লিপিতে পবিত্র কুরআন ও আরও কিছু কথাসহ ৭৭,৯৩৪টি শব্দ মাত্র একটি ডিমের খোলসে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া মাত্র ৫০X৫৪ সেন্টিমিটার পরিমাপের একটি কাগজে সমগ্র কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করার নজিরও রয়েছে। শুধু তাই নয়, মিসরের হাসান আবদ আল-জাওয়াদ একটি গমের দানায় কুরআন শরীফের তিনটি সূরা লিপিবদ্ধ করেছেন।[২২৪]

১.৩.৩.৭ তুমার লিপি (الخط الطومار)

তুমার (طومار) শব্দের অর্থ- এক হাত প্রস্থবিশিষ্ট বড় ধরনের পাতা। খলীফাগণ বিভিন্ন অনুলিপি, রাজা-বাদশাহ ও বিশিষ্ট লোকদের নিকট প্রেরিত চিঠি-পত্র ও নির্দেশনামা ইত্যাদিতে স্বাক্ষর করার কাজে এ লিপি ব্যবহার করতেন। এটি সর্বাধিক মোটা ও বলিষ্ঠ লিপিশৈলী। বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার কুতবাহ আল-মুহাররির উমাইয়া যুগে এর উদ্ভাবন করেন। সে যুগের খলীফাগণ সরকারী চিঠিপত্র ও দলীল-দস্তাবেজে তাদের প্রতীক উৎকীর্ণ করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতেন। এ রীতির হরফের প্রস্থ ঘোড়ার ২৪টি পশমের সমপরিমাণ হয়ে থাকে।[২২৫] এ লিপির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার সুররামররি বলেন-

চিত্র-৩৩: তুমার লিপিতে ক্বাফ বর্ণের ক্যালিগ্রাফি

১. হরফের গোলাকার অংশ কলমের মুখাপাত দ্বারা, টানগুলো কলমের দাঁত দ্বারা এবং উল্লম্ব রেখাগুলো কলমের মুখাপাত দ্বারা ডান দিকে পাকানোভাবে লিখতে হয়।
২. ‘মীম’ হরফটি খোলা ও গোলাকৃতি এবং ‘ফা’ ও ‘ক্বাফ’ এর মাঝখানে সুচালো আর পার্শ্বদেশগুলো গোলাকৃতি হয়।
৩. হরফের মাঝখানের শূন্যস্থান পরিমাণ লাইনগুলোর মাঝে ফাঁকা স্থানের মত হয়।
৪. কাগজের দু’দিকে সমপরিমাণ অতিরিক্ত জায়গা থাকে।

---

[২২৪] *Islamic Calligraphy*, ibid, pp.21-25.
[২২৫] *সুবহুল ‘আশা*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫. গোলাকৃতির ‘সোয়াদ’ কিংবা খোড়ানো ‘ক্বাফ’ থাকে না।[২২৬]

শায়খ যায়নুদ্দীন শা‘বান আল-আসারি তাঁর আলফিয়্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এ লিপিতে- আলিফ, জীম, হা, খা, তোয়া, ক্বাফ ও লাম ইত্যাদি হরফের মাথায় আঁকশি বা কাঁটা থাকে। তারপরেও সোয়াদ, তোয়া, যোয়া, আইন, গাইন, ফা, ক্বাফ, মীম, হা, ওয়াও ও লাম-আলিফ ইত্যাদি হরফের মাঝের কাসাকৃতির খালি অংশটুকু ভরাট করা হয় না।[২২৭] এ পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত প্রকরণ হচ্ছে মুখতাসারুত তুমার। এ রীতিতে হরফের প্রস্থ ঘোড়ার ১৬-২৪টি পশমের পরিমাণের মাঝামাঝি হয়ে থাকে। এতে হরফগুলোকে সুলুস রীতির চেয়ে সামান্য গোলাকার এবং মুহাক্কাক রীতির চেয়ে কিছুটা প্রসারিত করে লেখা হয়। এর হরফগুলোতে তুমার লিপির ন্যায় মাথায় আঁকশি বা কাঁটা থাকে।

১.৩.৩.৮ মাগরিবী লিপি (الخط المغربى)

চিত্র-৩৪:হরিণের চামড়ার উপর লিখিত ক্যালিগ্রাফি ‘আলাহু’

মাগরিবী (مغربى) লিপি কুফী লিপি হতে উৎসারিত। যা কুফীর ন্যায় এত খাঁড়াও নয়। আবার নাসখীর মত এত গোল ঢেউ খেলানোও নয়।[২২৮] এটি ইসলামী লিপিসমূহের মধ্যে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীনতম শৈলী। যা বর্তমানের মিসর এবং মধ্য ও পশ্চিমা বিশ্বের কিছু অঞ্চল ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সর্বত্রই বিস্তৃত। মধ্যযুগে স্পেনে এ রীতির ব্যবহার দেখা যায়। কায়রোয়ানকে মাগরিবী লিপির উন্নয়নের ভিত্তিভূমি ধরা হয়। এ কারণে এ লিপিকে কায়রোয়ানের দিকে সম্বন্ধ করে ‘কায়রোয়ানী লিপি’ নামেও অভিহিত করা হয়। এ লিপির প্রাপ্ত প্রাচীনতম সমন্বয়ে বিকাশ ঘটে। তাছাড়া এতে বক্র ও অর্ধ গোলাকার কুফী লিপিরও প্রভাবও রয়েছে।

---

[২২৬] *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৩।
[২২৭] *আল-খাত্তুল ‘আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩।
[২২৮] *ইসলামী শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫০ হিজরী মোতাবেক ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের বিজয়ের পর পাশ্চাত্যের রাজধানী কায়রোয়ানের নামানুসারে এ লিপিকে 'কায়রোয়ান লিপি' নামেও নামকরণ করা হয়। আব্বাসী খিলাফত হতে মাগরিব পৃথক হওয়ায় এ শহরটির রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। ফলে মাগরিবের কেন্দ্রভূমিতে জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে। এভাবে মাগরিবী লিপি অনন্য সৌন্দর্যের লিপি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অতপর যখন মাগরিবের রাজধানী কায়রোয়ান হতে আন্দালুসে পরিবর্তিত , তখন এর নামকরণ করা হয় 'আন্দালুসীয় লিপি।'[২২৯]

চিত্র-৩৫: নকশা সমৃদ্ধ মাগরিবী লিপির ক্যালিগ্রাফি

মাগরিবী লিপির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- হরফে হরফে সন্নিবদ্ধতা, শব্দে শব্দে যোগসূত্র তা এবং বাক্যের মাঝে যে স্বচ্ছন্দ বন্ধন, তা একে ব্যতিক্রম করে উপস্থাপন করেছে। এ লিপিতে হরফের উল্লম্ব রেখাগুলো সামান্য হেলে থাকে। কুফী লিপিতে মাগরিবী লিপির অলঙ্করণ ও শৈল্পিক ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। কুফী লিপির শিরোনামে বিশেষভাবে এ লিপি ব্যবহার করা হত। লেখার উপকরণ যেমন- কাগজ, কালি ইত্যাদি এ লিপির ক্ষেত্রে বেশ বৈচিত্র দেখা যায়। কাগজের পরিমাপ, ধরন, কালির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলত। ফলে বিভিন্ন পরিমাপের লেখা ও কালির ব্যবহার এ লিপিতে উৎকর্ষ এনে দেয়। সাধারণ লেখার জন্য যেমন সাধারণ কাগজ-কালি হলেই হয়, তেমনি মাগরিবী লিপির জন্য বিশেষ ধরনের কাগজ প্রস্তুত এবং দীর্ঘ সময় ধরে এর উপর ক্যালিগ্রাফি করতে হত। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

মাগরিবী লিপি তৃতীয় হিজরীতে কুফী রীতি থেকে উদ্ভুত হয়েছে। এটি আগলাভিদের রাজধানী কায়রোয়ান ছাড়াও আন্দালুসীয় কর্ডোভীয় নাসখী নামে স্পেনে আরেক ধরনের লিপিশৈলীর প্রচলন

---

[২২৯] *তারিখুল খাত্তিল আরাবী ওয়া আদাবিহী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৮।

Dhaka University Institutional Repository

হয়, যা এর চেয়েও অধিকতর বক্রাকার।[২৩০] লিপিশিল্পের একটি পর্যায়ে এসে মাগরিবী লিপি বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন- কায়রোয়ানী, আন্দালুসী, ফেজি ও সুদানী ইত্যাদি।

১.৩.৩.৯ বিহারী লিপি (الخط البهارى)

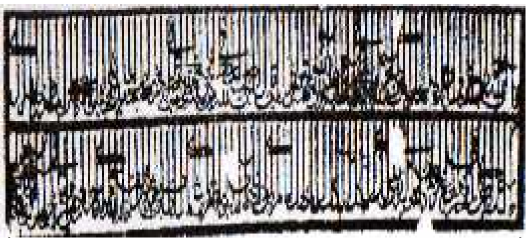
চিত্র-৩৬: বিহারী লিপির পাণ্ডুলিপি

বিহারী (بهارى) লিপি হচ্ছে- ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম লিপিকলায় একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শৈলী। এ লিখনরীতির আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। গঠনগত দিক থেকে এটি কিছুটা নাসখীর মত। কিন্তু সমান্তরালভাবে লিখিত হরফগুলো প্রথমে ক্ষীণ হতে শুরু করে পরে বাম দিকে মোটা হতে থাকে। এর শেষাংশ রায়হানীর মত সূচাগ্র অথবা নাসতা'লিকের মত ভোতা বা স্থুল বিন্দুতে পরিসমাপ্তি ঘটে। এ শৈলী আফগানিস্তানেও প্রচলিত আছে। ইয়াসিন হামিদ সাফাদী মনে করেন, 'বিহারী লিপিশৈলী পরবর্তীকালে উসমানী সাম্রাজ্যে 'সিয়াকাত' নামে এক লিখনরীতির উন্মেষের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। [২৩১] আরব বিশ্বে এ লিপির ব্যবহার খুব একটা দেখা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, পূর্ব ভারতের বিহার প্রদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে একে বিহারী লিপি নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ লিপির উৎপত্তিকালও সুনির্দিষ্ট করে বলা দুরূহ। বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত উপকরণের ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে, এ লিপিরীতি হিজরী ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ভারত বা এর পাশ্ববর্তী আফগানিস্তানে উৎপত্তি লাভ করে।[২৩২] এ লিপির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- এতে অক্ষরগুলো প্রথমত ক্ষীণভাবে শুরু হয়ে ক্রমে ক্রমে মধ্যভাগে এসে মোটা রূপ ধারণ করে এবং পুনরায় ক্ষীণ হতে শুরু করে। আবার ক্রমে শেষ ভাগে গিয়ে ক্ষীণতর রূপ ধারণ করে।

১.৩.৩.১০ কাশ্মীরী লিপি (الخطكشميرى ال)

---

[২৩০] *Islamic Calligraphy*, ibid, p.21.

[২৩১] Yasin Hamid Safadi, *op. cit*, p.28.

[২৩২] *আল-খাত্তুল 'আরাবী ওয়া আছারুল হাদারি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের ভারতীয় ক্যালিগ্রাফির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অংশ হলো কাশ্মীরী লিপি। এটি কাশ্মীরের মুসলমানদের মুসলিম সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক এতিহ্যের অনুপম নিদর্শন। সে সময়ের অনিন্দ্য সুন্দর অলঙ্করণ, ক্যালিগ্রাফির ছন্দময়তা আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কাশ্মীরের অধিকাংশ ক্যালিগ্রাফিই আরবী ভাষায় সম্পন্ন হয়। যা সমসাময়িক অন্যান্য ক্যালিগ্রাফির সমমর্যাদা ও মানসম্পন্ন। মধ্যযুগে এসব ক্যালিগ্রাফি শুধু আরবী ভাষাকে প্রচার ও প্রসারই করেনি। বরং একে সুসংহতও করেছে। উপরন্তু মুসলিম শাসকদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ও আগ্রহে ক্যালিগ্রাফি বিস্ময়কর পর্যায়ে উপনিত হয়। তাছাড়া সুলতানী ও মুঘল আমলে কাশ্মীরী ক্যালিগ্রাফারগণ যখন অমোচনীয় কালি আবিষ্কার করেন, তখন থেকে ক্যালিগ্রাফিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে সন্নিবেশিত হয়।[২৩৩]

চিত্র-৩৭: কাশ্মীরী লিপির ক্যালিগ্রাফির নমূনা

'জারিন কলম' খ্যাত মুহাম্মদ হোসাইন ও আলী চমন সম্রাট আকবরের দরবারী ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তারা এ লিপির বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। এ লিপির উন্নয়নে তাদের অবদান প্রসংসার দাবি রাখে। মুহাম্মদ মুরাদ সম্রাট শাহজাহানের দরবারী ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তার ক্যালিগ্রাফির সৌন্দর্য ও নজরকাড়া অলঙ্করণে মুগ্ধ হয়ে মোল্লা মীর আলী ও সুলতান আলী তাকে অভিনন্দিত করেন। তিনি মোটা বা ভারী এবং চিকন বা হালকা উভয় ধরনের লিপিতেই দক্ষ ছিলেন। সম্রাট তার কাজে মুগ্ধ হয়ে তাকে 'শিরিন কলম' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাছাড়া মোল্লা মহসিন ও মোল্লা বাকের এ লিপির খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার ছিলেন।

১.৩.৩.১১ সিয়াকাত লিপি (الخط السياقت)

---

[২৩৩] ইসলামী ক্যালিগ্রাফি যুগে যুগে, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

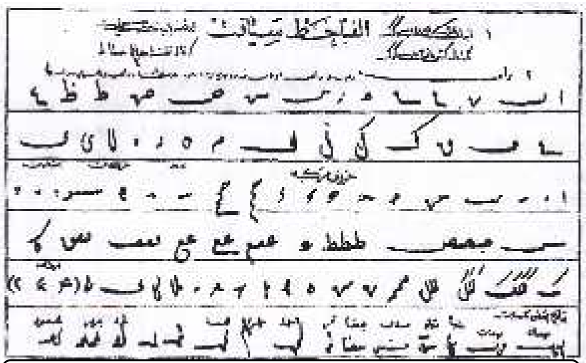

চিত্র-৩৮: সিয়াকাত লিপিতে লিখিত আরবী বর্ণমালাসমূহ

সিয়াকাত (سياقت) একটি জটিল প্রকরণ। এটি অটোমান তুর্কী ক্যালিগ্রাফারদের সৃষ্ট গোলাকার লিপি। সরকারী রেজিস্ট্রার, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক চুক্তিপত্র ও লেনদেন সংক্রান্ত লেখনির জন্য অটোমানরা এ লিপির ব্যবহার করত। এ লিপি এতটাই কঠিন প্রকৃতির যে, তা পাঠোদ্ধার করা বড়ই কষ্টসাধ্য। এ ধারার লেখাগুলোতে হরফগুলো অধিকতর অস্পষ্ট ও টানা প্রকৃতির হয়ে থাকে। মিসরেও রোজনামচা বা দৈনন্দিন কার্যক্রম লেখার ক্ষেত্রে এ লিপির বহুল প্রচলন বিদ্যমান ছিল। মাহমুদ ইয়াযির এ রীতির একজন প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ছিলেন।[২৩৪]

১.৩.৩.১২ গুলজার লিপি (الخط الغلزار)

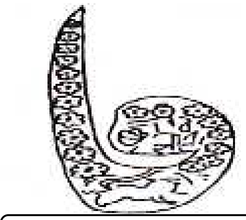

চিত্র-৩৯: গুলজার লিপির ক্যালিগ্রাফি

গুলজার (غلزار) ফারসী শব্দ। যার অর্থ রেখা। এটি একটি বৈচিত্রময় লিখনশৈলী। যাতে কলমের আঁচড়ে হরফের পরিলেখ সৃষ্টি করে অলঙ্কার সম্বলিত ফুল, মাছ, বিভিন্ন প্রাণী ও নানাবিধ নক্‌শার মাধ্যমে সাজানো হয়। যেমন- গুলজার (রেখা), মাহি (মাছ) ইত্যাদি। মুঘল আমলে ঢাকায় কাগজ-কলমে এবং কিতাবের পাতায় এ রীতির চর্চা দেখা যায় ও খ্যাতি লাভ করে।[২৩৫] এতে প্রতিটি হরফ স্বচ্ছন্দ কলমের টানে রচিত রেখালিপির মোটা দাগগুলোর মধ্যে কালি মুছে ছোট ছোট ফুলের রূপরেখা জুড়ে দিয়ে অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়। মিহি রেখাগুলোর ধারাবাহিকতায় তার কলমের টানের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষিত হয়। স্বভাবত কাগজ কিংবা প্রস্তরফলকে এ রেখালিপির লিখন বা অনুকরণ চতুষ্কোণ আয়ত পরিধিতেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

১.৩.৩.১৩ তাউস লিপি (الخط الطاءوس)

---

[২৩৪] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৬।

[২৩৫] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত,পৃ.৪২-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪০: ময়ূরাকৃতির তাউস লিপির নমূনা

তাউস (طاءوس) মূলত একটি ব্যতিক্রমধর্মী লিখনশৈলী। কেননা এ রীতিতে প্রচলিত পন্থায় কলম দ্বারা লেখা হয় না। বরং প্রথমে কলমের আচঁড়ে হরফের একটি পরিলেখ সৃষ্টি করা হয় এবং পরে আলঙ্কারিক রেখা তথা ফুল, লিপি, ময়ূর, জ্যামিতিক নক্‌শা, মৃগয়ার দৃশ্য প্রভৃতি প্রতিকৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। আলঙ্কারিক মোটিফের উপর নির্ভর করে এর নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন- তাউস (ময়ূর) ইত্যাদি। লিপিশৈলীতে হরফগুলোকে সমান্তরাল ও খাঁড়াভাবে এরূপ বিন্যাস করা হয় যে, সামগ্রিকভাবে তা ময়ুরের আকৃতি ধারণ করে। রেখা দ্বারা সৃষ্ট হরফের অভ্যন্তরের খালি স্থান ময়ুরের পেখম ও পালক দ্বারা অলঙ্কৃত থাকে।[২৩৬] তাউস (طاءوس) অর্থ ময়ুর। এ লিখনরীতি যেহেতু পুরোপুরি ময়ুরের মতো দেখা যায়, তাই একে তাউস বলা হয়।

১.৩.৩.১৪ সাক্বি বা লারজা লিপি (الخط السقى)

চিত্র-৪১:কম্পমান হাতের সাক্বি লিপির বর্ণমালা

সাক্বি (سقى) বা লারজা প্রচলিত ধারা বা তেমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন লিপিশৈলী নয়। বরং গুলজার ও তাউস লিপির মতোই আরেকটি অভিনব আলঙ্কারিক শৈলী। এ লিপির হরফগুলো দেখতে মূলত: দাঁতওয়ালা করাতের মতো এবং বাঁকানো পত্র-পল্লবের মত মনে হয়। এ ধরনের লিখনপদ্ধতির বিশেষ দিক হলো- লিপিকরণের সময় উত্তেজিতভাবে কম্পমান হাতে কলম ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আর তেমন কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।[২৩৭]

১.৩.৩.১৫ তাজ লিপি (الخط التاج)

---

[২৩৬] *Muslim Calligraphy*, ibid, pp.63-64.

[২৩৭] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

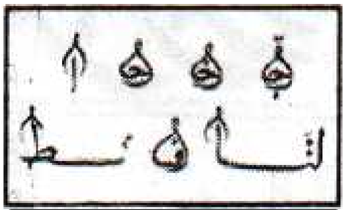

চিত্র-৪২: মুকুটরূপী তাজ লিপির ক্যালিগ্রাফি

তাজ (تاج) অর্থ মুকুট বা শাহী টুপি। কিছু কিছু হরফ আছে যেগুলোর মাথা বা উপরিভাগকে গম্বুজের আকৃতির মত রূপ দেওয়া যায়। এ রকম হরফগুলো দ্বারা যে লিপিশৈলীর সৃষ্টি হয় তাকে তাজ লিপি বলে। আবার কখনও কখনও এগুলোকে পাগড়ী বা শিরস্ত্রাণের মত দেখা যায়। মুহাম্মদ আফিন্দী, মাহফুজুল খবীর একে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এবং এর চর্চায় বিখ্যাত ছিলেন। তারা মিসরের মন্ত্রণালয়ে চাকুরী করতেন। হরুফে তাজ-এর ব্যবহার রুক'আহ লিপির চেয়ে নাসখী লিপিতে অধিকতর সুষমামণ্ডিত।[২৩৮]

১.৩.৩.১৬ জুলফ-ই-আরুস লিপি (الخط الزلف عاروس)

চিত্র-৪৩: জুলফ-ই-আরুস লিপির ক্যালিগ্রাফি

জুল্ফ (زلف) অর্থ বেণী আর আরুস (عاروس) অর্থ বধু। সুতরাং জুলফ-ই-আরুস অর্থ বধুর বেণী। এটি স্বতন্ত্র কোন লিপিশৈলী না হলেও এটি নাসতা'লিক পদ্ধতির একটি অলঙ্করণ মাত্র। এটি রায়হানী ও নাসতা'লিক লিপির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ একধরনের লিপিশৈলী। এতে হরফের সমান্তরাল রেখাগুলোর শেষপ্রান্ত থেকে বক্রাকারে কুণ্ডলাকৃতি হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। খাঁড়া দণ্ডগুলো ৪৫ ডিগ্রি নাতিদীর্ঘ প্রস্থে ক্ষীণ পরিসর গ্রহণ করে এবং ৪৫ ডিগ্রি বরাবর নীচে নেমে আসে।[২৩৯]

১.৩.৩.১৭ মুসালসাল লিপি (الخط المسلسل)

চিত্র-৪৪: মুসালসাল লিপিতে লিখিত হাদীস

মুসালসাল (مسلسل) অর্থ শৃঙ্খলাবদ্ধ। এটিও এক ধরনের ফিতা লিপি। আব্বাসী যুগের প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার আল-আহওয়াল আল-বারমাকী এ লিপির উদ্ভাবন করেন। এ লিপিতে প্রায় সব হরফ এমনকি و أ د ر ز ইত্যাদি

---

[২৩৮] *তারিখুল খাত্তিল 'আরাবী ওয়া আদাবিহী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯।

[২৩৯] মোহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: যোগাযোগ পাবলিশার্স, অক্টোবর-২০০২), পৃ.৬০।

Dhaka University Institutional Repository

হরফকেও পরপর একটির সাথে আরেকটিকে জড়িয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ লিপিতে লিখিত কোন একটি বাক্যকে দেখে মনে হবে যেন একটি শিকল দ্বারা তাকে জড়ানো হয়েছে।[২৪০]

১.৩.৩.১৮ খাত আস-সুম্বুল (الخط السنبل)

চিত্র-৪৫: আরিফ হিকমতের সুম্বুল লিপির ক্যালিগ্রাফি

সুম্বুল (سنبل) অর্থ প্রতীক বা নমুনা। কোন অফিস, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের লগো বা মনোগ্রামের জন্য মনোনীত বিশেষ ধরনের এক লিপির প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়, যাকে খাত আস-সুম্বুল বলা হয়। এ লিপির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মনোগ্রাম বা লগো তৈরি করা হয়। এটি অনেকটাই তুঘরাশৈলীর মতই।[২৪১]

১.৩.৩.১৯ মুসান্না বা আয়নালী লিপি (الخط المثنى)

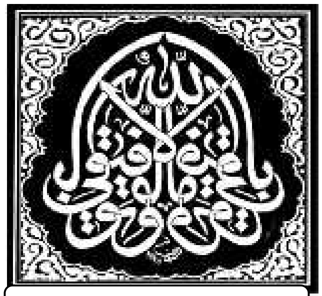

চিত্র-৪৬: মুসান্না লিপির ক্যালিগ্রাফি

মিরর বা দর্পণ লিপিকে মুসান্না (مثنى) বা আয়নালী লিপিশৈলী বলে। এটি মূলত কোন লিপিকে ডান ও বাম উভয় দিক থেকে লেখা হয়। আয়না বা দর্পণের সামনে কোন সোজা লেখা ধরলে যেমন একই বিষয় তার বিপরীতে আরেকটি লেখা উল্টোভাবে দেখা যায়। ঠিক তেমনি এ লিপি সোজা ও উল্টোভাবে দু'দিক থেকেই লিখতে হয়। তাই একে মুসান্না বা আয়নালী লিপিশৈলী বলে। আবার একে মাকুস বা Reflected তথা প্রতিফলিত লিপিও বলা হয়ে থাকে। ইয়াসিন হামিদ সাফাদী বলেন- 'A mirror script during Behari appeared in India during the Fourteenth century' অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী জুড়ে ভারতের বিহারে মুসান্না লিপি বিদ্যমান ছিল।[২৪২]

---

[২৪০] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯।
[২৪১] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১।
[২৪২] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩.৪ উন্মুক্ত ধারা

বর্তমান যুগের অনেক শিল্পীই ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক ধারা অনুসরণ না করে উন্মুক্তভাবে ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করেন। তারা শিল্পের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তথা বেসিক আর্ট, কালার কম্পোজিশন, রিয়েলস্টিক বেজ, পারসপেকটিভ সেন্স, অনুপাত, দর্শন, এবস্ট্রাক্ট ফর্ম, টেক্সচার, কালার কম্বিনেশন, আলোছায়া ও ব্রাশের জড়তাহীন গতি ইত্যাদি অনুসারে স্বাধীনভাবে তাদের ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করেন। এসব ক্যালিগ্রাফি ট্রাডিশনাল ফন্টের অনুসরণে না হলেও শিল্প মানে উত্তীর্ণ। যেমন- শিল্পী সবিহ্-উল আলম (জ. ১৯৪০) এর ‘আল্লাহ’ শিল্পকর্মটি একটি নতুন ধারার কাজ। যা স্কেচ চিত্রকলায় ত্রিমাত্রিক ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। দৃষ্টি বিভ্রমের মাধ্যমে তিনি ত্রি-মাত্রিক (Three dimensional) ক্যালিগ্রাফি চিত্র নির্মাণ করে এক নতুন ধারার প্রচলন করেন। এভাবে বর্তমানে অনেক শিল্পীই আর্টিস্টিক ফর্মে বিভিন্ন ধারায় ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করে চলছেন।

চিত্র-৪৭:সবিহ-উল আলমের ত্রিমাত্রিক ক্যালিগ্রাফি

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১.৪ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি নির্মাণের কর্মকৌশল

১.৪.১ ক্যালিগ্রাফির লিখনপদ্ধতি

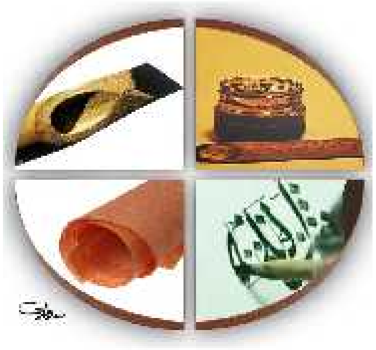

চিত্র-৪৮:ক্যালিগ্রাফির কলম, কালি ও লেখার কৌশল

পৃথিবীতে সর্বমোট প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি ভাষা বিদ্যমান। এসব ভাষার একেকটির লিখনপদ্ধতি অন্যটি থেকে ভিন্নতর। কোনটি ডান দিক থেকে শুরু হয়ে বাম দিকে, আবার কোনটি বাম দিক থেকে ডান দিকে গিয়ে সমাপ্ত হয়। এদের বর্ণগঠন ও আঙ্গিক কাঠামো বিভিন্ন ধরনের। যেমন- আমরা বাংলা ও ইংরেজি ভাষা লিখতে গিয়ে বাম থেকে ডান দিকে লিখে যাই এবং আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষা লিখতে ঠিক তার উল্টো তথা ডান থেকে বাম দিকে লিখে থাকি। আরবী হরফ লেখার জন্য মধ্যমা আঙ্গুলে কলমটি রেখে শাহাদাত ও বৃদ্ধ আঙ্গুলি দিয়ে যথাক্রমে ডান ও উপর থেকে চাপ দিয়ে অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলগুলোকে বিছিয়ে দেই এরপর কলমের মাথাকে ৩৫ থেকে ৪৫ ডিগ্রি বরাবর রেখে ডান থেকে বামে লেখা শুরু করি। আরবী ভাষার বর্ণমালায় ১৮টি স্বতন্ত্র আকৃতি আছে। যা একটি হরফের আগের ও পরের বর্ণমালার সাথে সংযোগের উপর নির্ভর করে।[২৪৩]

১.৪.২ ক্যালিগ্রাফি নির্মাণের কলা-কৌশল

বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো বলেন- ‘Painting is a blind men’s profession. He paints not what he sees, but what he feels, what he tells himself about what he has

[২৪৩] *www.islamicart.com*

Dhaka University Institutional Repository

seen.'[২৪৪] অর্থাৎ চিত্রশিল্প অন্ধ লোকের পেশা, সে যা দেখে তা সে আঁকে না বরং সে যা অনুভব করে এবং যা দেখেছে সে সম্পর্কে সে নিজেকে যা বলে, তা সে আঁকে। ডোনাল্ড জ্যাকসন বলেন- 'যথাযথ ক্যালিগ্রাফি করতে না পারায় ভয় পেও না। কেননা ক্রমাগত এই প্রচেষ্টা তোমার মূল্যবান অভিজ্ঞতারই একটি অংশ। তোমার আত্মাই তোমাকে স্বীকৃতি দেবে, কখন হরফগুলো তোমার হয়ে গেল।'[২৪৫]

শুধু ধারাবাহিকভাবে গদবাঁধা কতগুলো লেখা লেখলেই তা ক্যালিগ্রাফি হয় না। বরং এর কতগুলো নিয়ম-কানুন রয়েছে। মানসম্পন্ন ক্যালিগ্রাফি করতে হলে এসব নিয়ম-কানুন ও কলাকৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক। উমাইয়া শাসনামল থেকেই ব্যাপকভাবে ক্যালিগ্রাফি শিক্ষার শুরু হয়। এটি একটি উস্তাদনির্ভর শিল্প। ফলে যে সকল শিক্ষার্থী ক্যালিগ্রাফি আয়ত্ত্ব করার আগ্রহ বোধ করত তারা উস্তাদ ক্যালিগ্রাফারগণের কাছ থেকে বিশেষ পাঠ গ্রহণ করত। ক্যালিগ্রাফির কলা-কৌশল প্রথমত মুখে মুখে, তারপর হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হতো। এর কলা-কৌশল হচ্ছে রহস্যাবৃত ও ধারাবাহিকতাপূর্ণ। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় ছাড়া এটা আয়ত্ত্ব করা সম্ভব নয়। যতক্ষণ না উস্তাদ মুখে বলছেন এবং অনুশীলন না করাচ্ছেন, ততক্ষণ তা স্বাচ্ছন্দ্যে লেখা সম্ভব হচ্ছে না। তাই হযরত আলী (রা.) বলেন-

تعليم الاستاذ فى الخط مخفى وقوامه فى كثرة المشق ودوامه- অর্থ- ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে, উস্তাদ ক্যালিগ্রাফারের শিক্ষার একটি গোপন বিষয়, যা শিখতে অনবরত অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।[২৪৬] সুতরাং ক্যালিগ্রাফি শিখতে হলে উস্তাদের মুখ থেকে শুনে তারপর হাতে-কলমে চর্চা করতে হয়।

১.৪.৩ কলম বানানোর পন্থা

---

[২৪৪] *ক্যাটালগ: ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং এক্সিবিশন*, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড (ঢাকা: ২০১৪), পৃ.শেষ প্রচ্ছদ।

[২৪৫] *সহজ ও সুন্দর আরবী ক্যালিগ্রাফি, নাসখী লিপি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

[২৪৬] Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, Tr. Franz Rozenthal (London: 1958), vol.2, p.388.

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকাল থেকে ক্যালিগ্রাফি করতে যে ধরনের কলমের ব্যবহার করা হয়েছে আজ তা আর হয় না। বর্তমানে কারখানায় নির্মিত ধাতব নিবের ফাউন্টেন কলম ব্যবহার করা হয়। তারপরও অধিকাংশ ক্যালিগ্রাফাগণই হাতে তৈরি কলমে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। প্রাচীনকালে মূলত নলখাগড়া থেকে তৈরি কলম ব্যবহৃত হত। যা দেখতে বাঁশের চিকন কঞ্চির মত। কলম তৈরির জন্য সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পেত মেসোপটেমিয়ার হিল্লা ও ওয়াসিট অঞ্চলের নলখাগড়া। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নলখাগড়া এ অঞ্চলে উৎপাদিত হত।[২৪৭]

সাধারণ কলম দিয়ে ক্যালিগ্রাফি করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন চেপ্টা নিব বিশিষ্ট কলম। এক্ষেত্রে নলখাগড়ার তৈরি কলম অধিক উপযোগী। বাংলাদেশে বাঁশের কঞ্চি কেটেও এ কলম বানানোর প্রচলন আছে। তবে এ কলম বানানোর ৪টি পন্থা বা নিয়ম[২৪৮] রয়েছে। যেমন-

১. আল-ফাত (الفت) বা সাধারণ নিয়ম
২. আস-সাক্ক (السق) বা মাথা চেরা
৩. আন-নাথ (النت) বা ছাটাই
৪. আল-ক্বাত (القت) বা বিন্দু মাথায় কাটা

চিত্র-৪৯: কঞ্চি কেটে কলম বানানোর কোণাকৃতি

১. আল-ফাত (الفت): আল-ফাত হচ্ছে- প্রারম্ভিক অথবা স্বাক্ষর করার জন্য কিংবা অনুশীলনের জন্য কাটা পদ্ধতি। নলখাগড়ার বাকল যদি শক্ত অথবা গভীর গর্তবিশিষ্ট হয় কিংবা নরম কিন্তু অগভীর বা মধ্যম আকৃতির হয়। তখন এ পদ্ধতিতে কলম কাটা

[২৪৭] ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ওয়াসিট আমল মিসর ও আজানডারান থেকে নলখাগড়া আমদানী করা হত। ইরানের সিরাজে একপ্রকার নলখাগড়া পাওয়া যেত। ভারতীয় উপমহাদেশেও এগুলো প্রচুর পরমাণে জন্মাত। কিছু কিছু লোক একে প্রচুর শ্রম দিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে চাষ করত। আর বাকিটা চাষ হতো সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে। এছাড়া কলম তৈরির বিকল্প হিসেবে পাখির বড় বড় পালকের ব্যবহারের কথাও জানা যায়। (ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান)

[২৪৮] The cutting of the qalam consists of processes, 1. Fath (the initial cutting) 2. Saqq (the spliting) 3. Nath (paring) 4. Qatt (pointing) (P.I.S Mustafizur Rahman, *Islamic Calligraphy in the medieval India*, Bangladesh: University Press Limited, 1979, p.16)

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সুলতান আলীর মতে- আল-ফাত পদ্ধতিতে কাটা বেশি ভাল হয় না। কেননা এ পদ্ধতিতে মাথা বেশি কাটা যায় না।

খ. আস-সাক্ক (السق): আস-সাক্ক হচ্ছে- মাথা চিরে কলম কাটার পদ্ধতি। এটি বেশি ফলদায়ক। সুলতান আলী কলমের মাথাকে মাঝ বরাবর কাটার উপদেশ দিয়েছেন, যেন কিছুতেই তীর্যকভাবে কাটা না হয়। এ পদ্ধতিতে জিলফার মাঝখানে কাটতে হয়।

গ. আন-নাথ (النت): আন-নাথ হচ্ছে- মাথা ছাটাই করে কাটার পদ্ধতি। এটি দু'ধরনের হতে পারে। একটি হচ্ছে পার্শ্ব ছাঁটাই, আরেকটি হচ্ছে মধ্য ছাঁটাই। পার্শ্ব ছাঁটাইতে দু'পাশেই সমভাবে ছাঁটতে হয়। আর মধ্য ছাঁটাইতে খাগের মধ্যাংশে ছাঁটাই করতে হয়।

ঘ. আল-ক্বাত (القت): আল-ক্বাত অর্থ হচ্ছে- সুচালো মাথার নিব। এটি বেশ জটিল পদ্ধতি। কলমকে মীকাতের পিঠে রেখে কাটতে হয়। এক্ষেত্রে মীকাতটি গোলাকার হওয়া বাঞ্চনীয়। সুচালো মাথা কাটার কয়েকটি নিয়ম আছে। যেমন- তীর্যক, মসৃণ ও ঋজু বা ঈষৎ বাঁকা পদ্ধতি।[২৪৯]

চিত্র-৫০: কালিতে লেখার জন্য কঞ্চি নির্মিত ক্যালিগ্রাফি কলম

তীর্যকভাবে কাটার মধ্যে সবচেয়ে ভালপদ্ধতি হচ্ছে- মধ্যমমানের তীর্যক কাটা। এ পদ্ধতিতে কাটা কলমের লেখা হয় নজরকাড়া ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। কোন কোন ক্যালিগ্রাফার একে গোলাকার করতে পছন্দ করতেন। তারা ছুরিটি সরলভাবে ধরতেন এবং কোন পাশেই তারা তীর্যক কাটতেন না। এ পদ্ধতিতে যে কলম তৈরি হয়, তা দিয়ে মোটা, পুষ্ট ও পরিচ্ছন্ন লেখা পাওয়া যায়।[২৫০] কলম কাটার পর এর মাধ্যমে সঠিক নোক্তা দেয়ার অসংখ্যবার চেষ্টা করা হয়। যদি নোক্তাগুলো সঠিক পরিমাপের এবং সদৃশ হয়, তাহলে কলমকে লেখার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

---

[২৪৯] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭।
[২৫০] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে বাওয়াব বলেন, সুঁচালো পদ্ধতিতে কখনও কখনও তীর্যক ও বৃত্তাকার থাকতে পারে। ঋজু পদ্ধতিতে কাটাটা নির্ভর করে কলমের ছাল ও দেহের প্রকৃতির উপর। সামান্য বাঁকা কাটতে হলেও এর ছাল বা দেহের ব্যপারটি বিবেচনায় রাখতে হয়। সুতরাং ক্যালিগ্রাফি কেমন হবে তা অবশ্যই কলম কাটার উপর নির্ভর করে। খুব সুক্ষ্ম ও চিকন লেখার জন্য কলমকে তীর্যকভাবে কাটতে হবে। আর মধ্যম বা অন্য কোন অনুপাতের জন্য এর নিবকে পরিমাপমত কেটে নিতে হবে। যখন কলমকে সঠিক পরিমাপে কাটা হয় এবং লেখার জন্য প্রস্তুত করা হয়, তখন যেন এটা 'মাশরেকীর তলোয়ারের মত গুণ গুণ শব্দ' তুলে।[২৫১]

ক্যালিগ্রাফি করার জন্য কলম তৈরি ও ব্যবহারের পদ্ধতি জানাটা খুবই প্রয়োজন। পাশের ছবি অনুযায়ী কলম তৈরি করে মাথাটাকে এক কোপে ৩৫ থেকে ৪৫ ডিগ্রি বরাবর কাটতে হবে। এরপর চৌকোণা নোক্তা দিয়ে দেখতে হবে কলমটি সঠিক হলো কি না। ক্যালিগ্রাফার আল-দাহহাকের অভ্যাস ছিল- তিনি কলমের নিব কাটার সময় আড়ালে চলে যেতেন। তাই তাঁর নিব কাটার কলা-কৌশল কেউ জানতে পারত না। ইবনে বাওয়াব কলমের নিব কাটার কলা-কৌশল সম্পর্কে বলেছেন- 'Do not beg me to reveal it secret, I am chary of it's concealed secret. The calligrpher, al-Dahhak is said to have the habit of going to a secret place for cutting his qalam, so that nobody could know how he used to cut it.'[২৫২]

১.৪.৪ কালির ব্যবহার প্রণালী

চিত্র-৫১: ক্যালিগ্রাফির জন্য কলমে পরিমিত কালির ব্যবহার

মানসম্মত ক্যালিগ্রাফি শিখতে হলে বা চর্চা করতে হলে কলম বানানোর পদ্ধতির পাশাপাশি কালির ব্যবহার জানা একান্ত আবশ্যক। ক্যালিগ্রাফিতে সাধারণত কালো কালি

...স্তুতকারক ছিলেন। যিনি খলীফাদের জন্য তলোয়ার তৈরি করতেন ...য় গুণ গুণ আওয়াজ হত। (*ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*)

A Grohmann, *From the world of papyri* (Cairo: 1952), p.63.

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার করা হয়। তবে অন্যান্য রংয়ের কালিও ব্যবহার করা যায়। ক্যালিগ্রাফির জন্য চাইনিজ ও ইন্ডিয়ান কালো কালি লেখার জন্য বেশ উপযোগী। কালির সঠিক ব্যবহারের জন্য দোয়াতের ভেতরে এক টুকরো স্পঞ্জ অথবা রেশমী সুতার দলা রেখে দিতে হয়। যাতে করে দোয়াতে কলম চুবানোর সময় কলমে সমপরিমাণ কালি আসে এবং কালির অতিরিক্ত ফোঁটা পড়ে লেখা নষ্ট না হয়। এভাবে সতর্কতার সাথে ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে অত্যন্ত সহজ, সুন্দর ও সাবলীলভাবে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করা সম্ভব।

১.৪.৫ রঙের বিভিন্নতা

ছবি বা ক্যালিগ্রাফি করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রঙ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার এসব রঙ ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাগজ, কাপড়, ক্যানভাস কিংবা নানাবিধ উপকরণের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন-

চিত্র-৫২: রঙের রকমারি ব্যবহার

১. পানি রঙ (Water Color)ঃ হ্যান্ডমেড পেপার, কার্টিজ পেপার কিংবা সাধারণ কাগজে আঁকার জন্য ব্যবহৃত রঙ
২. তেল রঙ (Oil Color)ঃ ক্যানভাস বা মোটা কাপড়, হার্ডবোর্ড ও কাঠে আঁকার জন্য ব্যবহৃত রঙ
৩. পোস্টার রঙ (Poster Color)ঃ কাগজে বিভিন্ন পোস্টার লেখার জন্য ব্যবহৃত রঙ
৪. এক্রিলিক (Acrylic)ঃ কাগজে বা ক্যানভাসে আঁকার জন্য ব্যবহৃত রঙ
৫. বাটিক রঙ (Butique Color)ঃ সুতি বা সিল্ক কাপড়ে আঁকার জন্য ব্যবহৃত রঙ
৬. টেম্পরা (Tempora)ঃ ডিমের ভেতরের সাদা তরল পদার্থের সাথে অক্সাইড রং মিশিয়ে বোর্ডে আকার রঙ
৭. ফ্রেস্কো রঙ (Fresco Color)ঃ দেয়াল চিত্র অঙ্কনে ব্যবহারের রঙ

Dhaka University Institutional Repository

৮. গোয়াস (Goas): কাগজে পানি রঙ দিয়ে তেল রঙের মত কাজ করাই গোয়াস।[২৫৩]

১.৪.৬ রঙের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা

চিত্র-৫৩: বিভিন্ন রঙের কাল্পনিক অভিব্যক্তি

ছবি আঁকা কিংবা ক্যালিগ্রাফি করার ক্ষেত্রে রঙের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ রঙ কোন বস্তুকে সঠিক অবয়বে চিহ্নিত করার মাধ্যম। তাছাড়া রঙের মাধ্যমে মনের ভাবও প্রকাশ করা যায়। কেননা প্রতিটা রঙের অন্তর্নিহিত ব্যাঞ্জনা রয়েছে। এটি ছবির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, যা হৃদয়কে নাড়া দেয়। কারণ হৃদয়ের সাথে রঙের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। কোন ব্যক্তির রঙের পছন্দের সূত্র ধরে তার আচরণ বলে দেওয়া যায়। তাই বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে রঙের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসা করা হয়।

রঙ প্রধানত দুই প্রকার। মৌলিক রঙ ও যৌগিক রঙ। মৌলিক রঙ সরাসরি রঙ। যা কোন রঙের সাথে মিশ্রিত নয়। মৌলিক রঙ মোট তিনটি। যথা- লাল, নীল, হলুদ। এ তিনটি রঙকে প্রাথমিক রঙ বা অবিমিশ্র রঙ বলে। আর যৌগিক রঙ হলো, একাধিক মৌলিক রঙের মিশ্রণের দ্বারা তৈরি রঙ। যেমন- লাল+নীল= বেগুনী, লাল+হলুদ=কমলা ইত্যাদি।[২৫৪]এভাবে মৌলিক তিনটি রঙের আনুপাতিক মিশ্রণে মোট ৭২টি রঙ তৈরি করা যায়। এসব রঙকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- উষ্ণ (Hot color) ও শীতল রঙ (Cold color)।

---

[২৫৩] আমিনুল ইসলাম আমিন, 'সূর্যের আলো থেকে রঙধুন ছিটকে পড়ে', *দৈনিক যুগান্তর*, ১১ নভেম্বর-২০০৫।
[২৫৪] আবদুল বারিক ভূঁইয়া, *শরীফ চারু ও কারুকলা*, (ঢাকা: তানিয়া প্রেস ও পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯), পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

লাল, হলুদ, কমলা ও বাসন্তী হলো উষ্ণ রঙের আওতাভুক্ত এবং সবুজ, নীল, বেগুনী ও ফিরোজা হলো শীতল রঙের আওতাভুক্ত। উষ্ণ রঙ মনকে নাচায় ও চঞ্চল করে তুলে। শীতল রঙ মনকে স্থীর করে। উষ্ণ রংয়ের প্রবণতা সামনে এগিয়ে আসা এবং শীতল রঙের প্রবণতা পিছিয়ে যাওয়া। এর মধ্যে লাল রঙের একটা সম্মুখবর্তিতা আছে। অর্থাৎ সবগুলো রঙ একসাথে রাখলে লাল রঙ বেশি চোখে পড়ে ও সামনের দিকে চলে আসে। লাল রং দেখলে শরীরও গরম হয়ে উঠে। যেমন- আগুন, রক্ত ইত্যাদি।

চিত্র-৫৪: মৌলিক ওযৌগিক রঙের নমূনা

সবুজ রঙ উর্বরতার প্রতীক। গাছের রঙ এবং ফসলের মাঠের রঙ সবুজ। বীজ থেকে নতুন অঙ্কুর ও পাতা গজায়। এসব পাতার রঙ সবুজ। তাই সৃষ্টির প্রতীক সবুজ। সাগরের রঙ নীল, মেঘমুক্ত আকাশের রঙ নীল। এ নীলের মধ্যে প্রশান্তি বিদ্যমান। তাই নদী বা সাগর ও মেঘমুক্ত নীল আকাশের দিকে তাকালে আমরা প্রশান্তি অনুভব করি। কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনটা মুক্ত হয়ে যায়। গাঢ় হলুদ রঙ হলো আবেগের রঙ। তাই বাউলদের পরণের কাপড়ের রঙ হলুদ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরণের বস্ত্রের রঙও গাঢ় হলুদ। এরা বৈবাহিক জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদ ধারণ করে। আবার ভালবাসার রঙ গোলাপী। তাই গোলাপী রঙ মানুষকে কাছে টানে। অবসাদ, বিষণ্নতা ও শোকের রঙ কালো। তবে অন্ধকারের কোন রঙ নেই। তাই অন্ধকার ও মৃত্যুর রঙ কালো।[২৫৫]

বস্তুকে চিহ্নিত করার জন্য, মনের আবেগ প্রকাশ করার জন্য, ক্যালিগ্রাফির অর্থের সাথে সাদৃশ্য রেখে মত প্রকাশ করার জন্য রঙের ব্যবহার করা যেতে পারে। মুঘল আমলে মুসলিম শিল্পীরা সোনালি ও রূপালি রঙ ব্যবহার করতো। ছবি আঁকার জন্য বাজারে বিভিন্ন রঙ পাওয়া যায়। এর মধ্যে হলুদ ও নীল রঙ মিলে সবুজ হয়। সাদা আর লাল রঙ মিশালে হয় গোলাপী। লাল আর নীল রঙ মিশালে হয় খয়েরী। লাল ও নীল রঙ মিলে হয় বেগুনী। হলুদ ও লাল মিলে হয় কমলা রঙ।

[২৫৫] আমিনুল ইসলাম আমিন, ‘সৃষ্টির প্রতীক সবুজ’, *দৈনিক যুগান্তর*, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

সবুজের সাথে হলুদ মিশালে হয় কলাপাতা। নীলের সাথে অল্প লাল মিশালে হয় গাঢ় নীল। হলুদের সাথে হালকা লাল মিশালে হয় গাঢ় হলুদ। লাল, নীল আর হলুদ মিলে হয় কালো রঙ। সূর্যের আলো থেকে রঙধনুর সাতটি রঙ ছিটকে পড়ে। সাদা কোন জিনিসে সাতটি রঙ-ই পাওয়া যায়।

রঙ সম্পর্কে অঁরি মতিস বলেন- 'রঙের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্রের প্রকাশময়তাকে যতটা সম্ভব সফল করা।' শিল্পী দেলাক্রয় বিশ্বাস করেন- 'রঙের রঞ্জনগত আভা সীমাহীন। তা কল্পনাকে সমৃদ্ধ করে, বস্তুকে নির্ণয় করে এবং তাকে অবস্থিতি দান করে। রঙের বিস্তার ও বৈচিত্র সীমাহীন। এতে বিভিন্ন প্রকার সম্ভাব্য মিশ্রণ এবং দীপ্তিগত প্রকাশ বিদ্যমান।'[২৫৬]

১.৪.৭ ক্যালিগ্রাফির পরিপ্রেক্ষিত

চারুশিল্পের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ ও পরিপ্রেক্ষিত (Perspecctive) একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ক্যালিগ্রাফি যেহেতু লিপিগত চারুত্বেই বিশিষ্ট, সেহেতু উপযুক্ত প্রাকরণিক প্রসঙ্গটি গৌণ বিষয়। ফলে বৃহদার্থে ক্যালিগ্রাফি দ্বি-মাত্রিক শিল্পকর্ম হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বিলীনবিন্দুর (Vanishing Point) ধারণাকে কাজে লাগিয়ে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতার সমন্বয়ে ত্রি-মাত্রিক শিল্পকর্মের ঐশ্বর্যে ক্যালিগ্রাফির মর্যাদাবান হয়ে উঠার উদাহরণ বিরলশ্রুত। এবস্ট্রাক্ট আর্টে এর অনুষঙ্গ ক্যালিগ্রাফিকে অনেক শিল্পীই প্রাসঙ্গিক করে নেন। বিশুদ্ধ রঙ, জ্যামিতিক রেখা ও রূপ মিলিয়ে বস্তু নিরপেক্ষ যে শিল্পকলাকে আমরা এবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত শিল্প বলে জানি, ক্যালিগ্রাফিতে তার চর্চার চেয়ে বিলীনবিন্দুর সাথে দূরে-কাছের ও গভীরতার কাল্পনিক সঙ্গতি বজায় রেখে ত্রি-মাত্রিক ক্যালিগ্রাফির নির্মাণ-চিন্তা শিল্পের প্রশ্নে অধিকতর নান্দনিক বলে মনে হয়।[২৫৭]

---

[২৫৬] সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন-২০০৪, পৃ.৪৫-৪৬।

[২৫৭] *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী* (ঢাকা: ২০০০), পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

কোন শিল্পকর্মের আড়ালে বা অন্তরালে শিল্পী কী নির্মাণ করেছেন? ছবি নাকি হরফের মর্ম? এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কোন উত্তর নেই। তবে এতটুকু বলা যায় যে, ক্যালিগ্রাফিতে হরফের আড়ালে মর্ম ফুটিয়ে তোলার যে প্রক্রিয়া, নতুন করে একটি চিত্র নির্মাণ করেও তাতে ক্যালিগ্রাফিকে বসিয়ে দেয়ার যে ধারা, ক্যান্ডিওগ্রাফিতে সে ধারা থাকে না। ক্যান্ডিওগ্রাফিতে বর্ণই হয়ে উঠে চিত্র। পরিপ্রেক্ষিতশূন্য সে ক্যানভাস একই সাথে সকল দর্শক সকল ভাষাভাষীর নিকট হয়ে উঠে অর্থময় ও বোধগম্য। হরফপ্রধান শিল্প হয়েও তাতে মুছে যায় বর্ণবাদী বিভেদ।[২৫৮]

আরবী ‘আলিফ’ হরফটি প্রাচীন আরবে ব্যবহৃত তরবারির সাথে অনেকটাই মিলে যায়। ধারালো, তীক্ষ্ম, ঋজু সেই আলিফ এখনকার ক্যালিগ্রাফারদের চর্চায় এক ও এককত্বের নির্দশক হয়ে উঠেছে একক ও পরম সত্তার উদাহরণ। বাংলায় একসময় ‘ঞ’-র পুটলী লেখা হত অনেকটা কাঠবিড়ালীর আকৃতিতে। বর্ণের মাঝে এভাবে তার গঠন সমকাল ও স্বদেশের অনেক কিছু এবং উপাদান লুকিয়ে থাকে। আধুনিককালে ভাষার মৃত্তিকাজাত ও উপাদানগুলো যদিও হারিয়ে গেছে। তবুও শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় সেই উপাদানগুলো বার বার ফিরে আসে। চীনা ক্যালিগ্রাফাররা একের পর এক বর্ণ সাজিয়ে নির্মাণ করেন তাদের ক্যালিগ্রাফি। প্রতিটি বর্ণে ফুটে উঠে একটি বস্তুর আকৃতি। দর্শক আদৌ এগুলো চেনে কি না, তা তাদের নিকট একেবারেই গৌণ। বর্ণের আকারই দর্শককে নিয়ে যায় ক্যালিগ্রাফারের বার্তায়। পৌঁছে দেয় অলক্ষের আহবানের কাছে। চীনাদের ক্যালিগ্রাফির ক্যানভাসে এ কারণেই কি ব্যাকগ্রাউণ্ড অনুপস্থিত?

১.৪.৮ ক্যালিগ্রাফির প্রাচীন পত্রসমূহ

ইসলাম ও ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের মাঝে লেখার জন্য সুনির্দিষ্ট তেমন কোন বস্তু বা পত্রের[২৫৯] ব্যবহার ছিল না। বরং তারা লেখার জন্য তাদের প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও সহজলভ্যতার ভিত্তিতে

---

[২৫৮] কাউসার খালেদ, *ক্যালিগ্রাফি+ইডিওগ্রাফ=ক্যান্ডিওগ্রাফি*, *শৈল্পিক* ৬৯, (ঢাকা: ২০০৬), পৃ.৪৪।

[২৫৯] Paper of different qualities such as, silk-paper, note-paper and weak-paper, smooth and ribbed paper, white and colored paper etc. were in use in the Muslim world. Paper was made in or cut

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন বস্তু নির্বাচন করত। এক্ষেত্রে তারা তাদের অবস্থাভেদে যে সকল বস্তু বা পত্র ব্যবহার করত তা নিম্নরূপ:

১. জিলদ (الجلد) বা পশুচর্ম: এটি তিন ধরনের ছিল। যেমন-

ক. আর-রাক্ব (الرق) বা Parchment অর্থাৎ- মেষ, ছাগল, বাছুর ও গজলা হরিণের চামড়া ইত্যাদি। এটি ইসলাম-পূর্ব যুগে ব্যবহৃত হত। আরবদের পূর্বে প্রাচীন ব্যবিলনীয়দের মাঝে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মিসরীয়দের মাঝে প্রচলন ছিল।

খ. আল-আদীম (الأديم) বা Leather অর্থাৎ- লাল কিংবা পাকা চামড়া। এটি জাহিলী যুগ ও রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় ব্যবহৃত হত।

খ. আল-কাদ্বীম (القضيم) বা সাদা চামড়া। এটিও রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় কুরআনের আয়াত লেখার জন্য ব্যবহৃত হত।

২. আল-ক্বামাশ (القماش) বা বস্ত্র: এটি রেশম, কার্পাস বা লিলেনের তৈরি। উমাইয়া যুগ থেকে দামিশ্‌কে এর ব্যবহার দেখা যায়। এটি অতীব মূল্যবান হওয়ায় শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখার জন্য এটি ব্যবহৃত হত। এটিকে আরবীতে মাহরাকও (مهرق) বলা হয়।

৩. আল-হিজারাহ ওয়াল লিখাফ (الحجارة و اللخاف) বা বড় ও হালকা সাদা পাথর: পাথরের উপর লিখিত প্রাপ্ত সুপ্রাচীন শিলালিপি। যেমন- উম্মুল জিমাল, নাম্মারা ও যাবদ ইত্যাদি। কবরগাত্রেও পাথরের উপর লেখা হত। তাছাড়া রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায়ও কুরআনের আয়াত লেখার সাদা হালকা পাথর ব্যবহৃত হত।

৪. আল-‘ইজাম (العظام) বা হাঁড়: আল-কুরআনের কোন কোন আয়াত হাঁড়ের উপরে লেখা হত। তার মধ্যে অংসফলকাস্থি (Shoulder blade) ও পাজরের হাঁড় সর্বাধিক ব্যবহৃত হত। লেখার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে এর ব্যবহার আব্বাসী যুগের প্রথমদিক তথা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত চালু ছিল।

---

into different sizes. Generally it had four sizes, namely, full (jami), half (ansaf), quarto (arba) and octavo (athman). (Qazi Akhtar Ahmad Mian, Studies: Islamic and Oriental, Lahore: 1945, p.103

Dhaka University Institutional Repository

৫. আল-খোশাব (الخشب) বা কাষ্ঠখণ্ড: কাষ্ঠখণ্ড বলতে এখানে উটের কুঁজের পরিমাপের ছোট জিন উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া লেখার পত্র হিসেবে হাওদার ব্যবহারও দেখা যায়। আরবদের মধ্যে কাঠের শ্লেটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যা বর্তমান অবধি চলে আসছে।

৬. আল-'উসাব (العسب) বা খেজুর গাছের শুষ্ক ডালপালা: আরবরা লেখার পত্র হিসেবে খেজুর গাছের শুষ্ক ডালপালা ও তার কাণ্ডের সাথে যুক্ত শক্ত ও সুপরিসর শক্তমূলকেও ব্যবহার করত। রাসূল (সা.) এর যুগে কুরআনের আয়াত খেজুর গাছের শুষ্ক ডালপালা ও তার কাণ্ডের সাথে যুক্ত শক্ত ও সুপরিসর শক্ত মূলসমূহেও লিপিবদ্ধ করা হত।

৭. আল-ফাখ্‌খার (الفخار) বা পোড়ামাটি: আরবরা অনেক সময় লেখার জন্য পোড়ামাটি ও মৃৎপাত্রেও ব্যবহার করত।

৮. আল-মা'আদিন (المعادن) বা ধাতবদ্রব্য: আরবরা অনেক সময় লেখার জন্য লোহা, ব্রোঞ্জ, পিতল, স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি দ্বারা তৈরি যন্ত্রপাতি বিশেষত তরবারি, গহনা ও পাত্রসমূহে ব্যবহার করত।

৯. আল-বারদী (البردي) বা প্যাপিরাস: এটি শরকাণ্ড বা বরুই জাতীয় তৃণ। এর ডাঁটা ত্রিকোণ বা ত্রিধারা হয়ে থাকে। এর উচ্চতা সাধারণত চার হাত। এটিকে লেখার জন্য উপযুক্ত করে তোলার জন্য প্রথমে ৪.৫ থেকে ৯.৫ ইঞ্চি পর্যন্ত টুকরা করে ডাঁটা থেকে চওড়া পাত বের করে আঠালো দ্রব্যের মাধ্যমে উক্ত পাতের একটির সাথে আরেকটিকে সেঁটে দেয়া হত। এরপর পত্রটি শুকিয়ে নিয়ে হাতির দাঁত বা শঙ্খের সাথে ঘষে মসৃন ও সমান করে এর উপর লেখা হত। এভাবে তৈরিকৃত পত্রকে ইউরোপীয়রা প্যাপিরাস বলত। এ পত্রের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ, চিঠি ও প্রয়োজনীয় দলীলও লেখা হত।

১০. আল-ওয়ারাক (الورق) বা কাগজ: কাগজের প্রচলন, মূল্য ও ধারণক্ষমতা ইত্যাদির দিক থেকে লেখার সকল পত্রকে অতিক্রম করে গেছে। তাই বিভিন্ন দেশ ও শহর বিশেষত মধ্যযুগে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম দেশগুলো তা তৈরি করতে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। পাশাপাশি মুসলিম শাসকবর্গও এক্ষেত্রে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন।[২৬০]

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন এলাকায় তালপাতায় ক্যালিগ্রাফি করা হতো। প্রায় ২ হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে এ হস্তলিপি বিদ্যমান ছিল। এমনকি কাগজের প্রচলনের পরও প্রায় ৪০০ বছর পর্যন্ত কাগজের সাথে সাথে তালপাতাকে ক্যালিগ্রাফির অন্যতম উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তখন পাতার উভয় পার্শ্বই ক্যালিগ্রাফির জন্য ব্যবহৃত হতো। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ শিল্পের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত। তালপাতা ছিল ক্যালিগ্রাফির একটি চমৎকার জমিন, যা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা ব্যবহার করতেন। তাছাড়া পোড়ামাটি ও তামাও ছিল প্রাচীন ভারতের ক্যালিগ্রাফির জনপ্রিয় উপকরণ। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের উত্তরাঞ্চলে বার্চ গাছের ছালকে ক্যালিগ্রাফির জমিন হিসেবে ব্যবহার করা হতো।[২৬১]

---

[২৬০] *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৯-৩০২।

[২৬১] আসাদ সায়েম, 'দক্ষিণ এশিয়া, ভারতবর্ষ এবং বাংলায় ক্যালিগ্রাফির বিকাশ', *দৈনিক আমার দেশ*, ২৯ জুন-২০১২, পৃ.৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফার ও ক্যালিগ্রাফি

প্রথম পরিচ্ছেদ	খ্যাতনামা ইসলামী ক্যালিগ্রাফারদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যবহারভিত্তিক অনুশীলন
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহুমাত্রিক ব্যবহার
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিষয়ভিত্তিক অনুশীলন
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক অনুশীলন
নবম পরিচ্ছেদ	বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অনুশীলন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. বাংলাদেশের সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফার ও ক্যালিগ্রাফি

বিগত কয়েক শতাব্দীর মুসলিম শাসন ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ফারসীর প্রচলন উপমহাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চার দিগন্ত উন্মোচন করে। সম্মানজনক ও জনপ্রিয় শিল্প হিসেবে ক্যালিগ্রাফির পূর্ণ বিকাশ হয় মুঘল আমলে। বিস্তৃত হয় বাংলাদেশের জনপদেও। ব্রিটিশ শাসনামলের গোঁড়ার দিকেও ঢাকায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা ছিল চোখে পড়ার মত। দ্বাদশ শতাব্দীর সুলতানী আমলে বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির[১] আগমন ঘটে। সে সময়ের স্বাধীন সুলতানগণ এ বাংলা মুল্লুকের রাজনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। তারা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে ইসলামী শিল্পকলার প্রধান উপাদান ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে এ সময় ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়। তাই প্রাচীন স্থাপত্যের গায়ে, মসজিদে, মাজারে, মিহরাবে উন্নত ক্যালিগ্রাফি চোখে পড়ে। মসজিদের শহর ঢাকাসহ সারাদেশে বড় বড় মিহরাবের পার্শ্বদেশে, প্রবেশদ্বারের বাহিরে ও ভেতরে, গম্বুজের গায়ে কালিমা, কুরআনের আয়াত, হাদীসের উদ্বৃতি ও বিভিন্ন দু‘আর ক্যালিগ্রাফি দেখা যায়। অমুসলিম শাসন ও ফারসী ভাষা পরিত্যক্ত হওয়ায় এ শিল্পটি এতদঞ্চলে খুব বেশি এগুতে পারেনি। তবে দীর্ঘ স্থবিরতা কাটিয়ে গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশে আবারও এর গতিময় যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একক ও যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, বিভিন্ন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ও কার্যক্রম পরিচালনা, ক্যালেন্ডার, কার্ড,

---

[১] Calligraphy occupies, however, a unique position not only because it is one of the most precious traditions of Islamic art but also because in Bengal it represents a combination of two arts, those of writting and stone-carving, for there the existing examples of calligraphy are confined almost exclusively to inscriptions carved on stone and do decorative religius texts inscribes on walls of mosques. (Muhammad Mohor Ali, History of the Muslims of Bengal, vol. IB, Islamic Foundation, Dhaka, 2003, p.877).

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোতে ক্যালিগ্রাফির বহুল ব্যবহার দেখে প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশের পুনরুজ্জীবিত এ শিল্পটিকে শিল্পানুরাগী মানুষ আগ্রহ ভরে গ্রহণ করেছে।[২]

স্বাধীনতার পূর্বে এতদঞ্চলে যে সকল ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয় তার সিংহভাগই মসজিদকে কেন্দ্র করেই। এগুলোর কিছু পাথরখোদাই, আর কিছু মসজিদের দেয়ালগাত্রে সম্পন্ন হয়। পাথরে খোদাই করা ক্যালিগ্রাফি শিল্পের কিছু নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রাচীন বাংলায় প্রাপ্ত ক্যালিগ্রাফির সিংহভাগই আরবী হরফে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় নির্মিত কিছু ক্যালিগ্রাফির নিদর্শনও পাওয়া যায়। এ সকল ক্যালিগ্রাফি সাধারণত কুফী, সুলুস, নাসখী, তুঘরা ও বিহারী ইত্যাদি লিপিতে সম্পন্ন করা।[৩] বাংলাদেশে মুসলিম আগমন থেকেই এদেশে একটি নতুন ধর্মবিশ্বাসের সূচনা ঘটে। যেখানে অজস্র দেব-দেবীর পূজার্চনা ছিল। সেখানে নিরাকার আল্লাহর উপর বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এ পরিবর্তনটি প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্যে কোন প্রভাব না পড়লেও শিল্পকর্মে ও স্থাপত্যকর্মে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পাশাপাশি মসজিদের মত নতুন ধরনের স্থাপত্যকর্ম এ দেশে আসে। কিছুকাল পরে মসজিদগাত্র অলঙ্করণের জন্য ক্যালিগ্রাফি শিল্পেরও আবির্ভাব ঘটে।[৪]

বর্তমান বিশ্বে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশ তাতে মোক্ষম ভূমিকা রাখতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন ক্যালিগ্রাফার ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে। মাত্র কয়েক বছরের সাধনায় এদেশের ক্যালিগ্রাফি যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তার বিশ্লেষণ ভিন্নভাবে বলার অবকাশ রয়েছে।[৫] বর্তমানে ক্যালিগ্রাফিতে ইরানের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। অন্য ও অনন্য দৃষ্টি নিয়ে শিল্পী আরিফুর রহমান

---

[২] আরিফুর রহমান, 'আরবী ক্যালিগ্রাফির কলা-কৌশল', *ক্যাটালগ: আরিফুর রহমানের ৫ম একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী* (ঢাকা: ২০০২), পৃ.৫।

[৩] *ক্যাটালগ: ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০২ (ঢাকা: সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র), পৃ.১।

[৪] *ক্যাটালগ: বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৬, পৃ.৩।

[৫] ত্রৈমাসিক *ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি, ২০০৬), ব.৩, স.১, পৃ.২৪।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি চিত্র এঁকেছেন যার মধ্যে শিরোনাম ‘আলিফ বিন্যাস’ অন্যতম। এদেশে বিষয়ভিত্তিক ক্যালিগ্রাফিকর্ম হিসেবে এখনও পর্যন্ত শিল্পী মুর্তজা বশীরের ‘জ্যোতি’ ও ‘কালিমা তাইয়িবা’ এবং শিল্পী আরিফুর রহমানের ‘আলিফ বিন্যাস’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৬]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে সত্তর দশককাল পর্যন্ত অনেক শিল্পীর চেতনায় ধর্মীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। ইচ্ছা ও আগ্রহের কারণে অনেকেরই প্রবেশ ঘটেছে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নন্দিত অঙ্গনে। ধর্মীয় বিশ্বাসের জাদুকরী টানে ছুটে এসেছেন শিল্পীরা। এঁকেছেন মনোমুগ্ধকর ইসলামী ক্যালিগ্রাফি। গেয়েছেন শিল্প ও চেতনাদীপ্ত ইসলামী আদর্শের জয়গান। যাদের মাঝে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, শিল্পী রশিদ চৌধুরী, শিল্পী মুর্তজা বশীর ও শিল্পী সবিহ-উল আলমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরে ধীরে ধীরে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রকাশ ঘটতে থাকে। প্রতিষ্ঠান থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহে এটি একটি পরিচিত বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। ফলে এটি জনপ্রিয় ও মানসম্পন্ন অবস্থানে এসে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিগত তিন দশকে ক্যালিগ্রাফির যে চর্চাগত বিভূতি, একে আমাদের শিল্পের জন্য বিশেষ সময় হিসেবে আখ্যা দেয়া যেতে পারে। এ সময়ে আমাদের ক্যালিগ্রাফির রূপ অনেক উন্নত হয়েছে। ক্যানভাসে এসেছে অনেক নান্দনিকতা, যুক্ত হয়েছে অনেক পালক।

বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বিভিন্ন মুসলিম দেশের মতো ক্যালিগ্রাফি চিত্রকর্ম তেমন প্রাধান্য না পেলেও ট্রাডিশনাল এবং আধুনিক চিত্রকর্মের ধারায় বাংলাদেশের শিল্পীরা ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা শুরু করেন। তখন থেকে গত তিন দশকে এ শিল্পটি একটি মানসম্মত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান থেকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহে এটি

---

[৬] ত্রৈমাসিক *ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১।

Dhaka University Institutional Repository

একটি পরিচিত বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি জনপ্রিয়তা ও মানসম্পন্ন অবস্থানে উপনীত হওয়ার জন্য যে সকল ক্যালিগ্রাফার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, প্রদর্শনী, গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় ভূমিকা রেখেছেন নিম্নে তা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২.১ খ্যাতনামা ইসলামী ক্যালিগ্রাফারদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

২.১.১ শিল্পী মুর্তজা বশীর (জ. ১৯৩২ খ্রি.)

শিল্পী মুর্তজা বশীর বাংলাদেশের শিল্পান্দোলনে একটি অবিসংবাদিত নাম। আধুনিক শিল্প আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। সময়ের চেয়েও দীর্ঘ ও শক্তিমান এক ঋজুতা ধারণ করেন তিনি। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে অদ্যাবধি তাঁর নানামাত্রিক সৃজনে যে বৈচিত্র্য, তা তাকে স্বাতন্ত্রে সমুজ্জ্বল করেছে। শক্তিশালী ড্রইং, রঙের সুমিত ব্যবহার এবং সমাজ চেতনায় উদ্দীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সৃজন বৈভবে প্রাণময় হয়ে উঠে। দীর্ঘদিনের শিল্প সাধনা ও চর্চার মধ্য দিয়ে এ দেশের চিত্রকলার প্রয়াসকে মনীষা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। তাছাড়া তাঁর কবিতা চর্চা ও কথাসাহিত্যের ভুবনে বিচরণ, মুদ্রা সংগ্রহ এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যে পোড়ামাটির কাজ নিয়ে যে গবেষণা, তা নিশ্চিতই আমাদের ঐতিহ্যিক সাংস্কৃতিক প্রবাহে নবমাত্রা দান করছে।[৭] তাঁর প্রকৃত নাম আবুল খয়র মুর্তজা

চিত্র-৫৫: শিল্পী মুর্তজা বশীরের ক্যালিগ্রাফি 'কালিমা তাইয়িবা'

[৭] 'মুর্তজা বশীর পেলেন হামিদুর রহমান পুরস্কার', *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ২৯ আগস্ট-২০১৫, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

বশীরুল্লাহ। তিনি দেশের প্রথিতযশা, প্রবীন ও শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার। দেশের প্রথম সারির ক্ষণজন্মা শিল্পীদের মধ্যে তাঁর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও সৃজনশীলতা এক অপ্রতিদ্বন্ধী স্থান দখল করে আছে। তিনি বিমূর্ত চিত্রকর্মে যেমন সিদ্ধহস্ত, তেমনি ফিগারেটিভ শিল্পকলায় তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, এস. এম সুলতান, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন ও আনোয়ারুল হকের উত্তরসুরীদের মাঝে তাঁর অবস্থান শীর্ষে।

মুর্তজা বশীর ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ঢাকার রমনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। মাতার নাম মরগুবা খাতুন। ছোটকাল থেকেই তিনি শিল্পচর্চায় আগ্রহী ছিলেন না। তবে পিতার গ্রন্থাগারে প্রবাসী, বঙ্গশ্রী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা ও মডার্ণ রিভিউ ইত্যাদি মাসিক পত্রিকা এবং Encyclopedia Britanica'য় ছাপানো ছবি আগ্রহ ভরে দেখতেন এবং আনন্দ পেতেন। তাই তিনি এ বিষয়ে একাডেমিক অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস-এ ভর্তি হয়ে ১৯৫৪ সালে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। অতপর সে বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোশ মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত টিচার্স ট্রেনিং সার্টিফিকেট কোর্স (আর্টস এপ্রিসিয়েশন) সম্পন্ন করেন। ১৯৫৬-৫৮ সাল পর্যন্ত ফ্লোরেন্সে একাডোমিয়া ডেলে বেলে আর্টিতে পেইন্টিং ও ফ্রেসকোতে অধ্যয়ন করেন। তারপর ১৯৭১-৭৩ সালে এচিং-এ প্যারিসের ন্যাশনাল সুপিরিয়র ডেস বিউয়েক্স-আর্টস থেকে মোজাইকে এবং একাডেমি গোয়েৎস থেকে এচিং-এ শিক্ষাগ্রহণ করেন।[৮] তিনি একাধারে কবি, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তিনি 'মুদ্রা ও শিলালিপির আলোকে বাংলার হাবশী সুলতান ও তৎকালীন সমাজ', 'মুর্তজা বশীরঃ মূর্ত ও বিমূর্ত' এবং কয়েকটি উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ লিখেন। তিনি ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করে দীর্ঘ ২৫ বছর অধ্যাপনা শেষে ১৯৯৮ সালে

---

[৮] হাসনাত আবদুল হাই, *মুর্তজা বশীর*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (ঢাকাঃ জুন-২০০৪) পৃ.৩ ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা।[৯]

মুর্তজা বশীর তাঁর বর্ণাঢ্য শিল্পীজীবনে দেশে বিদেশে অনেকগুলো একক ও যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে যেমন ক্যালিগ্রাফি চর্চায় অবদান রেখেছেন তেমনি তাঁর সৃজনশীল শিল্পপ্রতিভাকে রঙ-তুলিতে ফুটিয়ে তুলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে ফ্লোরেন্স, ১৯৫৯ সালে ঢাকা ও করাচী, ১৯৬০-৬১ সালে লাহোর, ১৯৬২ সালে লাহোর ও রাওয়াল পিন্ডি, ১৯৬৩ সালে করাচী ও রাওয়াল পিন্ডি, ১৯৬৭ সালে ঢাকা, লাহোর, রাওয়াল পিন্ডি, ১৯৬৮ সালে ঢাকা, ১৯৭০ সালে করাচীসহ ১৯৭৬, ৭৯, ৮৪, ৯৩, ৯৯ ও ২০০০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে আমেরিকার শিকাগোতে ‘ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার’, ১৯৬২ সালে লন্ডনের কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউটে ‘কমনওয়েলথ আর্ট টুডে’, একই বছর তিউনিসিয়ায় ‘ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অব পেইন্টিং’, ১৯৬৫ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ‘কমন ওয়েলথ আর্ট ফেস্টিভ্যাল, ১৯৬৬ সালে ইরানের তেহরানে ‘পঞ্চম তেহরান (আঞ্চলিক) বাইনেল’, ১৯৭২ সালে ফ্রান্সে ‘ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অব আর্টস’, একই বছরে ফ্রান্সে ‘নবম বাইনেল অব মেনটন’, ১৯৭৮ সালে ভারতের নয়াদিল্লিতে ‘চতুর্থ টাইনাল ইন্ডিয়া’, ১৯৭৯ সালে ব্রাজিলে ছাউ-পাউলো ইন্টারন্যাশনাল বাইনেল, ১৯৮০ সালে ‘কন্টেম্পোরারি এশিয়ান আর্ট শো’, এশিয়ান আর্ট এক্সিবিশন পার্ট-২ ও একই বছরে ১৯৮০ সালে জাপানের ফুকুয়াকা সিটি ১৯৮১ সালে হংকংয়ে ‘ষষ্ঠ ফেস্টিভ্যাল অব এশিয়ান আর্ট’, ১৯৮৬ সালে নয়াদিল্লিতে ‘ট্রাইএনুয়েল ইন্ডিয়া’, ১৯৯৮ সালে মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরে ‘কমনওয়েলথ অব আর্ট’, এবং ১৯৮১, ৮৩ ও ৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘এশিয়ান আর্ট বাইনেল’-এ অংশগ্রহণ করেন।

[৯] Murtaja Baseer, *The Daily Star*, 5 February-2016.

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী আমলের শিলালিপি তুঘরা লিপি তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে এর নভেম্বরে 'কালিমা তাইয়িবা' নামে তাঁর সম্পূর্ণ ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রদর্শনী শিল্পকলা একাডেমির গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। রঙ ও হরফের আশ্চর্য সম্মিলনে এ প্রদর্শনী ভাস্বর হয়ে উঠে। এছাড়াও তিনি ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০২ সালে মাহে রমজান উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তাঁর একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে তেল রঙে করা ৩৭টি ক্যালিগ্রাফিকর্ম প্রদর্শনী করে তাক লাগিয়ে দেন। যা ছিল রেখা ও রঙের মহামিলন। যাতে একক বা যুক্ত আরবী হরফগুলো প্রাধান্য পায়। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর শিল্পোত্তীর্ণ এবস্ট্রাকশনের যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তা বর্ণনাতীত।[১০]

১৯৮০ সালে শিল্পচর্চায় তাঁর ৩০ বছর উপলক্ষে তাঁর বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফিকর্ম শিল্পকলা একাডেমিতে প্রদর্শিত হয়। তিনি ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী আমিরুজ্জামান ভূঁইয়ার বাসায় ৭X১২ ফুট মাপের সিরামিক্স, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিলেট শাখায় ২১X৪২ ফুট সাইজের সিরামিক মোজাইক, ১৯৭৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩X৩২ ফুট সাইজের টেরাকোটা মোজাইক 'অক্ষয়বট', ১৯৭২ সালে সোনালী ব্যাংকের ৬X৮ সাইজের এক্রিলিকে 'মাই ক্যান্ট্রি', ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন স্ট্যাট ব্যাংক অব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকে ৭X১২ ফুট সাইজের তৈলচিত্র 'ইভালুয়েশন অব মানি', ১৯৬৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকে ৪X৩২ ফুট সাইজের তৈলশিল্প 'দি সিড' এবং ১৯৬৪ সালে অগ্রণী ব্যাংকে ৫X৭ ফুট সাইজের 'দি ট্রি' নামক বিখ্যাত শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। আশির দশকের শেষভাগে এসে তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতানদের উপর গবেষণা শুরু করেন। মুর্তজা বশীর তাঁর অসামান্য শিল্পচর্চার জন্য অনেক পুরস্কার বা এ্যাওয়ার্ডও লাভ করেন। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক, ১৯৭২ সালে চতুর্থ

[১০] *আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১।

Dhaka University Institutional Repository

‘ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অব আর্ট এ্যাওয়ার্ড’ এবং একই বছর বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমির ‘একাডেমি এ্যাওয়ার্ড’ লাভ করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে ‘বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পদক’, ১৯৮০ সালে ‘একুশে পদক’ এবং ২০১৫ সালে ‘হামিদুর রহমান পুরস্কার’, ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি সম্মানসূচক ফেলোশীপ, ২০১৮ সালে গীতাঞ্জলি সম্মাননা এবং ২০১৯ সালে ‘স্বাধীনতা পদক’ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ‘স্টার লাইফ টাইম-২০১৬’ লাভ করেন।[১১]

২০০২ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর তিনটি মূল্যবান ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। তিনি একটি শিল্পকর্মে আলিফ-লাম-মীম কুরআনের এ্যাবস্ট্রাক্ট আয়াতকে নির্বস্তুক পেইন্টিং-এ এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তা শিল্পবোদ্ধাদের নতুন করে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে ক্যানভাসে অঙ্কিত তেলরঙ মাধ্যমে কালিমা তাইয়িবার উপস্থাপন ছিল যেন রঙ ও আঁধারে অস্তমিত বর্ণমালা। যা রহস্যময়তার মোহাচ্ছন্ন নান্দনিকতায় চৈতন্য সৃষ্টি করে। তাঁর রঙিন আলো আঁধারের চিত্রপটে স্বতস্ফূর্ত অথচ মাধুর্যমণ্ডিত শিল্পটি বেঙ্গল তুঘরায় নির্মিত। যাতে ছিল তুলির আঁচড়ে ধর্মের উপলব্ধি। কালিমা তাইয়্যিবাকে ১২+১২টি অক্ষরে দু’ভাগে বিভক্ত করে রঙ ও তুলির জাদুময়ী স্পর্শে এক অবিশ্বাস্য শিল্পজগত সৃষ্টি করেন। এ উপলক্ষে প্রকাশিত একটি পুস্তিকার ভূমিকায় এম. হারুনুর রশীদ বলেন-‘Murtajas Brush has lavished all its love on the sacred letters of the kalema.’[১২]

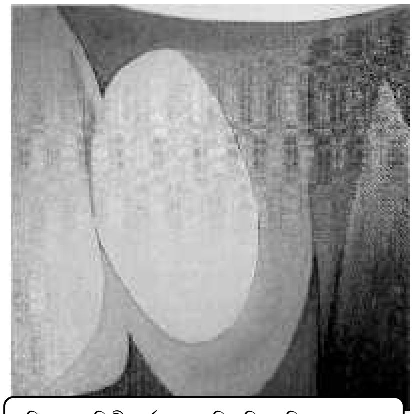

চিত্র-৫৬: শিল্পী মুর্তজার ক্যালিগ্রাফি আলিফ-লাম-রা

[১১] *ক্যালিগ্রাফ আর্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫।

[১২] *Catalogue: The Kalima Tayeba, Recent Paintings by Murtaja Baseer*, (Dhaka: Bangladesh Shilpakala Academy, 2002), p.5.

Dhaka University Institutional Repository

২.১.২ শিল্পী আবু তাহের (জ. ১৯৩৬ খ্রি.)

শিল্পী আবু তাহের বাংলাদেশের প্রবীণতম ও খ্যাতনামা শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফার। তিনি ১৯৩৬ সালে কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে ১৯৬৩ সালে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি একজন এবস্ট্রাক্ট শিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বিমূর্তধারায় ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করে থাকেন। লেটারিজমের উপর তাঁর একটি শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছে। রঙ ও রেখার ভারসাম্য ও লালিত্যে তাঁর বিমূর্তধারার ক্যালিগ্রাফিগুলোতে তিনি প্রাণের সঞ্চার করেছেন। তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পল ক্লীর মত হরফ এবং শব্দগুলোকে এলোমেলোভাবে সাজিয়ে একটি গোলাকার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন।[১৩] তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর অন্যতম উপদেষ্টা। তাছাড়া তিনি শিল্পের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে রাজধানী ঢাকায় 'ঢাকা আর্ট সার্কেল' নামক একটি শিল্পচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। শিল্পচর্চায় তিনি বিমূর্ত প্রকাশবাদী। তাই তিনি বিমূর্ততার বিমুগ্ধতায় আরবী হরফগুলো বিন্যস্ত করে থাকেন।

চিত্র-৫৭: শিল্পী আবু তাহেরের বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি

শিল্পী আবু তাহের দেশে ও বিদেশে একক ও যৌথ অনেকগুলো প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১০টি একক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত প্রদর্শনীসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডন, তেহরান, বার্লিন, বার্ন, দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা, ফুকুয়াকা, কুয়ালালামপুর, শিমলা, করাচী,

[১৩] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামাবাদ, মস্কো, টোকিও, কোপেন হেগেন, ঢাকার সাজু আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত বার্ষিক প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ৫০তম বার্ষিকী, ঢাকা আর্ট সার্কেলে আয়োজিত পরপর সাতটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'অল এশিয়ান বাইনেল'-এর ৩য় ও ৮ম ইন্টারন্যাশনাল 'আর্টিস্ট ক্যাম্প ইন শিমলা' (১৯৮৯), ২০০২ সালে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং একই বছরে চট্টগ্রামের 'কাব্যকলা' আয়োজিত ২৫টি দেশের শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত আর্টিস্ট ক্যাম্পেও অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

তাছাড়া সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ১৯৯৮, ০২, ০৩, ০৪, ০৫ ও ০৬ সালে যথাক্রমে ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর সরব অংশগ্রহণ ছিল। ২০০২ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর দু'টি ক্যালিগ্রাফিই বিমূর্ত ঢঙে সম্পন্ন করা হয়েছে। তেল রঙে করা শিল্পকর্ম দু'টি ক্যালিগ্রাফির অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে। ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তিনি যে লিপিশিল্প প্রদর্শন করেন তাতে কুফী রীতিতে অঙ্কিত 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মদ' শব্দটি বেশি প্রাধান্য পায়। তেল রঙের এ শিল্পকর্মটিতে সৃজনশীলতা এবং প্রেক্ষিত দেখা যায়। কুফীর সাথে নাসখের সংমিশ্রণ এক আধ্যাত্মিক মোহজালের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে তিনি ঢাকার দক্ষিণ কাফরুলে শৈবাল নামক এডফার্মে কর্মরত আছেন এবং নীরবে-নিভৃতে শিল্পচর্চা করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের জন্য ১৯৭৪ সালে 'শিল্পকলা পুরস্কার', ১৯৯৪ সালে 'অনারেবল এ্যাওয়ার্ড' এবং ১৯৯০ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন।[১৪]

২.১.৩ শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী (১৯৩৭-২০০৪ খ্রি.)

বাংলাদেশের চারুশিল্প পরিমন্ডলে শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী অত্যন্ত পরিচিত নাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ মিয়া।

---

[১৪] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ.৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাতার নাম মোসাম্মদ সায়রা খাতুন। ১৯৩৭ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের লালনগর শেখেরহাটে জন্মগ্রহণকারেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৫৮ সালে ড্রইং এন্ড পেইন্টিং-এ মাস্টার্স, ১৯৬৯ সালে কমনওয়েলথ-এর বৃত্তির আওতায় পেইন্টিং-এর উপর ব্রেটন কলেজ অব এডুকেশন ইউকে থেকে এবং বারনসলী কলেজ অব ইউকে থেকে সিরামিক্সে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৬৯ সালে বৃত্তি নিয়ে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার উপর কাজ শুরু করলে তাঁর ছবিতেও নির্বস্তুতা আসে। তবে ৭০ দশকের মাঝামাঝিতে তাঁর ছবিতে পুরো বিমূর্ততা জুড়ে বসে।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল, ঢাকা, ১৯৬৯ সালে ব্রেটন হলে ও স্যালফর্ড মিউজিয়াম এন্ড আর্ট গ্যালারিতে একক প্রদর্শনীর অয়োজন করেন। ঢাকার সাজু আর্ট গ্যালারির সব প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিউটের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী, ১৯৯৫ সাল থেকে ঢাকা আর্ট সার্কেল আয়োজিত ৭টি যৌথ প্রদর্শনী, স্বাধীনতা উত্তর জাতীয় পর্যায়ে সকল প্রদর্শনী, ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান দ্বি-বার্ষিক প্রদর্শনী, জাপানের ‘এক্সপো-১৯৭০’ হংকং, ১৯৮১ সালে ‘কনটেম্পোরারি আর্ট অব বাংলাদেশ’, ১৯৭৯ সালে তিন সদস্যের সাংস্কৃতিক দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে জিডিআর ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত শিক্ষা সফরে ইউকে ভ্রমণ করেন। ১৯৯০ সালে জিম্বাবুয়ে, ১৯৯৪ সালে ভারত ও ১৯৯৫ সালে নেপালে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেন, জার্মান, ইরান, কানাডা, জ্যামাইকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পাকিস্তান, ফ্রান্স, পূর্ব বার্লিন এবং বাংলাদেশের জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারি, জাতীয় জাদুঘরে ও দেশ-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর ছবি সংরক্ষিত আছে। শিল্পী নিজামী সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ১৯৯৮, ০২, ০৩, ০৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে নতুন শিল্পীদের উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁর ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং দর্শক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি ৭০ এর দশকে ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং শুরু করে আমাদের পথ উন্মোচন করেছেন।

চিত্র-৫৮: শিল্পী নিজামীর ক্যালিগ্রাফি ‘ইয়া রাহমানু’

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫০: শিল্পী নিজামীর ক্যালিগ্রাফি ‘ইয়া রাহমান্‌’

তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক ছিলেন।[১৫] তিনি শিল্পের নান্দনিক বিষয়গুলো নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করছেন এবং অপূর্ব সুন্দর ও সার্থক ছবি নির্মাণ করেছেন। তাঁর এমন সার্থক শিল্পের সংখ্যাও যথেষ্ট। তৈলচিত্র ছাড়াও তিনি মৃৎশিল্পে কাজ করে থাকেন।

তিনি দেশে-বিদেশে অসংখ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। তাঁর শিল্পকর্ম প্রসঙ্গে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন- 'তাঁর ব্যবহৃত রঙের সংমিশ্রণ, বিষয়ের উপস্থাপনা সব কিছুতেই সরলতার ছাপ বিদ্যমান।' তাঁর অনেক ক্যানভাসে বিষয়ের আধ্যাত্মিক আলোর সমন্বয় ঘটেছে। এ সকল ক্যানভাসে রঙ ও ফর্মের সাথে যেভাবে আলোর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, তাতে প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন চিত্রাবলির অনুরূপ আবহের সৃষ্টি শিল্পীর কন্সট্রেশন ও কম্পোজিশনসহ বিভিন্ন চিত্রাবলি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বিমূর্তধারার এ সকল চিত্রাবলি ছাড়াও তিনি ইসলামের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাঁর ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনের আরবী হরফ বিন্যাস ও আয়াত ব্যবহারের মাধ্যমে বেশ কিছু শিল্পকর্ম তিনি তৈরি করেছেন।[১৬] তিনি পেইন্টিং ও সিরামিকে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বিমূর্ত পেইন্টিং সর্বজনবিদিত। তিনি ক্যালিগ্রাফিকে বিমূর্তধারায় পেইন্টিংয়ে প্রকাশ করেছেন। গভীর মমত্ববোধ, গীতিময়তা, ছন্দ ও সৌকর্য দিয়ে আরবী হরফের লালনে তিনি কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক শিল্পকলা চর্চা করে তিনি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পকর্মে গতানুগতিক এবং আধুনিক রীতিকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তিনি তাঁর উজ্জ্বল বর্ণের আধিপত্যে নির্মিত বিমূর্ত চিত্রে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ভাবমূর্ছনায় চিত্রিত করেছেন মহান আল্লাহর ক্যালিগ্রাফির স্ফুরণ। তিনি স্বভাবসুলভ মনের ব্যবহারে উল্লম্ব আকৃতির আরবী ক্যালিগ্রাফি করেছেন। ফলে তিনি 'ক্যালিগ্রাফি পদক-২০০৪' লাভ করেন।

---

[১৫] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ.৯।

[১৬] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পাচার্য হিসেবে তাঁর এ চিত্রকে সুন্দর ও সাবলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়।[১৭] স্রষ্টার রঙে রাঙায়িত রূপ তাঁর মনের অনুভূতি দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। ফলে তাঁর বেশ কিছু ছবি জুড়ে এসেছে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি। তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী তাঁর ক্যানভাসে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ক্যানভাসে তাঁর নিজস্ব রঙ ও কর্মে শিল্পের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। যা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তাঁর 'ঐশী অসীম' তৈলচিত্রটিতে বিশাল মরুভূমিতে যেন আল্লাহর নাম ঝলমল করছে। তাঁর তুলির ব্যবহার অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তাঁর ছবিতে স্পেস রাখা কম্পোজিশনের দক্ষতারই বহিঃপ্রকাশ। সকল বিষয়বস্তুর মাঝে তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে ও সার্থকভাবে চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ১৯৮২ সালে তাঁর 'মাই ফার্স্ট হ্যান্ডরাইটিং' নামক এমনই একটি সফল সৃষ্টি। তিনি ২০০৪ সালের মে মাসে ইন্তেকাল করেন।

২.১.৪ শিল্পী সবিহ্-উল আলম (জ. ১৯৪০ খ্রি.)

শিল্পী সবিহ্-উল আলম বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অন্যতম পুরোধা। তিনি একাধারে শিল্পী, লেখক ও শিল্পতাত্ত্বিক। তিনি ১৯৪০ সালের ৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাহবুবুল আলম চট্টলার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি ১৯৬৩ সালে এশিয়া ফাউন্ডেশন স্কলারশীপের মাধ্যমে লাহোরের ন্যাশনাল কলেজ অব আর্ট থেকে ডিজাইনের উপর স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ডিজাইন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। বই পুস্তক, ম্যাগাজিন ইত্যাদির প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। ১৯৬৪ সালে তিনি নিখিল পাকিস্তানে 'ন্যাশনাল বুক সেন্টার এ্যাওয়ার্ড', 'কামরুল হাসান এ্যাওয়ার্ড ও 'বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ এ্যাওয়ার্ড' পান। ১৯৭৫ সালে জেনেভা সুইজারাল্যান্ডে UNOP/ UNCTAD/ GATT আয়োজিত মাসব্যাপী 'ডিজাইন ফর এক্সপোর্ট' শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং এ লক্ষ্যে ফিল্ড রিসার্চ-এর আওতায় যুক্তরাজ্য, চেকোশ্লোভাকিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্ক ভ্রমণ করেন। তিনি পরিকল্পনা ও বাংলাদেশের

---

[১৭] '*৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*', ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *সাহিত্য সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা-২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

রপ্তানীতে একজন পথিকৃৎ। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানীতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি হস্তলিপি রপ্তানীর জন্য ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব ভ্রমণ করেন।[১৮]

চিত্র-৫৯:সবিহ-উল-আলমের ক্যালিগ্রাফি আলিফ-লাম-

শিল্পী সবিহ-উল আলম বাল্যকাল থেকেই ব্যাপক লেখালেখি করেছেন। তাঁর রসাত্মক গল্প পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত। ১৯৭৫ সালে তাঁর প্রথম বই 'পিমপেরী নেকলেস ও অন্যান্য' এবং হাস্যরসের উপর তাঁর আরো তিনটি বই রয়েছে। তিনি শিশুদের উপযোগী করে লেখা 'লেখা থেকে রেখা (১৯৮০ খ্রি.)', নামক ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক এবং 'কারুকাজে জাদুকর (১৯৮৮ খ্রি.)' শীর্ষক ইসলামী ডিজাইন বিষয়ক আরো দু'টি বই প্রকাশ করেন। তরুণ পাঠকদের জন্য আনন্দদায়ক বিষয় নিয়ে 'পিকনিক' নামে একটি বই লিখেন। ১৯৯২ সালে শিশুপ্রেমিক একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এবং শিশু-কিশোর পত্রিকা মাসিক টুইটুম্বুরে নিয়মিত লিখতেন এবং তাদের উপযোগী ছবি আঁকতেন।

মসজিদের ডিজাইনেও তাঁর সৃজনশীল হাত রয়েছে। ফেনী জেলার বল্লভপুরে 'জোসনে আরা কাশেম মসজিদ' ও নোয়াখালীর 'শরীফপুরে বায়তুশ শরীফ মসজিদ' তার অনন্য নিদর্শন। তিনি 'রোটারি ক্লাব অব ঢাকা ওয়েস্ট'-এর সাবেক সভাপতি, কক্সবাজার বায়তুশ শরফ হাসাপাতালের প্রধান উপদেষ্টা, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের আজীবন সদস্য ও ফাতেহবাদ ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন এন্ড ওয়ার্ক-এর সভাপতি। বর্তমানে তিনি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'কমিউনিকেন্টস' এ মাল্টিডিসিপ্লিনারী কনসাল্টিং অর্গানাইজেশন-এর চেয়ারম্যান এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর অন্যতম উপদেষ্টা।

[১৮] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ২০০২, ০৩ ও ০৮ সালে যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০২ সালে পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 'আল্লাহ' ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মটি ত্রি-মাত্রিক ধারার (Three dimensional) কাজ। পানি রঙে তিনি 'আল্লাহ' শব্দ নিয়ে যে অসাধারণ ক্যালিগ্রাফি করেছেন, তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি ক্যালিগ্রাফিক কলমের স্পর্শকাতর প্রয়োগে ক্যালিগ্রাফি ইমেজ সৃষ্টি করেছেন।[১৯] তার উপরিভাগ অনেক উঁচুতে হলেও তার সূচনা গভীরতার একান্তে। কেননা অনুভবের তারতম্য তিনি গভীরতায় বুঝিয়ে থাকেন।

তাঁর আরেক শিল্পকর্ম 'আলিফ-লাম-মীম' এর অর্থগত উন্মেষ চির রহস্যাবৃত হলেও অনুভবের বিচরণে তিনি প্রকাশ করেছেন নিজস্ব অভিজ্ঞতা। আত্মমগ্ন নির্জনতা থেকেই একক বর্ণে তিনি বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু হঠাৎ দেখে রঙের তাৎপর্য উপলব্দি করা যায় না। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে বোধ উজানিয়া বিমূর্ত কাজ বলে মনে হলেও মূর্ততা বিরাজ করে। হাল্কা রেখার ইশারার মত যেন রহস্যের অমোঘ বিশ্লেষণ সৃষ্টি হয়। ক্যালিগ্রাফিকর্মে তাঁর সংখ্যার আধিক্যতা না থাকলেও গুণগত মানে তিনি অনন্য উচ্চতায় সমাসীন। তাই বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে সৃজনশীল শিল্পী ও ডিজাইনার হিসেবে সবিহ-উল আলমের নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

২.১.৫ শিল্পী মীর রেজাউল করিম (জ. ১৯৪২ খ্রি.)

শিল্পী মীর রেজাউল করিম ১৯৪২ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর আবু তাহের। তিনি বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পী ও লেখক। তিনি ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের 'কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস' (যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ হিসেবে পরিচিত) হতে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএ, বিএড, এমএড ডিগ্রি

---

[১৯] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করেন। তিনি ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বর্তমানে তিনি কিশোরগঞ্জ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

চিত্র-৬০: শিল্পী রেজাউলের ঘূর্ণায়মান ঘূর্ণির ক্যালিগ্রাফি

শিল্পী মীর রেজাউল করিম ১৯৯২ সালে ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে এবং ১৯৯৪ সালে কিশোরগঞ্জ প্রেস ক্লাবে পেইন্টিং-এর একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তাছাড়া তিনি ১৯৬৩ সালে রমনা গ্রীন, ১৯৬৪ সালে ঢাকা আর্টস কাউন্সিল আয়োজিত 'ন্যাশনাল পেইন্টিং এক্সিবিশন', ঢাকার লুব্ধক গ্যালারি, ১৯৬৫ সালে ঢাকার আর্টস এসেম্বল গ্যালারি, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ পরিষদ, ময়মনসিংহ জেলা কর্তৃক আয়োজিত 'গ্রুপ পেইন্টিং প্রদর্শনী', ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত 'ন্যাশনাল আর্ট এন্ড ক্রাফট এক্সিবিশন' এবং ২০০২, ০৩, ০৫, ০৬ ও ০৮ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম ও দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর অন্যতম উপদেষ্টা।[২০]

তাঁর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' শীর্ষক ৩টি শিল্পকর্ম ২০০২ সালে পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়, যা কোন শৈলীর অনুসরণে না হলেও তা শিল্পমানে উত্তীর্ণ। এগুলো অপূর্ব ও নান্দনিক। ২০০৩ ও ২০০৫ সালে যথাক্রমে পঞ্চম ও অষ্টম প্রদর্শনীতে তাঁর ক্যালিগ্রাফিগুলো অনেক উঁচুমানের বলে বিবেচিত হয়। তিনি তাঁর শিল্পকর্মে একটি ইল্যুশন তৈরি করলেও সহজে

[২০] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

Dhaka University Institutional Repository

তা পড়া যায়। মোহাম্মদ আবদুর রহীম তাঁর 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফি' বইতে রেজাউল করিম সম্পর্কে বলেন- 'তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে একটি অপার্থিব ব্যাঞ্জনা দর্শককে আন্দোলিত করে'।

২.১.৬ শিল্পী মনিরুল ইসলাম (জ. ১৯৪৩ খ্রি.)

শিল্পী মনিরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্পেন প্রবাসী একজন চিত্রশিল্পী। তিনি ১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অবস্থান করেও বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে ক্যালিগ্রাফির প্রতি তাঁর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। পাশাপাশি তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচরণ ও ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তিনি জাপানের কিয়োটোতে 'ইন্টারন্যাশনাল ইমপেক্ট আর্ট ফেস্টিভ্যাল মিউনিসিপাল' আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ও সানফ্রান্সিসকোর 'মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট'-এ অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট কোর', হাঙ্গেরীর বুদাপেস্টে 'ডে আর্ট ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন', স্পেনের ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ফেয়ার', আরকো-৮৬, কোরিয়ার সিউলের 'এশিয়ান কনটেম্পোরারি গ্রাফিক বাইনেল', ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত গ্রান্ড প্যালেসে অনুষ্ঠিত SAGA-88, স্পেনের মাদ্রিদে সেন্ট্রো কালচারাল ডেল আয়োজিত ১৫০ শিল্পীর 'প্রিন্ট আর্ট ফেয়ার', ইন্ডিয়ার ভূপালের মিউজিয়াম অব আর্ট একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত প্রথম 'ইন্টারন্যাশনাল বাইনেল', বুলগেরিয়ায় গ্রাফিক্সের উপর আন্তর্জাতিক গ্রাফিক বাইনেল 'VARNA-89' জার্মানীর বার্লিনে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারগ্রাফিক-৯০' সুইজারাল্যান্ডের বাসেলে অনুষ্ঠিত 'জার্মানী এডিশন ৩/৯২', মরক্কোর আসিলায় অনুষ্ঠিত 'ARCO-93' ও 'ARCO-94', গ্যালারি স্ট্যাম্প, গ্যালারি BAT ইত্যাদির যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া মিসরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'ট্রাইএনুয়েল অব গ্রাফিক্স' এবং 'ইজিপশিয়ান বাইনেল' এ বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

শিল্পী মনিরুল ইসলাম শুধু যৌথই নয় বরং দেশে-বিদেশে অনেকগুলো একক প্রদর্শনীতেও অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ১৯৮০ সালে হল্যান্ডের আমস্টারডামের ‘কুন্সথলে রয়েরেন্ট’, ১৯৮১ সালে কুয়েতের ‘সুলতান গ্যালারি’, ১৯৮৪ সালে কানাডার মন্ট্রিলে ‘ন্যাশনাল ম্যালন অব দ্যা আর্ট মিউজিয়াম’, ১৯৮৫ সালে যুক্তরাজ্যের ‘অক্সফোর্ড গ্যালারি’, ১৯৮৬ সালে নিউইয়র্কে ‘ব্রানক্স মিউজিয়াম অব দ্যা আর্ট’, ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন ডিসির ‘দ্যা আর্ট সোসাইটি অব দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মনিটরিং ফ

ান্ড’, ১৯৮৮ সালে স্পেনের সেভিলা, পাপেল ও লিয়োনকার ‘গ্রাফিক আর্ট সেন্টার’, ১৯৮৯ সালে কুয়েতের ‘সুলতান গ্যালারি’, স্পেনের মাদ্রিদে ‘গ্যালারি BAT’ ও লাস পালমাস-এর ‘গ্যালারি আটির’, ১৯৯০ সালে ইন্ডিয়ার ‘বারোডা ইউনিভার্সিটি আর্ট একাডেমি’, ১৯৯১ সালে মাদ্রিদে ‘গ্যালার টুর্কুলো’ ও ৯২ সালে টলোডোর ‘গ্যালারি টলমো’, ‘গ্যালারি ট্রিনটা’, ‘মন্টিয়াগো ডি কম্পোস্টিলা’, ‘গ্যালারি ভারণ’, ১৯৯৩ সালে ঢাকার গ্যালারি ‘শিল্পাঙ্গন’, স্পেনের মাদ্রিদে ‘গ্যালারি ইসটেম্প’, ১৯৯৪ সালে ‘সালা গার্কাই ফস্টেনিয়ন’, ‘কাজা ডি’, ‘আহোরস’, ‘মিউনিসিপ্যাল ডি পামলোনা’, ‘গ্যালারি জাপানী’, ১৯৯৫ সালে স্পেনের বিলবাউয়ের ‘গ্যালারি এমাস্তে, ‘মিউজিয়াম অব গয়া’, ১৯৯৬ সালে ‘গ্যালারি এ ইসটেম্পা’, ‘গ্যালারি তেমা’, ১৯৯৭ সালে ঢাকার গ্যালারি ‘শিল্পাঙ্গন’, মিসরের কায়রোর ‘অনার অব দ্যা ট্রাইএনুয়েল’, ১৯৯৮ সালে স্পেনের টলেডোর ‘গ্যালারি টলমো’, ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদের ‘গ্যালারি রোটাস’, ২০০০ সালে করাচীর ‘গ্যালারি চাউকান্ডি’, ২০০১ সালে মাদ্রিদের ‘গ্যালারি ইসটেম্প’, ২০০৩ সালে মাদ্রিদের ‘আর্ট ফেয়ার ফ্লেচা’, ডি আর্টি গ্যালারির ‘আর্ট ফেয়ার অব স্পেনিশ কনটেম্পোরারি’ ইত্যাদিতে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন।[২১] ২০০৪ সালে জুলাই মাসে তাঁর তত্ত্বাবধানে দেশের নবীন-প্রবীন ১৬ জন শিল্পীকে নিয়ে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে ৪দিন ব্যাপী ‘কোলাজ কল্প’ শীর্ষক একটি কর্মশালার আয়োজন করেন। কর্মশালার লক্ষ্য ছিল- দেশজ উপকরণ দিয়ে কাজ করতে শিল্পীদের শিল্প সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা।[২২]

---

[২১] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮।
[২২] ‘কোলাজ কল্প: সমকালীন শিল্পীদের নতুন ছবি’, *যায়যায়দিন*, আর্ট এন্ড কালচার, ২৪ মে, ২০০৭, পৃ.৮।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী মনিরুল ইসলাম ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এবং চিত্রশিল্প প্রদর্শনী ও মেলায় অংশগ্রহণ করে দেশে-বিদেশে অনেক এ্যাওয়ার্ড লাভ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ১৯৭২ সালে স্পেনের ইবিজাতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম-'ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অব দ্যা প্রিন্টস', ১৯৭৪ সালে স্পেনের মাদ্রিদে 'ফার্মেন এরোজামেনা প্রাইজ', ১৯৭৭ সালে যুগোস্লাভিয়ার লুবযানায় 'দ্বাদশ বাইনেল', ১৯৭৮ সালে নরওয়ের চতুর্থ 'ইন্টারন্যাশনাল গ্রাফিক বাইনেল', যুগোস্লাভিয়ার রিজেকায় ষষ্ঠ 'ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অব ড্রইং', ১৯৯২ সালে নরওয়ের '৬ষ্ঠ ইন্টারন্যাশনাল গ্রাফিক বাইনেল', ১৯৯৩ সালে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো ও ক্যালিফোর্নিয়ার 'মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট ওয়ার্ল্ড', 'প্রিন্ট ফোর' একই বছরে তাইওয়ানের 'ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অব প্রিন্ট', ১৯৯৫ সালে স্পেনে দ্বিতীয় 'আন্তর্জাতিক এক্সিবিশন অব প্রিন্ট' পুরস্কার লাভ করেন। তাছাড়া সপ্তম 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার', ১৯৮৬ সালে ইরাকের বাগদাদে 'গ্রাফিক আর্ট'-এ প্রথম, ১৯৯৭ সালে স্পেনের 'ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড অব স্পেনিশ প্রিন্টস' এবং ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের 'একুশে পদক' লাভ করেন। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী হয়েও ক্যালিগ্রাফির প্রতি গভীর ভালবাসা থাকায় এক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রেখেই চলেছেন। তাঁর কাজে সব সময় কোন কিছু দেখা বা ঘটে যাওয়া ছাপ এবং অনুভূতির তাৎক্ষণিক সংশ্লেষণ স্থান পায়। এ ধরনের প্রবণতার আরো স্পষ্টতর স্বাক্ষর প্রদর্শনীগুলোতে দেখা যায়।

২.১.৭ শিল্পী সাইফুল ইসলাম (জ. ১৯৪৬ খ্রি.)

শিল্পী সাইফুল ইসলাম ১২ আগস্ট ১৯৪৬ সালে মেহেরপুর জেলার চরহাস নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নাইমুদ্দিন বিশ্বাস। মাতার নাম রাহেলা খাতুন। তিনি ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি কম পাস করে ফাউজি ফাউন্ডেশনে একজন সহকারী হিসাব কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান এবং পোর্ট্রেইট পেইন্টিং এর উপর 'সুরিকভ ইনস্টিটিউট' হতে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

ফেলোশীপ অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালে সেগুন বাগিচায় পাকিস্তান কাউন্সিল হলে একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি মালেশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলী বিন আব্দুল্লাহর নিমন্ত্রণে কুয়ালালামপুর ভ্রমণে যান এবং সেখানে কিছু ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম রেখে আসেন। ২০০৪ সালে ইরানের তেহরানে আল-কুরআন এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চায় যে ক'জন নিরীক্ষাধর্মী কাজ করেছেন তাদের মধ্যে শিল্পী সাইফুল ইসলাম অন্যতম। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফিকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অভূতপূর্ব শ্রম দিয়েছেন।

চিত্র-৬২: শিল্পী সাইফুল ইসলমের অনন্য ক্যালিগ্রাফি 'আল্লাহু'

তাঁর 'ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি' শীর্ষক শিল্পকর্মটি খুব উঁচু মানের। এতে তিনি সৃজনশীলতা, সহজাত শিল্পসত্ত্বা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ১৯৬০ সালে তেলরঙ দিয়ে এ কাজ শুরু করেন। তাঁর দেশী-বিদেশী অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ১৯৯৪ সালে তাঁর কাছে আর্ট শিখেছেন। ক্যালিগ্রাফিতে অবদান রাখায় ২০০৬ জিয়ার কল্যাণে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে হজ্জব্রত পালন করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্থান পায়। তাছাড়া রাজউক ভবনে তাঁর ডিজাইন করা কুরআনের আয়াত স্থান পায়।[২৩] ১৯৯৫ সালে ইসলামী ব্যাংকের ক্যালেন্ডারে তাঁর ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করা হয়। ফলে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

---

[২৩] Folder: M. Syful Islam, Achievement, p.4.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ১৯৮১ সাল থেকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি করতে শুরু করেন। ১৯৯০ সালে থেকে বাংলা ভাষায় ক্যালিগ্রাফি শুরু করলে অধাপক কবীর চৌধুরী তাকে লিখিত অভিনন্দন জানান। তাঁর মডার্ন কম্পোজিশন ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি দেশ-বিদেশে সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেয়। তিনি দেশে-বিদেশে ৭টি একক প্রদর্শনী করেন। বর্তমানে তিনি রঙ-তুলিতে ভিন্নধারার ক্যালিগ্রাফি করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর সাইফুল ইসলামই প্রথম শিল্পী যিনি ইসলামী ক্যালিগ্রাফি নিয়ে কাজ করে এ শিল্পকে জনপ্রিয় করে তুলেন এবং দেশ বিদেশে এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে দেন। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ওআইসি সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর প্রথম 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এটি প্রথম ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। তাঁর ক্যালিগ্রাফি কর্মগুলো বাংলাদেশের শিল্পচর্চার জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।[২৪] এরপর ১৯৯৪ ও ৯৫ সালে তিনি ঢাকা 'শেরাটন হোটেল' ও 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন অডিটোরিয়াম' এবং ১৯৯৬ সালে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন। ২০০১ সালে জাতীয় জাদুঘরে তাঁর 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এতে ধাতুর ব্যবহারে ক্যালিগ্রাফি (Metallic Calligraphy) সৃষ্টি করেন। ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৫ ও ২০০৬ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে যথাক্রমে প্রথম, তৃতীয়, অষ্টম ও নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৪ সালে ২৭ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর সপ্তাহব্যাপী ইরানের দ্বাদশ বার্ষিক আন্তর্জাতিক পবিত্র কুরআন ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র-৬৩: শিল্পী সাইফুল ইসলমের ক্যালিগ্রাফি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'

শিল্পী সাইফুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের জন্য এবং দেশের শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার হিসেবে ১৯৯৫ সালে 'জাতীয় সাহিত্য কেন্দ্র' কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মুহাম্মদ আজরফের হাতে স্বর্ণপদক

[২৪] www.syfulart.com

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন তাঁর শিল্পকর্ম দেখে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁর মেটালিক ক্যালিগ্রাফি রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কেবিনেট হলে, সাভার, যশোর ও ঢাকা সেনানিবাসের গ্যারিসন মসজিদে কাঠের ক্যালিগ্রাফি, আর্মি হেড কোয়ার্টারে এবং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসে তাঁর ক্যালিগ্রাফি কর্ম সংগৃহীত রয়েছে। শুধু তাই নয় সৌদি আরব, জাপান, আমেরিকা, দুবাই, যুক্তরাজ্যের কিছু সংগ্রাহক তাঁর শিল্পকর্ম ক্রয় করেন এবং নিজ নিজ গৃহে ও অফিসে সংরক্ষণ করেন। তিনি একজন নিয়মিত পেইন্টার। এখনও তাঁর কাছে সহস্রাধিক ক্যালিগ্রাফি সংরক্ষিত আছে। ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং ও শিল্পচর্চায় তিনি নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা করে যাচ্ছেন। এজন্য তিনি ১৯৮১ সালে 'সেজান আর্ট স্কুল' ও 'সেজান আর্ট গ্যালারি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তিন যুগের বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা করছেন। ঢাকায় তাঁর ৩টি কমার্শিয়াল আর্ট গ্যালারি আছে। ঢাকার শেরাটন হোটেলে (বর্তমানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল) এবং বনানীর UAE মৈত্রী কমপ্লেক্সে। এখানে তাঁর দেশী-বিদেশী শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এর আগে ১৯৭২ সালে 'দেশ আর্ট গ্যালারি' প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছর তিনি জাতীয় সংসদ ভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর তেল রঙে পোর্ট্রেইট করেন। সম্প্রতি তিনি মোটা কালো কালিতে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া তিনি বাংলাদেশে জাতীয়মানের একটি ক্যালিগ্রাফি আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন লালন করছেন। এভাবে সদাসর্বদা তিনি ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিস্তৃতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।[২৫]

তিনি একজন পেশাগত শিল্পী। তিনি ক্যালিগ্রাফি, পোর্ট্রেইট, ল্যান্ডস্ক্যাপ, স্টিল লাইফ, এবস্ট্রাক্ট সবটাতেই সমান দক্ষ। দীর্ঘ দু'দশকে অভিনব ঢঙে বিভিন্ন মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি করে শিল্পাঙ্গনে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। তিনি পাঁচ শতাধিক ক্যালিগ্রাফি করেছেন। বিগত কয়েক দশকে তিনি বাংলা ক্যালিগ্রাফি নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন।[২৬] 'বিদ্যার বড়াই অজ্ঞতারই প্রকাশ', 'বিবেকহীন মানুষ সমতুল্য', এরকম আরো অনেক বাংলা ক্যালিগ্রাফি তিনি করেছেন। মাতৃভাষার

[২৫] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

[২৬] *'অজ্ঞতার কারণেই ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রতি এই অবজ্ঞা'*, সাইফুল ইসলাম, *দৈনিক ইনকিলাব*।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি তাঁর এ ভালবাসা তাকে আরো নব সাজে সজ্জিত করেছেন। এমেচার শিল্পী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে পোর্ট্রেইট নির্মাণে দক্ষতা দেখিয়ে পরিচিতি ও অর্থের উপায় বের করতে পারায় একপর্যায়ে তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিক শিল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সেই হতে তিনি একান্ত নির্জনে অঙ্কনশিল্পের বহুমাত্রিক ধারায় কাজ করে চলছেন। দেশী-বিদেশী বিখ্যাত সব শিল্পকর্মের পুনর্নির্মাণ, পুরাতন ও নতুন নিয়মে শিল্পতৈরিতে নিজেকে উৎসর্গ করেন।[২৭] চিরায়ত বাংলার ছবি আঁকায় তিনি পারদর্শী হলেও ক্যালিগ্রাফিতেও নবতর ধারা সৃষ্টিতে তাঁর নিরন্তর সাধনা রয়েছে। বিমূর্ত ছবির মাঝে আরবী হরফের কারুময় সংযোজন তারই আবিষ্কার।

তাঁর ফ্রি-হ্যান্ড আকৃতির ক্যালিগ্রাফির মাঝে দর্শক খুঁজে পান আধ্যাত্মিক পথযাত্রার শুভ্র আহবান। তিনি 'আল্লাহ' শব্দকে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক শৈল্পিক আকার-আকৃতি ও আক্ষরিক অঙ্গ-ভঙ্গিমায় ক্যানভাসের জমিনে উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমার ইচ্ছা, 'আল্লাহু' শব্দের এ ক্যালিগ্রাফির সিরিজটিকে দশহাজার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া।'[২৮]

শিল্পী সাইফুল ইসলাম ক্যালিগ্রাফির পাশাপাশি নিসর্গ চিত্র ও প্রতিকৃতিও আঁকেন। তিনি কুরআন-হাদীসের বাণীগুলো অর্থসহ পড়ে ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ করে পছন্দমত আয়াতটির ছবি আঁকার বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। আয়াতটির মূল অর্থ রঙের মাধ্যমে ক্যানভাসে প্রকাশ করেন। 'ইয়া জাহির' আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নামের অন্তর্ভুক্ত। যার অর্থ, হে প্রকাশকারী। এ ছবিতে আল্লাহর প্রকাশ কত সুন্দর, তা গাছ থেকে ফুল ফুটিয়ে দেখিয়েছেন। ক্যালিগ্রাফিটি গোলাপী রঙে ফুলের মত করে একে তার সাথে সঙ্গতি রেখে কালো ফুলের গাছ অঙ্কন করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁর ১০টি ছবির সমন্বয় একটি বইও প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তাঁর অসংখ্য ক্যালিগ্রাফির সংগ্রহ রয়েছে। তাঁর এ ব্যাপক ক্যালিগ্রাফিকর্ম দেশ-বিদেশে সাদরে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সম্প্রসারণই তাঁর আমৃত্যু স্বপ্ন। তাঁর প্রতিটি শিল্পকর্মে

[২৭] 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অনন্য শিল্পী সাইফুল ইসলাম', *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*, ১৮ আগস্ট-১৯৯৫।
[২৮] '*ক্যালিগ্রাফির আদ্যোপান্ত*, মিরাজ রহমান, দৈনিক যুগান্তর, ২২ জুন ২০১২।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময় ও সৌন্দর্য বিদ্যমান। শিল্পী, সমালোচক, লেখক ও দার্শনিকগণ তাঁর শিল্পে সেই সৌন্দর্য খুঁজে পান। তিনি বর্তমানে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নিরীক্ষাধর্মী কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

২.১.৮ শিল্পী এ. এইচ. এম বশির উল্লাহ (জ. ১৯৪৭ খ্রি.)

শিল্পী বশির উল্লাহ বাংলাদেশের একজন প্রবীণতম ক্যালিগ্রাফার। তিনি ১৯৪৭ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস (যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ হিসেবে পরিচিত), ঢাকা থেকে ড্রইং এন্ড পেইন্টিং বিভাগে বিএফএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বাটিক, টেক্সটাইল ডিজাইন, শার্ট, থ্রি-পিছ, বেড শিট, সোফা মেট, ওয়ালমেটের টাই-ডাই, ম্যাপ, ক্যালেন্ডার ও শুভেচ্ছা কার্ড তৈরীর কাজে নিয়োজিত থাকেন। তিনি একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত প্রিন্ট মেকিং, ২০০২ সালে সমকাল শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত ওয়াটার কালার এবং মনো প্রিন্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে তাঁর শিল্পোচিত মনকে আরো সমৃদ্ধ করেন।

তিনি দেশে-বিদেশে অনেকগুলো যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নেন। ১৯৭০ সালে আর্ট এ্যাসেম্বল গ্যালারি আয়োজিত ‘পেইন্টিং এক্সিবিশন’ ও ‘নবান্ন পেইন্টিং এক্সিবিশন’, ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের উপর ‘পেইন্টিং এক্সিবিশন’, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ‘ন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশন’, ১৯৮৫-৯২ সাল পর্যন্ত সাজু আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত বাংলাদেশী শিল্পীদের ‘গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন’, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত দশম ‘ন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশন’, ১৯৯৩ সালে আর্ট গ্যালারি টোনে ‘প্রথম ন্যাশনাল মিনিয়েচার পেইন্টিং এক্সিবিশন’ এবং সাজু আর্ট গ্যালারিতে দেশী-বিদেশী শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ‘আর্ট এক্সিবিশন’, ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ‘ন্যাশনাল একাদশ ও দ্বাদশ আর্ট এক্সিবিশন’ এবং সাজু গ্যালারির ‘আর্ট এক্সিবিশন’, ১৯৯৫ সালে জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত ‘ন্যাশনাল আর্ট বাইনেল’, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ‘ন্যাশনাল আর্ট

Dhaka University Institutional Repository

বাইনেল' ও সাজু আর্ট গ্যালারির 'আর্ট প্রদর্শনী', ১৯৯৭ সালে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত অষ্টম 'এশিয়ান আর্ট বাইনেল' এবং সমকাল শিল্পী গোষ্ঠী আয়োজিত ১৯৯৭-২০০০ সাল পর্যন্ত সকল প্রদর্শনী, ১৯৯৮ সালে ত্রয়োদশ 'ন্যাশনাল আর্ট বাইনেল', ১৯৯৯ সালে নবম 'এশিয়ান আর্ট বাইনেল', ২০০০ সালে চতুর্দশ ন্যাশনাল এবং ২০০১-০২ সালে 'সাইলেন্ট অকশন অব প্রিন্টিং'-এ অংশগ্রহণ করেন। দেশের বাইরেও বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাঁর অংশগ্রহণ দেখা যায়। ১৯৯৭ সালে জাপানের কানাগাওয়ায় অনুষ্ঠিত ১৯তম 'ইন্টারন্যাশনাল ইনডিপেনডেন্ট এক্সিবিশন', ১৯৯৮ টোকিওতে 'ইন্টারন্যাশনাল মিনি প্রিন্ট ট্রাইএনুয়েল' এবং রুমানিয়ায় 'ইন্টারন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশন'-এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর অন্যতম উপদেষ্টা।[২৯]

চিত্র-৬৪: শিল্পী বশির উল্লাহ'র ক্যালিগ্রাফি 'নবীর প্রতি সালাম'

২০০৩, ০৪ ও ০৫ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রদর্শনীগুলোতে উপস্থাপিত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফিদ্বয়ে বেশ গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির সাথে মহান বাণীর সর্বাত্মক একক হয়ে উঠার মাঝে শিল্পী অবলোকন করেন অপার্থিব অস্তিত্ব এবং আমাদের জীবনের সাথে সে মহান বাণীর অপরিহার্যতা। ক্যানভাসে রং ছড়ানো প্রতিভাদীপ্ত আরবী হরফের শৈল্পিক অবস্থান ছিল আধ্যাত্মিক চৈতন্যে সর্বোজ্জ্বল। তাঁর ক্যানভাসে রঙের রূপচ্ছটা যেন প্রবাহমান কলরোলের মত। আর তাঁর উপরই বর্ণময় আবহে তিনি ক্যালিগ্রাফি এঁকে থাকেন। একজন পেইন্টিং শিল্পী হিসেবে তাঁর ক্যানভাসে ক্যালিগ্রাফির বর্ণময় অবয়বই প্রত্যক্ষ করা যায়।[৩০]

---

[২৯] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

[৩০] *ক্যালিগ্রাফ আর্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

Dhaka University Institutional Repository

২.১.৯ শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার (জ. ১৯৪৮ খ্রি.)

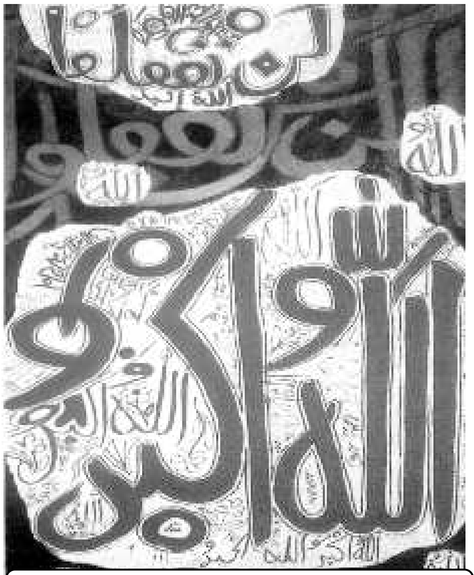

চিত্র-৬৫: শিল্পী আব্দুস সাত্তারের ক্যালিগ্রাফি 'আল্লাহু আকবার'

শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার বাংলাদেশের শিল্পচর্চার আন্দোলনে একটি পরিচিত নাম। তিনি ১৯৪৮ সালে নাটোর জেলার বড়াইগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থেকেই শিল্পচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে ১৯৭১ সালে বিএফএ এবং ১৯৮০ সালে এমএফএতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর ১৯৮৭ সালে আমেরিকার নিউইর্য়কে প্রাট ইনস্টিটিউট হতে এমএফএ ডিস্টিংশন লাভ করেন। এর আগে ১৯৭৫ সালে ভারতের শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিজিএস ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি হতে ইংলিশ লিটারেচারে বিশেষ অধ্যয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী এবং বাংলাদেশের ছাপচিত্র অঙ্গনের একজন পথিকৃৎ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক, বর্তমানে বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, বাংলাদেশ কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, স্বাধীনতা স্তম্ভ প্রকল্প ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য এবং বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটির উপদেষ্টা। তিনি শিল্পী ছাড়াও একজন শিল্প সমালোচক, লেখক, গবেষক ও কলামিস্ট।

শিল্পী আব্দুস সাত্তার জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত প্রায় সকল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের মোট ১৭টি একক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জাদুঘর ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৮ সালে যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁর পদচারণা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। মিসর, বুলগেরিয়া, কোরিয়া, সুইডেন, শ্লোভাকিয়া, জাপান, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, তাইওয়ান, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, কানাডা, মালয়েশিয়া, হাঙ্গেরী, বিটলা, আরব আমিরাত, ইউক্রেন, জাগরেব, জার্মানী, পাকিস্তান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আয়োজিত প্রদর্শনীসমূহেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম আমেরিকার 'পোর্টল্যান্ড আর্ট মিউজিয়াম', আমেরিকার 'থালামার অবর্ণ ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম', যুগোস্লাভিয়ার 'মিউজিয়াম অব কন্টেম্পোরারি আর্ট', মালয়েশিয়ার 'ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি', যুগোস্লাভিয়ার 'দি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রি', নরওয়ের 'মিউজিয়াম অব কন্টেম্পোরারি গ্রাফিক আর্ট', ইউক্রেনের 'ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি', যুগোস্লাভিয়ার 'মিউজে আর্ট কন্টেম্পোরেইন', মিসরের 'মিউজিয়াম অব কনটেম্পোরারি গ্রাফিক প্রিন্টস', যুগোস্লাভিয়ার তুজলায় 'দ্যা গ্যালারি অব যুগোস্লোভিয়া পোর্ট্রেইট', 'কেবিনেট অব গ্রাফিক আর্ট', 'যুগোস্লাভ একাডেমি অব আর্টস এন্ড সায়েন্সেস' নরওয়ের 'মিউজিয়াম অব কন্টেম্পোরারি গ্রাফিক আর্ট'সহ বাংলাদেশ জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারি, জাতীয় জাদুঘর, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। বিশেষত ঢাকার সোরারগাঁও হোটেলের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার দায়িত্ব লাভ করায় বিভিন্ন কক্ষসহ সমগ্র হোটেলে তাঁর ৩৫০টি চিত্রকর্ম সংরক্ষিত আছে।[৩১]

শিল্পী আব্দুস সাত্তার তাঁর অসাধারণ শিল্পকর্ম নির্মাণের জন্য দেশে ও বিদেশে অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে প্রিন্টের জন্য 'বেস্ট এ্যাওয়ার্ড', ১৯৮০ সালে 'গোল্ড মেডেল', ১৯৮১ সালে 'বেস্ট এ্যাওয়ার্ড ফর প্রিন্ট' এবং ১৯৯২ ও ৯৪ সালে 'অনারেবল মেনশন' লাভ করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আর্ট বাইনেল, পাকিস্তানের

---

[৩১] *আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্ম*, ঢাকা, অক্টোবর-২০০২, পৃ.১০১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম আর্ট বাইনেল, যুগোস্লাভিয়ায় অনুষ্ঠিত ১৯৮১, ৮৫ ও ৮৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল বাইনেল অব গ্রাফিক আর্ট', ১৯৯৩ সালে মিসরের প্রথম 'ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইএনুয়েল ফর প্রিন্ট' এবং ১৯৯৭ সালে আমেরিকার 'পোর্টল্যান্ড আর্ট মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টস এক্সিবিশন' পদক লাভ করেন।[৩২]

শিল্পী আব্দুস সাত্তার আরবী ও বাংলা হরফের সহযোগে নব্বইয়ের দশক থেকেই ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করেছেন। চারুকলার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করার সময়ও তাঁর ক্যালিগ্রাফি চর্চা অব্যাহত ছিল। তিনি কাঠখোদাই এক্রিলিক, পানিরঙ ও এচিং-এর মাধ্যমে বহু ক্যালিগ্রাফি এঁকেছেন। আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে এ শিল্পীর আরবী বর্ণমালায় বিশালাকৃতির কাঠখোদাই ক্যালিগ্রাফি চিত্র মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে সংরক্ষিত আছে। তাঁর ক্যালিগ্রাফি চর্চা বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক। তিনি ওরিয়েন্টাল আর্ট নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে আসছেন। ক্যালিগ্রাফি যেহেতু ওরিয়েন্টাল ধারায় পরিগণিত হয়, সেহেতু এ শিল্পের স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁকে সবসময় ভাবতে হয়েছে। তাঁর শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তিনি আরবীর সাথে বাংলা বর্ণমালার মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি করেন। নব্বইয়ের দশক থেকে তাঁর এ ঝোঁক দেখা যায়। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে রঙের উজ্জ্বলতা ও বৈপরিত্ব ছাড়াও পটপ্রেক্ষিতে কারুকাজ সহজে নজরে পড়ে। আবার শব্দ বা হরফগুলোর কম্পোজিশনে তিনি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন।[৩৩]

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন, 'তিনি শৈল্পিক স্বকীয়তা বজায় রেখে বাংলা ও আরবী হরফের সামঞ্জস্যমূলক ও সাবলীল প্রয়োগে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি কাঠখোদাই, এক্রিলিক, ওয়াটার কালার ও এচিং-এর ব্যবহারে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। ২০০১ সালে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে ক্যালিগ্রাফির ঐতিহ্যগত ধারায় লেখা 'আল্লাহ' বাংলা ক্যালিগ্রাফিটি ছিল এক অনন্য সংযোজন। প্রথাগত ধারায় বাংলা

---

[৩২] *আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০২।

[৩৩] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে তাঁর অনবদ্য অবদান আশা করা যায়। ২০০৪ সালে জাতীয় জাদুঘরে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত তাঁর শিল্পকর্মে ট্রাডিশনাল এবং আধুনিক রীতি ও কৌশলের সংমিশ্রণ দেখা যায়।' তাঁর শিল্পকর্ম দর্শকদের যেমন আনন্দ দেয় তেমনি ভাবিয়েও তুলে। তাঁর শিল্পকর্মে তুঘরা, গুলজার ও নাসতা'লিকের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে ২০১৮ সালে শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম 'মধ্যযুগের (১২০০-১৮০০ খ্রিঃ) বাংলা ভূখন্ডে প্রাপ্ত ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক ব্যবহার এবং তার ইতিহাস' বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা বিভাগের অধীনে এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন।

২.১.১০ শিল্পী কামরুল হাসান কালন (১৯৪৯-২০০৩ খ্রি.)

শিল্পী কামরুল হাসান কালন প্রাচ্যকলার একজন অভিজ্ঞ শিল্পী। তিনি ১৯৪৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকার বাংলাদেশ কলেজ অব আর্ট এন্ড ক্রাফট (যা বর্তমান ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের চারুকলা অনুষদ হিসেবে পরিচিত) হতে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৫ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসির 'হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি'তে থিসিস কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি 'ড্রইং ও পেইন্টিং' এর উপর হল্যান্ডের 'রিজিকস একাডেমি' হতে একাডেমিক স্কলারশীপ এবং ১৯৭৯-৮০ সালে জাপান ফাউন্ডেশন ফেলোশীপের আওতায় 'টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফাইন আর্টস' প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেন। দেশের বিভিন্ন গ্যালারিতে মোট ২০টি একক প্রদর্শনীর আয়োজন এবং লন্ডন, আমস্টারডাম, প্যারিস, নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ওয়াশিংটন ডিসি, মেরিল্যান্ড, টোকিও ও রিয়াদেসহ মোট এগারটি একক প্রদর্শনীর আয়োজন করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। তিনি আমৃত্য ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা ছিলেন।[৩৪]

[৩৪] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬৬: শিল্পী কামরুল হাসানের কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি

পেইন্টিং-এ ক্যালিগ্রাফির উপস্থাপনে তাঁর প্রয়াস সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ২০০৩ ও ২০০৪ সালে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সপ্তম প্রদর্শনীর শেষদিন প্রদর্শনীতে এসে তাঁর শিল্পকর্ম দেখে গিয়ে মাত্র কয়েকদিন পরই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। তিনি সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ অনেকগুলো শিল্পকর্ম রেখে গেছেন, তার মধ্যে বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফিও আছে। তাঁর শিল্পকর্মে আরবী হরফগুলো ফুলেল প্রকৃতিতে গাঢ় কালচে সবুজ ও লাল বর্ণে কিন্তু উজ্জ্বল পরিবেশে প্রস্ফুটিত হয়েছে। মোটা তুলি ও সুদৃঢ় নিবের সুক্ষ্ম আঁচড়ে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি লাল-সবুজ ফুল ও পাতা এঁকে অবশিষ্ট পরিসরে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। হস্তলিখনগত বিশেষ গতিব্যঞ্জনা তাঁর চিত্রে কম থাকলেও অঙ্কিত ফুল ও পাতার মধ্যে দর্শকদের জন্য চোখের আনন্দ রয়েছে। তিনি ভবিষ্যতে আল্লাহর গুণবাচক নামের উপর একটি সিরিজ ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং করা অবস্থায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং ৩ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্বদ্যিালয় হাসপাতালে নেওয়ার পর ইন্তেকাল করেন।[৩৫]

[৩৫] *ক্যালিগ্রাফ আর্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

২.১.১১ শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী (১৯৫৪-২০১৬ খ্রি.)

শিল্পী শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী সংক্ষেপে এফ. বারী ১৯৫৪ সালে মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা ফজলুল বারী। তিনি ইসলামিক স্টাডিজে মার্স্টার্স পাশ করার পর সৌদি আরবেব রিয়াদস্থ আর্ট ইনস্টিটিউট হতে 'ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক ক্যালিগ্রাফি' ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০০১ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', এবং ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৮ সালে জাতীয় জাদুঘরে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত ক্যালিগ্রাফি শিল্প চ্যানেল আই, ইটিভি ও বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত 'ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশন্স' বিভাগে সংরক্ষিত রয়েছে। সবশেষে তিনি সৌদি দূতাবাসের 'সৌদি মিলিটারী এ্যাটাশ'-এর প্রধান অনুবাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাছাড়া তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর একজন সদস্য ও প্রশিক্ষক ছিলেন।

চিত্র-৬৭: শিল্পী শহীদুল্লাহ'র সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফি

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক শিল্পনির্মাণে যারা পারদর্শী তাদের মধ্যে শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী-ই তাদের মাঝে শীর্ষে ছিলেন। তিনি শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি করতেন। হরফগত সুনিপুণ ব্যাঞ্জনায় অভিনিবেশের মাধ্যমে তাঁর চিত্রশিল্পের স্বভাব সিদ্ধিতে উপনীত। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে কলাময় ও ছন্দময় গতি হরফের প্রকাশকে যেন জীবন্ত করে তুলে। মোটকথা, তাঁর শৈলীনির্ভর ক্যালিগ্রাফিগুলো সত্যিই অসাধারণ। তিনি সুলুস, নাসখী, দিওয়ানী, রুকআ'হ ও তুঘরা প্রভৃতি শৈলীতে নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি সুষম রঙের সমন্বয়ে ডিজাইন তৈরি করে দিওয়ানী লিপিতে 'ইন্নাকা 'আলা খুলুকিন আযীম' এবং আরেকটি ক্যালিগ্রাফিতে 'সুরা ফাতিহা'র উপস্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর উন্নত শিল্প অভিজ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে।[৩৬] তাঁর নির্মিত 'রাব্বি যিদনী ইলমা' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি কাগজে এক্রিলিক সুলুস রীতিতে বেশ চমৎকার হয়েছে। তিনি 'স্বাগতম' শিরোনামে মিশ্র মাধ্যমে এবং দিওয়ানী রীতিতে ছুরির মাধ্যমে 'আহলান-সাহলান' বেশ চমৎকার এঁকেছেন। 'আলো' শিরোনামের হ্যান্ডমেড পেপারে, এক্রিলিক মাধ্যমে নাসতা'লিক ধারায় অঙ্কিত কাজটি সত্যিই অসাধারণ। গুণ ও মেধার মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি শিল্পী হিসেবে তিনি বেশ উঁচু আসনে অবস্থান করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন- 'শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী নির্ভেজাল আরবী ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন। কখনো রঙের মাঝে সাদা স্পেস বা জমিন রেখেই সেই জমিনে স্পষ্টভাবে আরবী হরফগুলো উপস্থাপন করেন।' আবার কখনও পুরো জমিনে বিভিন্ন ধরনের হালকা রঙ ব্যবহার করে তার উপর বর্ণবিন্যাস করেন। প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী তুঘরা রীতিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ ক্যালিগ্রাফির পটভূমিতে লতা-পাতা ও ফুলের নক্শা দেখা যায়।[৩৭] আরবী হরফের অলৌকিক রূপব্যঞ্জনা রয়েছে তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে। ট্রাডিশনাল রীতিতে করা তাঁর ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মগুলো অসামান্য রূপমাধুর্যে সমৃদ্ধ। তিনি ১৪ এপ্রিল ২০১৬ সালে পরপারে পাড়ি জমান।

২.১.১২ ভাস্কর রাসা (জ. ১৯৫৭ খ্রি.)

ভাস্কর রাসা বাংলাদেশের একজন ব্যতিক্রমধর্মী ক্যালিগ্রাফার। তিনি ১৮ মে ১৯৫৭ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মিয়া আব্দুল মালেক। একাডেমিক শিক্ষায় তেমন অগ্রসর না হলেও তিনি ১৯৮০ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (বাফা) থেকে ভাস্কর্যে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেছেন। পাশাপাশি তিনি শিল্প বিষয়ক প্রচুর পড়াশুনা করেছেন। মূলত তিনি ভাস্কর্য নির্মাণে ও নির্বস্তুক[৩৮] সাধনায় ব্যস্ত রয়েছেন। তিনি দেশে-বিদেশে আয়োজিত শিল্পকলার অসংখ্য প্রদর্শনীতে

---

[৩৬] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯।

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯।

[৩৮] নির্বস্তুক শিল্পকলা: A term applied to 20th century plasict arts in which form and colour proceses aesthetic value apart from the subject. The idea is ancient, abstract design being found in the neolithic period, in folk-art and particuarly in Moslem art. (Pears Cyclop-q, 78 Edition,1969), p.12)

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বহুবার পুরস্কৃতও হয়েছেন। শিল্পনির্মাণে তিনি যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ক্যানভাস ছাড়াও ভাস্কর্য ও ম্যুরালে তাঁর ক্যালিগ্রাফি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর ত্রি-মাত্রিক ধারায় নির্মিত 'মুহাম্মদ' শীর্ষক ভাস্কর্যরূপ ক্যালিগ্রাফি শিল্পাঙ্গনে বেশ আলোড়িত হয়েছে।

চিত্র-৬৮: ভাস্কর রাসার কাঠখোদাই ক্যালিগ্রাফি

তিনি পঞ্চম জাতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনী, ১ম, ২য় ও ৩য় জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৫ম ও ৬ষ্ঠ জাতীয় তরুণ শিল্পীদের প্রদর্শনী, জাপানের ফুকুয়াকায় অনুষ্ঠিত '২য় এশিয়ান শিল্পকলা প্রদর্শনী', কোরিয়ার সিউলের ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব মডার্ণ আর্ট-এ 'কনটেম্পোরারি এশিয়ান আর্ট শো' এবং ভারতের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত '৬ষ্ঠ ত্রি-বার্ষিক প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন। ২০০২ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে ভাস্কর রাসরা ভাস্কর্যের রূপায়নে নির্মিত ক্যালিগ্রাফি দর্শক মহলে সাড়া ফেলে।[৩৯] পঞ্চম জাতীয় তরুণ শিল্পীদের প্রদর্শনীতে ভাস্কর্যে 'বেস্ট এ্যাওয়ার্ড', দ্বিতীয় দ্বি-বার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনীতে 'গোল্ড মেডেল' এবং জাতীয় জাতীয় শিল্পকলা প্রদর্শনীতে 'অনারেবল মেনশন এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তিতে ১০-১৩ এপ্রিল ২০০২ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তাঁর একক শিল্পকর্ম প্রদর্শন করেন। এসব শিল্পকর্মে ক্যালিগ্রাফির ব্যাঞ্জনা দৃশ্যমান। তিনি বাংলা ও আরবী বর্ণমালাকে তাঁর ভাস্কর্যকর্মে নিয়ে এসেছেন ক্যালিগ্রাফিক ধাঁচে। তিনি তাঁর বাংলা বর্ণমালার শিল্পায়নে কখনও সরল, কখনও জটিল কর্মের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কাঠখোদাই করে তাঁর বাংলা লিপিকলা একটি ভিন্নধর্মী শিল্পনিরীক্ষা।

---

[৩৯] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ভাস্কর্যকে শিল্পমাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ক্যালিগ্রাফিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন এবং এ বিষয়ে অনেক লেখাও রচনা করেছেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে কয়েকটি মসজিদে রাসা ইসলামী ক্যালিগ্রাফি অলঙ্করণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবত বাংলা বর্ণমালা নিয়েও ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন। শিল্পের আদিম এ বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে তিনি এককভাবে মনোসংযোগ করেছেন এবং তিনি এর ব্যবহারে অনবরত সৃষ্টি করে চলেছেন মহান সব শিল্পকর্ম। তিনি বাংলা বর্ণমালা ও সিলেট অঞ্চলের মৃৎভাষা 'নাগরী' এর উপর অনুশীলনের মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি চর্চার সূচনা করেন। পরে তিনি তাঁর নিজস্ব ধারায় আরবী, ইংরেজি, রাশিয়ান, ফরাসী ও ভূটানী ভাষার বর্ণমালা নিয়ে দীর্ঘ সাধনা করেন। অ, আ থেকে শুরু করে সকল বাংলা অক্ষর দিয়ে তিনি ভাস্কর্য গড়েছেন। আকার কিংবা একার কিছুই তাঁর কাছে নগণ্য নয়। এভাবে তিনি পরিশীলিত ও বিশুদ্ধ ধারার শিল্প নির্মাণে আপ্রাণ সাধনা করে যাচ্ছেন। সৃজনশীল এ শিল্পী বর্তমানে বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে বেশ নাম করেছেন। তাঁর নির্মিত ক্যালিগ্রাফি জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বুলবুল লতিকলা একাডেমি, জনতা ব্যাংক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, Channel-I, BRAC, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক, O S Manpower, কবির ফাউন্ডেশন-এর অফিসসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সংগৃহীত রয়েছে।

২.১.১৩ শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ (জ. ১৯৫৭ খ্রি.)

শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ বাংলাদেশের একজন ব্যতিক্রমধর্মী ক্যালিগ্রাফার। তিনি ১৯৫৭ সালে ফেনী জেলার মহুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল মালেক ও মাতার নাম সালেহা বেগম। তিনি ঢাকার সরকারী তিতুমীর কলেজ হতে বিএ পাশ করেন। তিনি শিল্পকলা বিষয়ে একাডেমিক শিক্ষা গ্রহণ না করেও বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে নিজের অবস্থানকে মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আশির দশকে একটি এনজিওতে ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তখন থেকে চাকুরীর দায় থেকেই বিখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর কাছে টানা তিন বছর নক্‌শাকলার পাঠ গ্রহণ করেন। তাই তাঁর ক্যালিগ্রাফিগুলোর অধিকাংশই নক্‌শা নির্ভর।[৪০]

তিনি ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে এবং একই বছর নভেম্বরে ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বেঙ্গল গ্যালারিতে 'একক প্রদর্শনী' এর আয়োজন করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে ইরান কালচারাল সেন্টার ও আল-কুরআন রিসার্চ একাডেমি আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে পবিত্র কুরআন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৮ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে 'পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০৩ সালে বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি কর্তৃক বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত এবং ২০০৫ সালে আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে ইরানের তেহরানে পবিত্র কুরআনের ১৪তম প্রদর্শনী এবং ২০০৭ সালে ইরানী কালচারাল সেন্টার আয়োজিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে 'বিসমিল্লাহ প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম বঙ্গভবন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এপেক্স গ্রুপ ও ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এ সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে তিনি ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এ কর্মরত এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সদস্য।

চিত্র-৬৯: ফুলেল নক্‌শায় ফেরদৌসির ক্যালিগ্রাফি

শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ স্বীয় কর্মে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি মেহেদী পাতার রস দিয়ে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- দেশীয় অলঙ্করণের ব্যবহার। তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে শিল্পরসিক ও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্যালিগ্রাফি

...৫।

Dhaka University Institutional Repository

জগতে ২০০২ সালে তাঁর আবির্ভাব হলেও মূলত ১৯৯২ সাল থেকেই তিনি কুরআন লেখার কাজে জড়িত। ১৯৯৭ সালে ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে, 'ইরানী কালচারাল সেন্টার' আয়োজিত প্রদর্শনীতে তাঁর লেখা সম্পূর্ণ একটি কুরআন প্রদর্শিত হয়। ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে এটিই ছিল তাঁর প্রথম অংশগ্রহণ। এ প্রদর্শনীতে তাঁর বেশ কিছু শিল্পকর্ম বিক্রিও হয়। এরপর থেকে ধীরে ধীরে তিনি ক্যালিগ্রাফির প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি নিজ হাতে পবিত্র কুরআন শরীফের দু'কপি অনুলিপি তৈরী করেছেন, যা ২০০১ সালে জাতীয় জাদুঘরে প্রধান গ্যালারিতে প্রথমবারের মত বেসরকারী উদ্যোগে প্রদর্শিত হয়। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত সহযোগে যে পবিত্র চিত্রাবলির সৃষ্টি করেন, তাতে তিনি ব্যবহার করেন একটি বৃক্ষের পাতার রস। যে বৃক্ষের পাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও চিরসবুজ। এ বৃক্ষকে 'হেনা' ফুলের গাছ বলে অভিধানে উল্লেখ করা হয়। তিনি তাঁর চিত্রে এ মেহেদী পাতার নিঃসারিত রস সুকৌশলে ব্যবহার করেন।

চিত্র-৭০: শিল্পী ফেরদৌস আরার ক্যালিগ্রাফি 'আস-সালামু আলাইকুম'

বাংলাদেশের নারী শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত তিনি-ই সর্বপ্রথম, যিনি মেহেদী পাতার রসে সযত্নে দৃষ্টিনন্দন ক্যালিগ্রাফি অঙ্কন করেন। তাঁর সিংহভাগ শিল্পকর্মের চারদিকে নয়নাভিরাম, ক্ষুদ্র লতা-পাতা ও সুক্ষ্ম নক্শায় অলঙ্কৃত দেখা যায়।[৪১] তাই কুফী, নাসখী, তা'লিক, নাসতা'লিক ও ঘুবার রীতি ব্যবহার করে অসংখ্য ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন মেহেদী পাতার রস থেকে আহরিত রঙ তৈরি করে বিভিন্ন আকারে বাঁশের তৈরি কলমের সাহায্যে দক্ষতার সাথে তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে বর্ণলেখনী ও পেলব রেখা চিত্র করে। তিনি বলেন, মেহেদী পাতার বিষয়টি আমাদের জীবনের সাথে অনেকটাই ঘনিষ্ট। কারো হাতে মেহেদী রঙে নক্শা-ফুল-আলপনা ইত্যাদি করার সময় মাঝে মধ্যেই এটি

[৪১] *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে অভিন্ন কিছু একটা করার ইচ্ছা জাগে। আর এ ইচ্ছাটা আমি কুরআনের অনুলিখনেই আমি প্রথম ব্যবহার করি।[৪২]

তাঁর ক্যালিগ্রাফি নিয়ে ড. এ. কে. এম ইয়াকুব আলী বলেন, 'ফেরদৌস-আরা আহমেদ মেহেদী রঙে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আল-কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এসব ক্যালিগ্রাফিতে আল্লাহর অসীম জ্ঞানের উপর আলোকপাত করে। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপন রীতি সত্যিই প্রশংসনীয়।'[৪৩]

২.১.১৪ শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল (জ. ১৯৫৮ খ্রি.)

শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল একজন প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল ক্যালিগ্রাফার। তিনি ১৯৫৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল বারী মন্ডল। তিনি ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে 'ড্রইং এন্ড পেইন্টিং'-এ মাস্টার্স পাশ করেন। ক্যালিগ্রাফির প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করে তিনি মাস্টার্স-এ 'বাংলাদেশের শিল্পকলায় ইসলামী প্রভাব' শীর্ষক অতিসন্দর্ভ রচনা করেন। তাছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ১৯৮২ সালে তিন মাসব্যাপী 'এচিং এন্ড এনগ্রেভিং'-এর উপর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় যে সংগঠন পথিকৃতের ভূমিকায় রয়েছে, সেই ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর তিনি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২০১৭ সালে তিনি আরো কতিপয় প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের নিয়ে বাংলাদেশ চারুশিল্পী পরিষদ নামে তিনি আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[৪২] *ক্যাটালগ: শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদের দ্বিতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৯, পৃ.৭।

[৪৩] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৭১: ইব্রাহীম মন্ডলের আঁকা কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি

ইব্রাহীম মন্ডল ১৯৯৯ সালে জাতীয় জাদুঘরে একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৯৭৬ সালে জাতীয় খেলাঘর, ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রদর্শনী, ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত 'ন্যাশনাল ইয়ুথ আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৭৭-৮৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সকল 'বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী', ১৯৯৩ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত 'কার্টুন প্রদর্শনী' এবং একই বছরে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত 'কার্টুন প্রদর্শনী', সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৮ সালে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'র আয়োজক ছিলেন এবং নিজে এসব ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণও করেন। ২০০১ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০৫ সালে আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদশনী'তে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফির সুনাম ছড়িয়ে পড়লে ২০০১ সালে ইরান সরকারের আমন্ত্রণে তিনি 'নবম ইন্টারন্যাশনাল ক্যালিগ্রাফি এক্সিবিশন এন্ড সেমিনার'-এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি ক্যালিগ্রাফি ও শিল্পকলা চর্চায় অবদান রাখায় ১৯৮১ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' এবং ২০০১ সালে 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ পুরস্কার' লাভ করেন। এ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় তাঁর প্রায় অর্ধশত ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক লেখা প্রকাশ পেয়েছে।

চিত্র-৭২: শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের ক্যালিগ্রাফি 'আল্লাহু আকবার'

তিনি ক্যালিগ্রাফির পাশাপাশি একজন খ্যাতিমান কার্টুনিস্ট। তিনি 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার স্টাফ আর্টিস্ট ও কার্টুনিস্ট এবং কার্টুন বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন 'নয়া চাবুক'-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

পালন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকাস্থ মানারাত ইন্টারন্যাশন্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর ‘আর্ট এন্ড পেইন্টিং’-এর শিক্ষক এবং চিত্রণ গ্রাফিক্সের ডিজাইনার। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিচার্স একাডেমি, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেড, বাংলাদেশ টোব্যাকো, খুলনা ক্যান্টনমেন্ট, রিয়াজ গার্মেন্টস, ফুয়াদ আল-খতিব হাসপাতাল এবং বহির্বিশ্বের মধ্যে যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া ও ইরানে সংরক্ষিত আছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় এবং এদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের অগ্রসরমানতায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কারণ বিগত কয়েক বছর যাবত যেসব প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাঁর অধিকাংশই আয়োজন করে বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি। আর তিনি হলেন এ সংগঠনের সভাপতি। তিনি ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ-এর আজীবন সদস্য।

তাঁর আরবী ও বাংলা ক্যালিগ্রাফি অত্যন্ত চমকপ্রদ। বিভিন্ন রঙের সুষম সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তেল রঙ ও গোয়াস মাধ্যমে আরবী ক্যালিগ্রাফিতে কুরআনের আয়াত এবং বাংলা ক্যালিগ্রাফিতে ‘বাংলা ভাষা মায়ের ভাষা’ প্রবচন অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও সজীব করে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে লতা-পাতা ও দেশজ উপাদানের উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায়।[৪৪] উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার ও বর্ণচ্ছটা দিয়ে তিনি ক্যালিগ্রাফিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম দর্শকের হৃদয়ে একটা সুদৃঢ় অবস্থান করে নিয়েছে। এগুলোকে আরবী লিপিশৈলী সুলুস রীতির অন্তর্গত মাহী রূপের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা সুলুস লিপির ক্যালিগ্রাফিতে মাছ রূপের ছটা থাকলে তাকে শিল্পবিশারদের বিচারে মাহী রীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিল্পীর শৈল্পিক বোধ এ সকল চিত্রে চমৎকারভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আল্লাহর কালাম পাঠসহ এসব চিত্রে আল্লাহর মহিমা ও উপলব্ধি করা সম্ভব। তিনি ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’কে চিত্রের মাধ্যমে পাখিরূপে দেখিয়েছেন। মাছ, পাখি ও ময়ূরী এ ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এমন চিত্র তাউস রীতির ক্যালিগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত করা

---

[৪৪] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

Dhaka University Institutional Repository

যায়। যা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষণীয়রূপে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি আরবী হরফের কৌণিক ভঙ্গিকে সামনে রেখে লম্ব ও আনুভূমিক চরিত্রে কম্পোজিশন নির্মাণ করেছেন। ক্যানভাসে আলতো আঁচড় কেটে বর্ণমালার আদল এঁকে দৃষ্টিনন্দন ও ভারসাম্য রচনার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর আরেকটি ছবি দর্শকদের প্রাণ জুড়িয়েছে। রিয়েলস্টিকধর্মী নরম রঙের এ কাজে তিনি শহীদের রক্তাক্ত আকৃতি এঁকেছেন। আবছা ধোঁয়াটে মেঘের আড়াল থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কী বলতে চেয়েছেন। পুঞ্জ পুঞ্জ শ্বেত-শুভ্র মেঘ, দূরের গাঢ় নীলিমা তার ভেতর দিয়ে অনন্তে উঁড়ে যাচ্ছে সবুজ ডানার পাখি। 'যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না' পবিত্র কুরআনের এ আয়াতকে ছন্দায়িত ভঙ্গিতে এঁকেছেন। তাঁর সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বলেন- 'বিমূর্ত রেখাঙ্কনের সাহায্যে এবং বিচিত্র বর্ণের প্রলেপে আরবী অক্ষরগুলো তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। রেখার ঊর্ধ্ব-অধঃভঙ্গি কখনও সমান্তরাল রেখাঙ্কন, আবার কখনও একটি অক্ষরের অন্তরূপটা প্রবহমান রেখে তিনি তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে সমতা বিধান করেছেন। নাসতা'লিক এবং কুফী অক্ষর বিন্যাসের পদ্ধতি ভাঙচুর করে তিনি যে লীলা-বৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই অনুপম'।[৪৫]

২.১.১৫ শিল্পী আরিফুর রহমান (জ. ১৯৫৯ খ্রি.)

শিল্পী আরিফুর রহমান বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার। তিনি ১৯৫৯ সালে ১ জুন বরিশাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ হতে ১৯৮২ সালে অনার্স ও ১৯৮৩ সালে মাস্টার্স পাশ করেন। চারুকলায় তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা ডিগ্রি না থাকলেও তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে আসছেন। তিনি ২০০০ সালের জুন মাসে জাতীয় জাদুঘর, সেপ্টেম্বরে সুলেমান হল সিলেট, ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর ও ২০০২ সালের মে মাসে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'র আয়োজন করেন।

---

[৪৫] *আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালে ইরানের তেহরানে 'ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ক্যালিগ্রাফি ফেস্টিভ্যাল'-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর যাত্রা শুরু হয়। তারপর ১৯৯৯ সালে ইরানে 'ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার' এবং ২০০৭ সালে ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক কুরআন প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯৮, ২০০০, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০০ সালে জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'কুরআন ফেয়ার, ২০০১ সালে বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম আয়োজিত 'যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০২ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী বিশ্বে ক্যালিগ্রাফি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ২০০৪ সালে 'দ্বি-বার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত 'শিল্পকলা প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আরবী ক্যালিগ্রাফিতে সিদ্ধহস্ত। পাশাপাশি বাংলা ক্যালিগ্রাফির প্রথম পর্যায়ে তিনি সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। ১৪০৭ বাংলা সনের ১ বৈশাখ ঢাকার আজিজ সুপার মার্কেটে তাঁর প্রথম বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার পরপরই তাঁর এ আয়োজন মাতৃভাষা প্রেমের পরিচয় বহন করে। ২০০৩ সালে জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৪ সালে একাদশ দ্বি-বার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলায় বন্যার্তদের সাহায্যার্থে আয়োজিত প্রদর্শনী ও এটিএন বাংলা কর্তৃক হোটেল শেরাটনে আয়োজিত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া ২০০৫ সালে জাতীয় জাদুঘরে 'কুরআন প্রদর্শনী' ও বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ২০০৮ সালের মার্চ মাসে বরিশালের এ. কে. টাউন হলে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পেইন্টিং ও লিপিশৈলী ভিত্তিক আট শতাধিক ক্যালিগ্রাফি অঙ্কন করেছেন এবং সাত সহস্রাধিক সৃজনশীল গ্রন্থ ও ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ ডিজাইন করেছেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি জাতীয় জাদুঘর, তেহরান মিউজিয়াম এন্ড কন্টেম্পোরারি আর্টস, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ফারইস্ট ইসলামী ইন্সুরেন্স লিমিটেড, ইসলামিক কমার্শিয়াল ইন্সুরেন্স লিমিটেড, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ইয়ুথ গ্রুপ, যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, ইরান, দুবাই, মালয়েশিয়া ও ভারতে সংরক্ষিত আছে। তিনি বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি শিল্পী সংসদ-এর আহবায়ক, ত্রৈমাসিক 'ক্যালিগ্রাফি'র প্রধান সম্পাদক এবং কালার ক্রিয়েশন-এর শিল্প নির্দেশক।[৪৬] ইতোপূর্বে তিনি দৈনিক জনতা, দিনকাল ও মিল্লাতে স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চিত্র-৭৩: শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি 'ত্বা-সীন-মীম'

আরিফুর রহমানের করা তাঁর প্রায় সকল ক্যালিগ্রাফি-ই শৈলীভিত্তিক। আরবী বর্ণের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তিনি বিভিন্ন বর্ণমালার ক্যানভাস সাজান। ওয়াটার কালার, এক্রিলিকসহ কম্পিউটার মাধ্যমে তাঁর অনেকগুলো ক্যালিগ্রাফি রয়েছে। তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে শিল্পী সবিহ্-উল আলম বলেন- 'শিল্পী আরিফুর রহমান আরবী হস্তলিখন শিল্পের অন্তমাধুর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আরবী হস্তলিখন চর্চা করছেন। তিনি তাঁর মেধা ও শ্রম দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলতে প্রয়াস চালাচ্ছেন।' তাঁর নির্মিত 'এক তবে সবখানে' শিরোনামের ছবিটি আধ্যাত্মিক চৈতন্যের প্রতীকী উপস্থাপন। কাজটি অপূর্ব ও সুষমামণ্ডিত। তিনি ক্যানভাসে এক্রিলিক মাধ্যমে ইরানিয়ান রীতিতে কাজটি সম্পন্ন করেছেন। 'রহস্যময়-৪' শিরোনামের ছবিটি ভয়ের গঠন নিয়ে নিরীক্ষাধর্মী কাজ।

---

[৪৬] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কয়েক বছর আগে 'সিক্রেট ম্যাসেজ' শিরোনামে একটু ভিন্নভাবে ভিন্ন আঙ্গিকের শিল্পকর্ম করেছেন। এখানে প্রচলিত ডেকোরেটিভ থিম পরিহার করে আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরার সূচনাশব্দ চিত্রিত করা হয়েছে। এমন ধারা নিয়ে তিনি অনেক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন এবং একপর্যায়ে হরফ বিন্যাস নিয়ে ভাবতে থাকেন। হরফকেন্দ্রিক চিন্তা তাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলে। দীর্ঘ চিন্তার পর তিনি শুরু করেন আলিফ এর বিচিত্র বিন্যাস।[৪৭] এছাড়া তিনি সাতটি ক্যানভাসের একক আবদ্ধতায় 'আল্লাহ', 'মুহাম্মদ' ও 'বাসমালাহ' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেছেন। যার বিষয় ভাবনাটা অভিনব ও নান্দনিকতায় প্রোজ্জ্বল। তিনি পানিরঙ, তেলরঙ, পোস্টার রঙ ও এচিং-এ ক্যালিগ্রাফি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তিনি কাঠখোদাই এর মাধ্যমেও কাজ করেছেন। ১৯৯৯ সালে সপ্তম 'ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার'-এ প্রদর্শিত তাঁর ক্যালিগ্রাফির কালার কম্পোজিশন সম্পর্কে ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. খাতামী ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ড. আতাউল্লাহ মোহাজেরানী ভুঁয়সী প্রশংসা করেন। তাছাড়া ইরানের জাতীয় টিভি চ্যানেলসহ ৪টি টিভি চ্যানলে তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। এতে তিনি বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চার অবস্থান, সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন।[৪৮]

চিত্র-৭৪: শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি 'আলহামদুলিল্লাহ'

তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে গ্রাফিক্সের সংযোজন, বহুমাত্রিক পারসপেক্টিভ, কম্পোজিশন ও রঙের ব্যবহারে যথাযথ শিল্পবোধ সমকালীন ক্যালিগ্রাফারদের চেয়ে স্বতন্ত্র মনে হয়। তিনি নিজস্ব কনসেপ্টে বিভিন্নভাবে বাংলা লিপির অভিনব উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বাংলা ক্যালিগ্রাফিকেও আন্তর্জাতিক মানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি গাঢ় ও হালকা খয়েরী রঙের দৃশ্যপটে ক্যানভাসে এক্রিলিক মাধ্যমে কুফী লিপিতে 'আল্লাহ' শব্দের উপস্থাপনকে মনোমুগ্ধকর

---

[৪৭] *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি, ২০০৬), পৃ.২১।
[৪৮] *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী* (ঢাকা: ২০০০), পৃ.৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ সৃষ্টিতে সাফল্য অর্জন করেছেন। এছাড়া লাল, নীল আসমানী ও সংমিশ্রিত রঙের দ্বারা প্রেক্ষিত তৈরি করে ক্যানভাসে আল-কুরআনের রহস্যময় হরফ 'হা-মীম' উপস্থাপন করে বেশ চমক সৃষ্টি করেন। ডিজিটাল পেইন্টিং মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তিনি ধুসর রঙের পোস্টকার্ড সাইজের অভ্যন্তরে একটি চতুস্কোণী ক্যানেলে গাঢ় নীল রঙের দ্যুতিতে সোনালি ও নীল রঙ ব্যবহার করে সুলুস লিপিতে 'ইন্নাল্লাহা 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৪৯]

২.১.১৬ শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন (জ. ১৯৬৪ খ্রি.)

শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন নিভৃতচারী, একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ এক শিল্পী। তিনি ১৯৬৪ সালে ১ জানুয়ারি বগুড়া জেলার শিকারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুর রহমান সরকার। ১৯৮৭ সালে তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমি হতে 'ডিপ্লোমা ইন ফাইন আর্টস' এবং ১৯৯২ সালে বগুড়ার মডার্ন ট্রেনিং একাডেমি হতে 'ডিপ্লোমা ইন গ্রাফিক্স' ডিগ্রি লাভ করেন। তাছাড়া ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত চারমাস ব্যাপী 'এচিং এন্ড এনগ্রেভিং' বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমিতে তরুণ শিল্পীদের শিল্পকলা প্রদর্শনী, ২০০০ সালে বগুড়া শিল্পকলা একাডেমি, ২০০১ সালে বগুড়া জেলা পরিষদে অনুষ্ঠিত 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এবং ২০০৮ সালে ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের উদ্যোগে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে আয়োজিত একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত 'ইয়ং আর্টিস্ট এক্সিবিশন' ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সালে বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, ২০০২ সালে ইরানের তেহরানে 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং দশম আন্তর্জাতিক কুরআন ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত 'পঞ্চদশ ন্যাশনাল এক্সিবিশন' এবং জাতীয় জাদুঘরে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

---

[৪৯] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪।

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজিত, ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৮ সালে যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ২০০4 ও ০৭ সালে জাতীয় জাদুঘরে পবিত্র কুরআনের উপর 'বাংলাদেশ ও ইরানের গ্রুপ প্রদর্শনী' ২০০৫ সালে শিশু একাডেমির লবিতে এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।[৫০]

চিত্র-৭৫: শিল্পী আমিনুল ইসলামের ক্যালিগ্রাফি 'বিসমিল্লাহ'

তিনি ১৯৮৬ সালে ড্রইং এন্ড পেইন্টিং-এ 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমি পদক' এবং ২০০৫ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় হতে পেইন্টিং সমবায় বিষয়ক পদক লাভ করেন। তিনি এ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেছেন এবং পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ ও জার্নালে প্রচ্ছদ করেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেড, গ্যাস্ট্রো লিভার ক্লিনিক, ইবনে সিনা ক্লিনিক, দৈনিক যুগান্তর, নবপুঁথিঘর প্রকাশনী, পারটেক্স গ্রুপ, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাস, আর. কে টেক্সটাইল, ধানমন্ডি হাসপাতাল, সেন্ট্রাল হাসপাতাল, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পাকিস্তানের পাঞ্জাব পাবলিক লাইব্রেরি, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, ওমান, বাহরাইন, দুবাই, কুয়েত ও ভারতে সংগৃহীত রয়েছে। তিনি ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সদস্য ও ইসলামিক আর্টস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর আজীবন সদস্য এবং আল-কুরআন রিসার্চ একাডেমি, ঢাকা এর উপদেষ্টা। তাছাড়া তিনি 'দৈনিক চাঁদনি বাজার' পত্রিকার স্টাফ আর্টিস্ট, এড ইন্টার ও মৌসুমী এডভারটাইজিং-এর সিনিয়র আর্টিস্ট এবং 'শিল্পায়ন আর্ট গ্যালারি এন্ড গ্রাফিক্স'-এর শিল্প নির্দেশক ও পরিচালক এবং ক্যালিগ্রাফিক আর্ট-এর সহ সম্পাদক।[৫১]

---

[৫০] *আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২।
[৫১] *ক্যাটালগ: ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৩, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা, পৃ.১৭।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৭৬: শিল্পী আমিনের বিজ্ঞানভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি

তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে বিষয়ভিত্তিক ও বিজ্ঞানের সচিত্র ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর শিল্পকর্ম যেন কুরআনের আয়াতের তাফসীর। ভবিষ্যতে তিনি মেটালে পবিত্র কুরআনের ক্যালিগ্রাফি করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি বিজ্ঞানের সাথে আধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ে শিল্প নির্মাণ করে ক্যালিগ্রাফি অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করেন। শৈলী নির্ভরতার গতিময় শাসনের সাথে বাক্যের ভাব ও মর্মকথার সম্মিলন ঘটিয়ে প্রতিটি ক্যানভাসের জমিনকে সাজিয়ে তুলেন। তিনি সূরা ফাতিহা, সূরা 'আলাক ও কালিমাকে আরবী হরফের অপূর্ব সংমিশ্রণে প্রকাশ করেছেন, যা দর্শকদেরকে সহজেই আকর্ষণ করে। পবিত্র কুরআনের আয়াতকে বিজ্ঞানের বাস্তব ধারণার প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর শিল্পকর্মে।

অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম বলেন- 'তাঁর ক্যালিগ্রাফি ট্রাডিশনাল ফন্ট, কালার কম্পোজিশন এবং গ্রামারিটিক্যাল সেন্স খুবই চমৎকার। তাঁর শিল্প যেন বিশাল ধৈর্যের প্রতিফলন। তাঁর সাধনা ও একাগ্রতা তাকে নিয়ে এসেছে সাফল্যের দুয়ারে। তাঁর শিল্পচেতনা, আবেগ, অনুভূতি ও বুদ্ধিদীপ্তের মাঝে প্রথম ধাপ পারিপার্শ্বিক বাঁধার সীমানা পেরিয়ে শিল্পের মাঝে তাঁর আত্মিক সৌন্দর্য ও সুক্ষ্মতার এমন এক জগত সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর আগে দেশে কোন ক্যালিগ্রাফিতে এমনটি দেখা যায়নি। তাঁর ক্যালিগ্রাফি শিল্পে সৌন্দর্যের ক্লাসিক মাত্রাকে ছাড়িয়ে এদেশের ক্যালিগ্রাফিকে আন্তর্জাতিকমানের পর্যায়ে সমৃদ্ধ করেছে। এ দেশের ক্যালিগ্রাফি শিল্প আন্দোলনে তিনি একজন পথিকৃতের মতই ভূমিকা পালন করে চলেছেন।'[৫২] বিভিন্ন প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত

---

[৫২] *ক্যাটালগ: আমিনুল ইসলাম আমিন-এর ৩য় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮*, ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকর্মের মধ্যে তেলরঙ, এক্রিলিক, পানিরঙ, নিব স্কেচ ও পেন্সিল স্কেচের কাজ রয়েছে। তাঁর অঙ্কন কৌশল অত্যন্ত সুচিন্তিত। তাঁর অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, রঙের মাধ্যমে সুক্ষ্ম দার্শনিক বিশ্লেষণ, যে কোন শিল্পবোদ্ধাকে ভাবিয়ে তুলে। তাঁর প্রতিটি কাজ অধ্যাবসায়ের এক বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে কী যেন এক শিল্প আমেজ সবাইকে আন্দোলিত করে।

তিনি ক্যালিগ্রাফির মাঝে মাতৃগর্ভে সন্তানের জন্মবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের ছবির সাথে কুরআনের আয়াতের শৈল্পিক মিশ্রণে আঁকা তাঁর 'জন্ম বিবর্তন' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফিটি গুণীজনের ব্যাপক প্রশংসা কুঁড়িয়েছে। তিনি তাঁর ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে কুরআন, বিজ্ঞান ও শিল্প এ তিনটি দর্শনেরই সফল সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাছাড়া ভাস্কর্য জগতেও তাঁর দীপ্ত পদচারণা বিদ্যমান। সম্পূর্ণ স্টিল ও আরবী লিপিখচিত কাঁচে নির্মিত 'ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ' শীর্ষক তাঁর পানির ফোয়ারা ও আলোকসজ্জা বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফি ভাস্কর্যটি তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে। এটি তাঁর একটি ব্যতিক্রমী শিল্পপ্রয়াস। 'Proposed Islamic Art Museum' Layout-টি তাঁর অসম্ভব পরিশ্রম, সাধনা ও স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ। যাতে কুরআনের ১১৪টি সূরা অনুসারে ১১৪টি কক্ষ থাকবে। দর্শকরা বিসমিল্লাহ গেট দিয়ে প্রবেশ করে প্রথমে সূরা ফাতিহা কক্ষ, তারপর সূরা বাকারা কক্ষ এভাবে সূরা নাস কক্ষ দিয়ে বের হবে। সংশ্লিষ্ট সূরার কক্ষে ঐ সূরার আয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ক্যালিগ্রাফিকর্মে প্রস্ফুটিত হবে। এভাবে জাদুঘরটিতে পবিত্র কুরআনের ৬৬৬৬টি আয়াতের সচিত্র ব্যাখ্যা থাকবে।[৫৩] বাংলা ক্যালিগ্রাফি নির্মাণে তাঁর রয়েছে সমান দক্ষতা। শহীদ মিনারের স্মৃতি বিজড়িত দৃশ্যের সাথে 'মোদের গরব মোদের আশা'র ভাবগত সমন্বয় সাধনে এবং মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের মিছিলের মাঝে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানের শৈল্পিক ব্যাঞ্জনায় যেসব ক্যালিগ্রাফি তিনি নির্মাণ করেছেন বাংলা ক্যালিগ্রাফির অ্যালবামে তো বটেই ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তা অমর হয়ে থাকবে।[৫৪]

---

৫৩ *নতুন ধারার ক্যালিগ্রাফার আমিনুল ইসলাম*, শাকের হোসাইন শিবলী, দৈনিক যুগান্তর।

৫৪ *ইসলামী শিল্পকলা*, সম্পাদনায়-ড. নাজিম উদ্দীন আহমদ ও ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (ঢাকা: ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন, ২০০৯), পৃ.১৫১-১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

২.১.১৭ শিল্পী বশির মেসবাহ (জ. ১৯৬৪খ্রি.)

শিল্পী বশির মেসবাহ ১৯৬৪ সালে ডিসেম্বরে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদরাসা-ই-নুরিয়া হতে ১৯৮১ সালে হিফজুল কুরআন এবং ১৯৯২ সালে দাওরায়ে হাদিস পাশ করেন। তিনি ২০০২ ও ২০০৬ সালে জাতীয় জাদুঘরে একক এবং ১লা বৈশাখ ১৪০৭ উপলক্ষে আজিজ সুপার মার্কেট প্রাঙ্গণ, ২০০২ সালে জাতীয় জাদুঘরে এবং সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং নভেরা ভাস্কর হলে আয়োজিত বাংলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ পর্যন্ত তিন শতাধিক ক্যালিগ্রাফি অঙ্কন, চার শতাধিক বইয়ের প্রচ্ছদকরণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। শুধু তাই নয় তিনি সম্পূর্ণ কুরআনসহ বহু আরবী ও উর্দূ গ্রন্থ নিজ হাতে লিখেন। তাঁর নির্মিত ক্যালিগ্রাফি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেড ও আজাদ প্রোডাক্টসসহ বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত রয়েছে। বর্তমানে তিনি সালসাবিল এড ফার্ম-এর শিল্প নির্দেশক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি এ পর্যন্ত সৃষ্টির রহস্য, আদর্শ নারী ও আসহাবে কাহাফ নামে ৩টি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।[৫৫] তিনি বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমির একজন সদস্য।

চিত্র-৭৭: শিল্পী বশির মেসবাহ'র ক্যালিগ্রাফি

নিঃসন্দেহে বশির মেসবাহ'র ক্যালিগ্রাফির মান অনেক উঁচু স্তরে। তাঁর শিল্পকর্মে পেইন্টিং-এর তেমন আধিপত্য পরিলক্ষিত না হলেও লিপিশৈলীতে তিনি অনেক অগ্রসর। তিনি পুরোপুরি লিপিনির্ভর হয়ে ক্যালিগ্রাফির শিল্পের মূল ঐতিহ্যকে লালন করেছেন। ক্যালিগ্রাফি চর্চার সূচনা যেহেতু শৈলীনির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাই তাঁর ক্যালিগ্রাফি শিল্পের

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যত খুবই আশাব্যঞ্জক। তাঁর অঙ্কিত ক্যালিগ্রাফির নন্দন সৌকর্য যে কোন দর্শককে অতি সহজেই মুগ্ধ করতে সক্ষম। তিনি আরবী ক্যালিগ্রাফিতে যেমন পারদর্শী, তেমনি বাংলা ক্যালিগ্রাফিতেও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাজে পরিচ্ছন্নভাব বিদ্যমান। তিনি মূলত একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার। তাঁর আরবী মাধ্যমের কাজগুলোতে সুলুস রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বাংলা ক্যালিগ্রাফির থিম আরবী ও ইসলামী ভাবধারায় রচিত। তাঁর বাংলা ক্যালিগ্রাফিতেও আরবী ও ফার্সী ক্যালিগ্রাফির প্রথাগত ধারার সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর 'নিশ্চিত সত্য' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফিটিতে সমান্তরাল ও উর্ধ্ব স্বভাবের নান্দনিকতা পরিলক্ষিত হয়। যেখানে বর্ণগুলো উচ্চতা ও গতিময়তার সীমান্তসত্ত্বায় গভীর হয়ে ওঠে। যার সূচনা কালো দিয়ে হলেও লালের সাথে মিলিত হয়ে হারিয়ে যায় জমাট গভীরতায়। রংটি যখন ক্যানভাসের পরিসরেই সাদার মিশ্রণে সবুজের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। তখনও কিন্তু লাল হতে সবুজাভ উজ্জ্বলতার মাঝে মিনারের উচ্চতায় দাঁড়িয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। দু'টি লাম তখন অন্য হরফগুলোর সাথে সুর মিলায়। তাঁর 'আল্লাহ' লেখা ক্যালিগ্রাফিতে ক্যানভাসে বর্ণগুলো এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, তা সহজেই পাঠযোগ্য। তাঁর অসাধারণ শিল্পহাতের ছোঁয়ায় একটি ভাষার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে তাকে উপস্থাপন করতে পেরেছেন দু'টি ভাষার পাঠক দর্শকদের মাঝে। ধর্মাশ্রয়ী হয়ে যারা শিল্পের আশ্রয় প্রার্থনা করেন তাদের কাছে এমন শিল্পকর্ম পরম আরাধ্যের বিষয়।[৫৬]

তাঁর ক্যালিগ্রাফির ক্যানভাসে বর্ণপ্রয়োগ চিন্তা এবং বাংলা-আরবী লিপির গঠন ও শৈলী দর্শককে সহজেই মুগ্ধ করে। তিনি নীরবে-নিভৃতে অথচ সক্রিয়তার সাথে বিচিত্র সব ক্যালিগ্রাফি করে চলছেন। তিনি শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফির পাশাপাশি বিমূর্ত-আধাবিমূর্ত চিত্রকলার চমৎকার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। বিশুদ্ধ লিপিচর্চার ব্যাপারে তিনি শুরু থেকেই যথেষ্ট যত্নবান। লিপির

---

[৫৬] *ক্যাটালগ: বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪-৫।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রায়নে তাঁর ক্যানভাসের ঘুম ভাঙ্গায় এবং লিপির নির্ভরতায়ই তাঁর চিত্রকর্ম সুসম্পন্ন হয়। জ্যামিতিক আকৃতিকে নির্ণেয় ভেবে আরব বিশ্বে যে ক্যালিগ্রাফির চর্চা রয়েছে, বশির মেসবাহ এ ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতর। তিনি ক্যানভাসে কোন প্রকার জ্যামিতিক ছক না বেধে তাঁর হরফগুলো মুক্ত ও স্বাধীনভাবে ক্যানভাসের এপার থেকে ওপার ভেসে বেড়ায়। অর্ধযুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাংলা ক্যালিগ্রাফিরও চর্চা করে আসছেন। বাংলায় বিচিত্র শৈলীর নির্ভরতায় তাঁর শিল্পকর্ম মাতৃভাষা চর্চার যেন এক অমোঘ উচ্চারণ। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাংলা ক্যালিগ্রাফিকে ডেকোরেটিভ পরিসর থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণই সফল।[৫৭]

২.১.১৮ শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ (জ.১৯৬৮ খ্রি.)

চিত্র-৭৮: কুরআনের আয়তের ক্যালিগ্রাফি- শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ

শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ ১৯৬৮ সালে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এম. হাদীসুর রহমান। তিনি ১৯৮৪ সালে ফাযিল পাশ করেন। তিনি ১৯৮৪-৯১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববরেণ্য চিত্রশিল্পী এস. এম সুলতানের সাহচর্যে অবস্থান এবং তাঁর নেতৃত্বে ১৯৮৯ সালে যশোরের 'চারুপীঠ'-এ পক্ষকাল ব্যাপী পেইন্টিং-এর উপর পক্ষকাল ব্যাপী ওয়ার্কশপে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে যশোর পাবলিক লাইব্রেরিতে বন্যাদূর্গতদের সাহায্যার্থে একক এবং ১৯৯২ সালে যশোর শিল্পকলা একাডেমিতে,

---

[৫৭] *ক্যাটালগ: বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮ ও ১৯৯৫ সালে যশোর পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী এবং ১৯৮৮ সালে এস. এম সুলতান ও মোস্তফা আজিজসহ বরেণ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে অংশ নেন। তিনি ২০০০, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৮ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীসমূহ, ২০০১ সালে বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম এবং ২০০৪ সালে এটিএন বাংলার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে হোটেল শেরাটনে আয়োজিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'তে অংশগ্রহণ করেন। ২০১২ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তারপর ভারতের আজমীর শরীফে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সেখানে সম্মানস্বরূপ লাল পাগড়ি ও ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়। আজমীর শরীফে তাঁর ২০টি শিল্পকর্ম স্থান পায়।[৫৮]

তাঁর নির্মিত ক্যালিগ্রাফি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, প্রাইম ব্যাংক লি., ইবনে সিনা ডি ল্যাব, বার্ডস বাংলাদেশ, জাতীয় জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সংরক্ষিত আছে। তিনি বর্তমানে আইডিয়া কমিউনিকেশন্স-এর থিম মেকার, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সদস্য।[৫৯] প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী এস. এম সুলতানের প্রতিষ্ঠিত চারুপীঠ নামের আঁকাআঁকির প্রতিষ্ঠানের দেখভালের দায়িত্ব পালন করছেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। যাদেরকে ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে ধারণা দিতে সক্ষম হন।

মাহবুব মুর্শিদ উল্লম্ব আনুভূমিক রেখা অঙ্কনে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেছেন। লিখনশিল্পের সৌন্দর্য ও সম্ভাবনা তাঁর শিল্পকর্মে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি তেল-রঙ ও পানি-রঙের মাধ্যমে কাজ করে থাকেন। তাঁর শিল্পকর্মে ক্যালিগ্রাফির অর্থ ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তা বিমূর্ত ঢঙে করতে প্রয়াস চালান। তাঁর ক্যালিগ্রাফি উজ্জ্বল রঙ ব্যবহারে উদ্ভাসিত। তিনি

---

[৫৮] 'ক্যালিগ্রাফি এদেশের মনন ও মানসের শিল্প', শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ এর সাক্ষাৎকার, গ্রহণ করেছেন- সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর, *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ১৭ নভেম্বর ২০১৪, পৃ.১০।

[৫৯] *ক্যাটালগ: ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ট্রাডিশনাল স্টাইলে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে থাকেন। তিনি লাল, হলুদ ও কালো রঙের প্রাধান্য দিয়ে এবং গাঢ় ও গোলাপী সাদা রঙের সমন্বয়ে শেড তৈরি করতেন। রঙের মাধ্যমে নাসখী লিখনশৈলীতে আল-কুরআনের আয়াত এবং কালিমা তাইয়িবা অত্যন্ত মনোরমভাবে তুলে ধরেছেন। এগুলো তাঁর সার্থক সৃষ্টি বলে মনে হয়। উপরন্তু তিনি বাংলাদেশের ফুল ও লতা-পাতার সমাহারে ক্যালিগ্রাফির মধ্যে নৈসর্গিক দৃশ্যের অবতারণার প্রয়াস পেয়েছেন। রঙের মাধ্যমে করা তাঁর 'ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাচ্ছির' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শিল্পকর্ম দু'টি খুবই হৃদয়গ্রাহী। এসব শিল্পকর্ম তাঁর মাঝে লুকায়িত শিল্পসম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।[৬০]

২.১.১৯ শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান (জ.১৯৭১ খ্রি.)

শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইদুল্লাহ খান। তিনি ১৯৮৯ সালে চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ হতে চারুকলার উপর 'প্রি-ডিগ্রি', ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে সিরামিক্স-এ অনার্স এবং ১৯৯৭ সালে মাস্টার্স পাশ করেন। এছাড়া ২০০১ সালের ২৩-২৫ ডিসেম্বর জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'একবিংশ শতাব্দীর জাদুঘর' বিষয়ক ওয়ার্কশপ এবং ২০০৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আয়োজনে বাংলাদেশের ঐতিহ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনী বিষয়ক মাসব্যাপী ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রামের 'নন্দনকানন মুসলিম হলে' বন্যাদূর্গতদের সাহায্যার্থে আয়োজিত 'গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৮৯ সালে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত ছাত্রদের 'গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন', ১৯৯২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে টেরাকোটা মিডিয়ায় অমিত বসাক স্মৃতি সংসদ প্রদর্শনী ও বিভিন্ন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী, ২০০১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান আর্ট বাইনেল বাংলাদেশ' এবং সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে ২০০২, ০৩, ০৪, ০৫ ও ০৮ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও দশম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

---

[৬০] *ক্যাটালগ: ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০২, প্রাগুক্ত, পৃ.৮।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ১৯৯২ সালে টেরাকোটার উপর ‘এনুয়াল আর্ট এক্সিবিশন’-এ ‘অমিত বসাক স্মৃতি পদক’ লাভ করেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের সহকারী ডিসপ্লে অফিসার এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সদস্য।[৬১]

চিত্র-৭৯: শিল্পী নাসির উদ্দিনের বর্ণাঢ্য ক্যালিগ্রাফি

তিনি সিরামিক্সে পড়াশুনা করেন ও বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করে থাকেন। জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত ‘পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী’তে তাঁর তৈল রঙে করা ক্যালিগ্রাফি ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর পটভূমিতে তিনি আরবী হরফগুলোকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেন। তিনি উজ্জ্বল বর্ণেও আধিপত্যে এবং বিচিত্র বর্ণিলতার মাঝে ক্যালিগ্রাফির চমৎকার গীতিময়তা সৃষ্টি করেন। তাঁর নির্মিত ‘ত্বা-হা’, ‘আলিফ-লাম-মীম, ও ‘খালাক’ ক্যালিগ্রাফিগুলো অসীম সম্ভাবনার দুয়ার উম্মোচন করেছে। তাছাড়া তাঁর ১৫x৮ মাপের সিরামিকে ‘মুদহাম্মাতান’ (সবুজ গালিচাযুক্ত বেহেশত) শীর্ষক চার রঙের তৈলচিত্র সত্যিই অসাধারণ, যা বর্তমানে চট্টগ্রামের শিল্পপতি শাহ আলম এর বাড়িতে সংস্থাপিত হয়েছে। স্বচ্ছ গ্লেজে ২০০ খণ্ডে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। এত বড় মুর্যাল চিত্র এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। এতে কম্পোজিশন, অলঙ্করণ ও রঙ এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যে, সুরিয়েলিজম ধারায় তা‘লিক রীতিতে এ আরবী লিপিশৈলীটি যেন স্থাপত্য অলঙ্করণের স্বার্থক প্রয়োগ।[৬২]

২.১.২০ শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম (জ. ১৯৭৪ খ্রি.)

শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম ৫ মার্চ ১৯৭৪ সালে খুলনা জেলার টুটপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আবদুর রশীদ। তিনি ১৯৯৪ সালে তা‘মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা হতে

---

[৬১] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮।

[৬২] *ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও বিকাশ*, ন

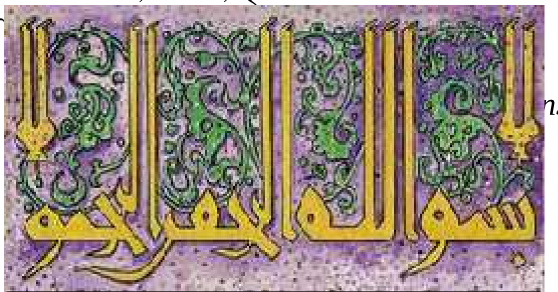

হাদীস বিভাগে কামিল এবং ২০০৫ সালে হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজে কলেজ হতে ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের চারুকলা অনুষদভুক্ত প্রাচ্যকলা বিভাগ হতে 'মধ্যযুগের (১২০০-১৮০০ খ্রিঃ) বাংলা ভূখন্ডে প্রাপ্ত ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক ব্যবহার এবং তার ইতিহাস' শিরোনামে এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। শিল্পকলা বিষয়ে পড়াশোনার জন্য তিনি ১৯৮২-৯০ সাল পর্যন্ত খুলনা শিশু একাডেমিতে সাপ্তাহিক আর্ট ক্লাস, ১৯৮৫ সালে 'আর্ট এন্ড পেইন্টিং'-এর উপর ছয়মাস ব্যাপী ওয়ার্কশপ এবং ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত '১৬তম হিস্টোরি এন্ড আর্ট এপ্রিসিয়েশন' কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের একমাত্র শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী যিনি সৌদি আরব থেকে শৈলীবিষয়ক সনদপ্রাপ্ত, তাঁর কাছে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীগুলো হাতে-কলমে রপ্ত করেন। নাসতা'লিক ও শিকাসতে নাসতা'লিক শৈলী ইরানের ওস্তাদ মাহবুবে পুররহীমি মাশহাদী, ওস্তাদ আলী ফারাসাতী ও ওস্তাদ সিদাঘাত জাব্বারীর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি ১৯৮৬ সালে খুলনা শিশু একাডেমির 'গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন' ২০০১ সালে চট্টগ্রামে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৮ সালে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ২০০৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'ন্যাশনাল আর্ট এক্সিবিশন'-এ অংশগ্রহণ করেন। ২০১০ সালে ২৬ মে থেকে ২ জুন আলজেরিয়ার ল কাসবায় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব মিনিয়েচার', 'ইলাসট্রেশন এন্ড আর্ট অব রাইটিং' প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন এবং এ উপলক্ষে তিনি তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করেন।[৬৩]

তাছাড়া ২০০২ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি IRCICA-এর সপ্তম আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা ও

[৬৩] *ক্যাটালগ: মোহাম্মদ আবদুর রহীমের ক্যালিগ্রাফি*, ২০১০, পৃ.৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদর্শনীসহ ২৫টি দেশী-বিদেশী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৯ সালে ইরানে সপ্তদশ আন্তর্জাতিক কুরআনের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে ক্যালিগ্রাফি পারফর্মিং-এ প্রথম স্থান অর্জন করেন। একই সাথে তেহরানে আরো ৩টি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইরানের ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক 'বিসমিল্লাহ ফেস্টিভ্যাল' ও প্রতিযোগিতায় জুরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যা ছিল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশী কোন শিল্পীর বড় স্বীকৃতি বা সম্মান অর্জন। তিনি দেশে-বিদেশে কয়েকটি পুরস্কার ও এ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। ২০০৫ সালে ইরান কালচারাল সেন্টার, ঢাকা আয়োজিত 'শৈল্পিক দৃষ্টিতে কুরআন' প্রদর্শনী উপলক্ষে বিসমিল্লাহ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান, ২০০৭ সালে ইরান কালচারাল সেন্টার, ঢাকা আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান এবং ২০০৯ সালে তেহরানে আন্তর্জাতিক বিসমিল্লাহ প্রতিযোগিতায় লগো সেকশনে প্রথম স্থান অর্জন করেন।

তিনি 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফি' নামে ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রকাশ এবং ক্যালিগ্রাফির উপর প্রকাশিত প্রথম ম্যাগাজিন 'ক্যালিগ্রাফ আর্ট' ম্যাগাজিনের ও মুহাম্মদ নূরুর রহমান রচিত আরবী 'ক্যালিগ্রাফির উৎস ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ' নামক গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। তিনি তাঁর চমৎকার শিল্পকর্মের জন্য ১৯৮৬ সালে 'খুলনা শিশু একাডেমি পুরস্কার' পান। তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় এ বিষয়ে তাঁর শতাধিক লেখা প্রকাশিত হয়। যাতে তিনি ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস, শৈলী ও নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমানে তিনি 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার সাব-এডিটর, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ও প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ-এর আজীবন সদস্য। তিনি ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে একজন যোগ্য সংগঠক ও ক্যালিগ্রাফারের ন্যায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাই তাকে একজন নিবেদিতপ্রাণ শিল্পকর্মী হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।[৬৪]

---

[৬৪] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তেলরঙ ও পানিরঙ ছাড়াও ম্যুরাল, সিরামিক, টালি, মোজাইক, মার্বেল পাথর, পটারি ও কাঠে ক্যালিগ্রাফির কাজ করতে পছন্দ করেন। তিনি কুফী, সুলুস, নাসখী, নাসতা'লিক, তুঘরা ও রুক'আহ প্রভৃতি লিপিশৈলীতে সিদ্ধহস্ত। দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশের দেশসমূহের মধ্যে ভারত, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক ও ইরানে তাঁর ক্যালিগ্রাফি কর্ম সংরক্ষিত আছে। তিনি বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রথম ওয়েবসাইট ও ওয়েব পোর্টাল নির্মাণ করেন। তাঁর www.bdcalligraphy.com ও http://bdcalligraphy.blogspot.com নামে দু'টি ওয়েব সাইট এবং এ বিষয়ক আরো তিনটি সাইট ও ব্লগ রয়েছে। তিনি ২০০৮ সালে দেশে ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রথম ডকুমেন্টারী নির্মাণ করেন, যা ইসলামিক টিভিতে প্রচার হয়। ক্যালিগ্রাফির গবেষণা ও উন্নয়নে তিনি শতাধিক গ্রন্থ, ক্যাটালগ, পত্র-পত্রিকা, ডকুমেন্ট, ক্যালিগ্রাফির নমূনা ও কয়েকশ প্রবন্ধ সংগ্রহের মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক আর্কাইভ গড়ে তুলেছেন। তিনি বিদেশে সমকালীন ক্যালিগ্রাফি তৎপরতা ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণালাভ ও সংগঠনগুলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। বিশেষ করে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)-এর সাংস্কৃতিক বিভাগ IRCICA-এর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা ও ক্যালিগ্রাফি উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, IRCICA-এর ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক কার্যক্রমের বাংলাদেশ অংশের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশী-বিদেশী কয়েকটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ ও ডেমন্সট্রেটর হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

চিত্র-৮১: মসজিদ সাজসজ্জায় ক্যালিগ্রাফি করছেন শিল্পী আবদুর রহীম

নান্দনিক ও শৈলীভিত্তিক ক্যালিগ্রাফি চর্চার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে শিল্পবোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন এবং বৈচিত্রময় আঙ্গিকে তাঁর শিল্পকর্ম দর্শক ও ক্রেতার মাঝে আধ্যাত্মিক আবেদন সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তিনি সহস্রাধিক ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। এসব শিল্পকর্মে সুলুস, নাসখী, দিওয়ানী, তা'লিক, ইজাযাহ, কারামতিয়ান কুফী, ইস্টার্ন কুফী, মাগরিবী ও আন্দালুসিয়ান কুফী, বিহারী, বেঙ্গল তুঘরা, রায়হানী, মুহাক্কাক, সুলুসে জালী, দিওয়ানী জালী ও নাসতা'লিক প্রভৃতি শৈলী ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া তিনি ফ্রি-হ্যান্ড ক্যালিগ্রাফিও করেছেন। শিল্পকর্মের মাধ্যম হিসেবে তিনি তেলরঙ, পানিরঙ, মিশ্র মাধ্যম, বিশেষত সোনালি, রুপালি মেটাল কালারের প্রয়োগ এবং এক্রিলিক, ফেব্রিক ও পার্ল কালার ব্যবহার করেন। তিনি মসজিদ ও ধর্মীয় ইমারতে ম্যুরাল ক্যালিগ্রাফি করেছেন। সেখানে টাইল্স, টেরাকোটা, গ্লেজ ফায়ারিং, সিরামিকের ব্যবহার, মার্বেল পাথরে এনগ্রেভ, কাঠে এনগ্রেভ, পটারীতে কাটাই, খোদাই, ম্যাট ফায়ারিং, সিরামিক কাজ করেছেন। মসজিদগুলোর কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সলগোলা জামে মসজিদ, ৫ নং জেটি গেট মসজিদ, পতেঙ্গাসমুদ্র বন্দর মসজিদ (২০০০), ডিওএইচএস জামে মসজিদ (২০০২), সুন্ধিহার জামে মসজিদ (২০০৩), সেনা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ (২০০৫) ও মসজিদ আল-মাগীরাহ (২০০৬), উত্তরা ৫নং সেক্টর মসজিদ ইত্যাদি। এছাড়া ২০০৮ সালে দরগাহে শাহ সোলেমান ফতেহ গাজী (রহ.), শাহজী বাজার ক্যালিগ্রাফি করেন।[৬৫]

২.১.২১ শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ (জ. ১৯৭৫ খ্রি.)

শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ ১৯৭৫ সালে বরগুনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রমজান আলী। তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ, মাদরাসা হতে কামিল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স এবং 'আরবী ক্যালিগ্রাফী ও আল-কুরআনের লিপিশৈলী: একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক বিষয়ের উপর এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ২০০০ সালে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে 'আলোকচিত্র প্রদর্শনী', ২০০৩ সালে রাজশাহী নগর ভবনে 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'

চিত্র-৮২: মারুফের ক্যালিগ্রাফি কুরআনের আয়াত

[৬৫] *আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও*

Dhaka University Institutional Repository

২০০৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রদর্শনী এবং রাজশাহী সংস্কৃতি কেন্দ্রে 'একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'র আয়োজন করেন। ২০০৩ রাজশাহী মেডিকেল অডিটোরিয়াম এবং সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৮ সালে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি পাকুরিয়া কলেজে অধ্যাপনারত এবং 'সুপারকম রিলেশন' এর মালিক ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত। তিনি সাইমুম আর্ট পাবলিসিটি-এর প্রতিষ্ঠাতা, ক্যালিগ্রাফি একাডেমি, রাজশাহী-এর পরিচালক ও ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সদস্য।[৬৬]

শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ লিপিশৈলীর ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও বর্ণিলতার ব্যাপারে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পারেননি। তাঁর 'সর্বোত্তম' শিরোনামের ক্যালিগ্রাফিতে দিওয়ানী জালী শৈলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্যালিগ্রাফির শৈলীগত রূপান্তর স্নিগ্ধ শীতলতায় আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

২.১.২২ শিল্পী আমিরুল হক (জ. ১৯৭৮ খ্রি.)

শিল্পী আমিরুল হক (এমরুল কায়েস) ১৯৭৮ সালের ১ জানুয়ারি চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী নজরুল ইসলাম। মাতার নাম শরীফা খানম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। বাল্যকাল হতেই তিনি আর্টের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং শিল্পকর্মের জন্য পুরস্কারও পেয়েছেন। তিনি ২০০০ সালে চট্টগ্রাম এলিয়েন্স ফ্রাঁসেস অডিটোরিয়ামে 'একক আর্ট প্রদর্শনী'র আয়োজন করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে ঢাকা, ২০০০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও

চিত্র-৮৩: শিল্পী আমিরুল হকের ক্যালিগ্রাফি-কুরআনের আয়াত

[৬৬] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদ*

২০০২ সালে চট্টগ্রামে 'আর্ট এক্সিবিশন' ২০০১ সালে চট্টগ্রামে 'পোস্টার প্রদর্শনী', ২০০০, ০১, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৮ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে 'তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এবং ২০০১ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' এবং ২০০৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পেইন্টিং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০০১ সালে আর্টের জন্য 'জিয়া গোল্ড মেডেল' লাভ করেন।[৬৭]

তিনি 'শরীফা চারু ও কারুকলা' নামক চৌদ্দটি বইয়ের একটি সিরিজ, ছবির সাহায্যে শিশুদের সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার বই রচনা করেন। তিনি ইতোপূর্বে ছয়টি আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি আর্টের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য শরীফা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে যার ১৮টি শাখা রয়েছে। তিনি এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ রয়েছে। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে বর্ণাঢ্য ক্যানভাসে রঙের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে এ পর্যন্ত অনেকগুলো ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করেছেন।

২.১.২৩ শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার (জ. ১৯৭৮ খ্রি.)

শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার ১৯৭৮ সালে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এম. এ মমিন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ হতে মাস্টার্স পাশ করেন। তিনি ২০০২ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক সম্মেলনে, ২০০৪ সালে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'কুরআন মেলা'য় অংশগ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে ঢাকায় ভাস্কর নভেরা হলে, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি কর্তৃক, ২০০৫ সালে আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী

চিত্র-৮৪: শিল্পী মুবাশ্বিরের লোকজ ক্যালিগ্রাফি 'আলিফ'

[৬৭] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শন*

iversity Institutional Repository

ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত ‘বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী’, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে ২০০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫ ও ০৬ সালে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে- চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ২০০৫ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্ম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, তাকাফুল ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, রহিম আফরোজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে সংরক্ষিত আছে।[৬৮] তিনি ‘ডিজাইন রুট’-এর আর্ট ডিরেক্টর ও ‘ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি’র সম্পাদক। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমির সদস্য সচিব, ‘ডিজাইন বাজার’ এর শিল্প নির্দেশক এবং ‘দৈনিক নয়া দিগন্ত’ পত্রিকার স্টাফ আর্টিস্ট। তিনি এ পর্যন্ত কয়েকশত বই, ম্যাগাজিন, সিডি, ভিসিডি ও ক্যাসেটের প্রচ্ছদ করেছেন।

শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার মূলত একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার। তিনি ক্যালিগ্রাফিক ইলাসট্রেশন করে থাকেন। পানিরঙ ও তেলরঙে তিনি চমৎকার ক্যালিগ্রাফি করেছেন। কুফী, নাসখী, সুলুস, তুঘরা রীতিতে তিনি আরবী ও বাংলা হরফের শিল্পসম্মত বিন্যাস করেন এবং গাঢ় রঙের কনট্রাস্ট সৃষ্টি করেন। ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক তাঁর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও প্রচণ্ড আগ্রহ আর শিল্পের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালবাসা তাকে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। ছাত্রজীবনেই তাঁর শিল্পকর্ম বিভিন্ন ক্যালেণ্ডারে স্থান পেয়েছে। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত ক্যালিগ্রাফির প্রায় প্রতিটি প্রদর্শনীতেই তিনি বেশ আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। বাংলা ক্যালিগ্রাফিতে তাঁর আগ্রহের পরিস্ফুটন ঘটেছে বেশ কিছু শিল্পকর্মে। তিনি ইসলামী ধারায় ক্যালিগ্রাফির রীতি-বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই বাংলা ক্যালিগ্রাফি তৈরির অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মধ্যে ক্যালিগ্রাফির মূলধারার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তুঘরা লিপিশৈলীর ছাড়াও নাসতা‘লিক ধারার প্রভাবও তাঁর শিল্পে লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া গুলজার শৈলীর প্রভাবও তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে বিদ্যমান। বাংলা ক্যালিগ্রাফিতে তিনি আরও সুন্দর শিল্পকর্ম উপহার দিবেন বলে আশা করা যায়।[৬৯]

---

[৬৮] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

[৬৯] *আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নতুন আঙ্গিকে আরবী ক্যালিগ্রাফিতে প্রাণস্পন্দন সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করেছেন। কোলাজ পদ্ধতিতে দৃশ্যপটের মধ্যস্থলে গোলকের মধ্যে ফুলের পাপড়িতে মুসলমানদের সাদর সম্ভাষণ ‘আস্‌সালামু আলাইকুম’ অঙ্কন করেন। তার উভয় পার্শ্বে অনুরূপ সম্ভাষণ তুলে ধরে ক্যালিগ্রাফিতে গদি সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া একটি ছাতার দৃশ্যপটে ‘ইন্নদ্দিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম’ আয়াতকে ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে ঝংকৃত করেছেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে অভিনবত্বের ছাপ বিদ্যমান। গাঢ় কালো রঙে অপূর্ব নকশায় অঙ্কিত ‘আল্লাহ’ ক্যালিগ্রাফিটি দর্শককে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করেছে। এতে তিনি প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করায় দ্বি-মাত্রিক শিল্পকর্ম, ত্রি-মাত্রিক বৈশিষ্ট্যে রূপ লাভ করেছে। তিনি খুব সিম্পল, ইন্টারেস্টিং ও ক্লিন কর্ম আমাদের ক্যালিগ্রাফি শিল্প উপহার দিয়ে চলেছেন। তাই লোকজ চেতনায় সমৃদ্ধমান হয়ে চলেছে তাঁর ক্যানভাসের প্রতিটি পরিসর। তাঁর লিখনরীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- সাবলীল রেখার পারস্পরিক বন্ধন, যা বিচিত্র বিমুগ্ধতায় একটির সাথে আরেকটি মিশে আছে। ‘কোলাজ’ মাধ্যমে করা তাঁর ক্যালিগ্রাফির ডেকোরেটিভ চিন্তা অসাধারণ।[৭০]

২.১.২৪ শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী (জ. ১৯৭৯ খ্রি.)

শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী ১৯৭৯ সালে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোঃ আব্দুল লতিফ। তিনি ঢাকা আলিয়া থেকে কামিল, ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে ‘ডিপ্লোমা ইন ফাইন আর্টস’, নিউরন কম্পিউটার হতে ‘ডিপ্লোমা-ইন কম্পিউটার গ্রাফিক্স’ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ‘শান্ত-মারিয়াম ফাউন্ডেশন’ আয়োজিত ‘গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া’ শীর্ষক মাসব্যাপী ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৯ সালে ‘ইরানী

চিত্র-৮৫: রফিকুল্লাহ’র একটি বর্ণাঢ্য ক্যালিগ্রাফি

[৭০] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম*

ity Institutional Repository

কালচারাল সেন্টার' আয়োজিত 'কুরআন সপ্তাহ', ২০০১ সালে বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম আয়োজিত 'চট্টগ্রাম গ্রুপ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০২, ০৩ ও ০৪ সালে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ২০০৩ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত 'পঞ্চদশ জাতীয় প্রদর্শনী', ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট এর জয়নুল গ্যালারিতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্মরণে 'আর্ট প্রদর্শনী' ও বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি আয়োজিত 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', ২০০১ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত 'ধুমপান বিরোধী সেমিনার' এবং ইরানে অনুষ্ঠিত 'ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফি 'ইরানিয়ান কালচারাল সেন্টার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ড্রাগ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ায় সংগৃহীত রয়েছে। গাজীপুরে অবস্থিত রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত, ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান, অষ্টম ও নবম ঢাকা বইমেলার প্যাভিলিয়নে তিনি ম্যুরাল ডিজাইন করেন। তিনি 'চৌকস গ্রাফিক্স সিস্টেম লিমিটেড'-এর প্রধান ডিজাইনার এবং ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি বিদেশে অবস্থান করে তাঁর ক্যালিগ্রাফি চর্চা অব্যাহত রেখেছেন।[৭১]

রফিকুল্লাহ গাজালী একজন প্রতিশ্রুতিশীল ক্যালিগ্রাফার। তিনি সুলুস, তুঘরা, নাসতা'লিক ও শিকাসতা রীতিতে সিদ্ধহস্ত। তাঁর শিল্পকর্মে সৃজনশীলতা, স্বকীয়তা ও শৈল্পিক নৈপুণ্যে লক্ষ্য করা যায়। রফিকুল্লাহ গাজালী 'শিকাসতা' রীতিতে হরফ ও শব্দগুলোকে ভেঙ্গে নতুন ফর্ম সৃষ্টি করে এক ঐন্দ্রজালিক কম্পোজিশন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাজ দেখে মনে হয়, তিনি নিরীক্ষাধর্মী কাজ পছন্দ করেন। তাঁর সম্পর্কে ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন- 'তিনি মূলত গ্রাফিক্স ডিজাইনার হলেও তাঁর সৃজনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে।' তিনি সুলুস, নাসতা'লিক ও

[৭১] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তুঘরার সংমিশ্রণে ‘আসমাউল হুসনা’ তথা মহান আল্লাহর পবিত্র নাম বা গুণাবলি কম্পিউটার মাধ্যমে কম্পোজিশন করেন। এতে বাণিজ্যিক মনোভাব প্রকাশ পেলেও তিনি এতে সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ ঘটিয়ে এক মোহনীয় রূপ দেন।[৭২]

গাজালী সমান্তরাল ক্যানভাসে গোলাকৃতির স্বভাবে ক্যালিগ্রাফি আঁকেন। তাঁর যে সকল উল্লম্ব ক্যালিগ্রাফি চোখে পড়ে সেগুলোকে তিনি ছন্দোবদ্ধ গতিশীলতা থেকে ভিন্ন স্বভাব প্রয়োগ করেন। শৈলীগত ব্যাকরণ-শুদ্ধতা অপাংক্তেয় হলেও বর্ণছোপের পর্যাপ্ত প্রয়োগে তাঁর চিত্রে শিল্পের সুনিপুণ চাতুর্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি বর্ণিলতার প্রাচুর্যে তাঁর চিত্রকে বিচিত্রভাবে উপস্থাপন করেন। চিত্রগত পরিসরে বর্ণবৈপরিত্বের আলো-আঁধারি স্থাপনের প্রবণতা এ শিল্পীর মনে ব্যাপকভাবে কাজ করে। তাছাড়া তিনি ক্যানভাসে প্রয়োগ করে চলেন কিছু আধাবিমূর্ত ইমেজ। অনেক নিরাবয়ব বিষয়কে তিনি আকার দিয়েছেন। তাঁর ‘প্রার্থনা’ ও ‘আহবান’ ছবিতে অপ্রাসঙ্গিগক যে সকল ইমেজ এনে তিনি যথার্থতার উপলব্ধি প্রয়োগ করেছেন, আমাদের ক্যালিগ্রাফির অঙ্গনে তা সত্যিই অতুলনীয়।[৭৩]

২.১.২৫ অন্যান্য ক্যালিগ্রাফারগণ

উপরে বর্ণিত ক্যালিগ্রাফারগণ ছাড়াও বাংলাদেশে আরও অনেক ক্যালিগ্রাফার রয়েছেন যারা ক্যালিগ্রাফি চর্চায় নিজেদেরকে নিবৃত্ত রেখেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ক্যালিগ্রাফি ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিরন্তর কাজ করে চলছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক লেখালেখি ও গবেষণা করছেন, আবার অনেকে ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে তাদের শিল্পকর্মের প্রচার ও প্রসারে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, আবুদ্ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী

চিত্র-৮৬: সাইফুল্লাহ সাফার একটি বর্ণাঢ্য ক্যালিগ্রাফি

এইচ. এম

[৭২] আরবী ক্যালিগ্রাফির উ

[৭৩] ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি

utional Repository

আব্দুল্লাহ আল-মামুন, সাইফুল্লাহ সাফা, আতা ইমরান, মাসুম আখতার মিলি, আহমদ নওয়াজ, জাহাঙ্গীর হোসাইন, নার্গিস হান্নান, খুরশিদ আলম, সাইয়েদ জুলফিকার জহুর, খুরশিদ আলম, নিসার জামিল, ফেরদৌসি বেগম, ফজলে বারী মামুন, মোঃ আব্দুল্লাহ, নাজমুন সাঈদা পলি, মহিউদ্দিন, শাহ ইফতেখার তারিক, নূর আহমেদ মাসুম, জাহাঙ্গীর হোসাইন, কৃষাণ মোশাররফ, আবুল ফজল, মোরশেদুল আলম, এনামুল হক, কামাল আহমেদ, খন্দকার মনিরুজ্জামান, শর্মীলা কাদের, সৈয়দ আব্দুল হান্নান, হাসান মোরশেদ, আবুল খায়ের, আরেফা বেগম চৌধুরী, রেশমা আখতার, মনোয়ার হোসাইন, ওবায়দুর রহমান ফারুক, আইয়ুব আলী রোকন, সাইফুল্লাহ মানসুর নানাভাই, খলিলুল্লাহ মুহাম্মদ বায়েজিদ, নূরুজ্জামান ফিরোজ, সুমাইয়া সুলতানা সালওয়া, মুনিরা মুমতাহিনা, মুহিউদ্দিন মাসুম, হাসনাইন কবির, মিরাজ রহমান, নাসির মাহমুদ, জামিল আহমদ, শারমিন রূপা, সাইদুল ইসলাম সাঈদ, আজিজুর রহমান তালুকদার, মোঃ আতাউর রহমান, জাকির হোসেন জুয়েল, তাওফীকুর রহমান তুহান, বাচ্চু ধর পাল, মাহফুজুর রহমান শিমুল, আ ন ম যাকারিয়া ও নাহিদ রোকসানা প্রমুখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২.২ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা

২.২.১ শরীফা আর্ট স্কুল ও শরীফা ইসলামী ক্যালিগ্রাফি স্কুল

শরীফা আর্ট স্কুল বন্দর নগরী চট্টগ্রামে অবস্থিত। এটি চট্টগ্রামের সবচেয়ে আলোচিত ও পরিচিত আর্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটির এখন মোট ১৮টি শাখা রয়েছে। যাতে মোট ৩০০০ জন শিক্ষার্থী এবং ১৪৫ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৫০০ জন আছে যারা খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও উপজাতীয়। এ প্রতিষ্ঠানে মূলত 'ড্রইং এন্ড পেইন্টিং'-এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও পাশাপাশি এখানে ক্যালিগ্রাফিও শিখানো হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্মীয় বাণী দিয়ে ক্যালিগ্রাফি করে থাকেন। তবে ক্যালিগ্রাফির মধ্যে আরবী ক্যালিগ্রাফি তথা ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চাই বেশি হয়। এখান থেকে এ পর্যন্ত সাত শতাধিক শিক্ষার্থী ক্যালিগ্রাফির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ক্যালিগ্রাফি চর্চা

Dhaka University Institutional Repository

করছেন। স্কুলের পক্ষ থেকে প্রায় প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমি, এলিয়েন্স ফ্রাঁসেসসহ বিভিন্ন গ্যালারিতে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যাতে বাংলা ও আরবী ক্যালিগ্রাফি স্থান পায়।

বিগত বছরগুলোতে ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতেও এ প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী- আবুল খায়ের ও আইয়ুব আলী রোকন তাদের শিল্পচর্চার দিগন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য বর্তমানে দুবাইয়ে অবস্থান করছেন এবং অনবরত ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করছেন। এ প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্ন হতে পরিচালনা করে আসছেন- শিল্পী আমিরুল হক (ইমরুল কায়েস)। তিনি নিজেই এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর মাতার নামে এ স্কুলটির নামকরণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক আমিরুল হকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, শরীফা আর্ট স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রশিক্ষক কর্তৃক ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মের সংখ্যা হবে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক।[৭৪]

আর্ট স্কুলের ধারাবাহিক সফলতা ও ক্যালিগ্রাফির প্রতি শিক্ষার্থীদের প্রবল আগ্রহের শরীফা ইসলামী ক্যালিগ্রাফি স্কুল নামে আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখানে প্রায় নিয়মিত ১০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। স্কুলের পরিচালক শিল্পী আমিরুল হকসহ মোট ৬ জন প্রশিক্ষক এখানে ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ দেন।

২.২.২ সুবহা ক্যালিগ্রাফি এন্ড আর্ট একাডেমি

সুবহা ক্যালিগ্রাফি এন্ড আর্ট একাডেমি ৩ জন নবীন ক্যালিগ্রাফারের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে রাজধানী ঢাকার উত্তরায় এর শুভযাত্রা শুরু হয়। শিল্পী মাহফুজা সুলতানা উম্মেহানী, শিল্পী সুমাইয়া সুলতানা সালওয়া ও শিল্পী খলিলুল্লাহ মুহাম্মাদ বায়জীদ এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা। এখানে ক্যালিগ্রাফি, আর্ট এবং বাংলা, ইংরেজি ও আরবী হাতের লেখা

[৭৪] প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শিল্পী আমিরুল হকের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিখানো হয়। আট মাস ব্যাপী প্রতিটি কোর্স সম্পন্ন করা হয়। প্রতি সপ্তাহের ২ দিন তথা শুক্রবার ও শনিবার ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ক্যালিগ্রাফির কোর্সের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে নির্ধারিদ মাসিক টিউশন ফি পরিশোধ করতে হয়। শিল্পী সুমাইয়া সুলতানা সালওয়া ও শিল্পী খলিলুল্লাহ মুহাম্মাদ বায়জীদ ক্যালিগ্রাফি ও হাতের লেখা এবং শিল্পী মাহফুজা সুলতানা উম্মেহানী আর্টের ক্লাস পরিচালনা করে থাকেন। তাছাড়াও শিল্পী খলিলুল্লাহ মুহাম্মাদ বায়জীদ Origami কাগজের তৈরি শিল্পের উপর মাসে একটি ক্লাস পরিচালনা করে থাকেন।[৭৫]

২.২.৩ অঙ্কন আর্ট স্কুল

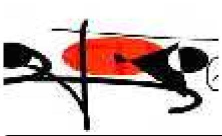

চিত্র-৮৭: প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম

রাজধানী ঢাকার শিল্পচর্চা ও প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে অঙ্কন আর্ট স্কুল। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি পরিচালনা করেন শিল্পী মাহবুবুল ইসলাম (বাবু)। এ প্রতিষ্ঠানের উত্তরা, গুলশান ও মালিবাগে মোট তিনটি শাখা রয়েছে। 'ড্রইং ও পেইন্টিং' এ প্রতিষ্ঠানের মূল বিষয় হলেও যে সকল শিক্ষার্থী বেশি অগ্রসর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগত আগ্রহে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। পরিচালক নিজেও ক্যালিগ্রাফিতে পারদর্শী। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত 'গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন'-এ একজন ক্ষুদে শিল্পী রাইহানা আজিম উপমার ক্যালিগ্রাফি ক্যানভাসের উপর এক্রিলিক মাধ্যমে করা 'ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রাহীমু' দর্শকমহলে বেশ সাড়া ফেলে।[৭৬] এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত আরো বেশ কিছু শিক্ষার্থী রয়েছে যারা ক্যালিগ্রাফি চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন।

২.২.৪ সেজান আর্ট গ্যালারি

আর্ট গ্যালারি শিল্পচর্চা ও লালনে অগ্রসর ভূমিকা পালন করে। তাই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তথা ক্যালিগ্রাফারদের অনেকেই নিজস্ব উদ্যোগে আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। যাতে তাদের

---

[৭৫] *অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক* শিল্পী খলিলুল্লাহ মুহাম্মাদ বায়জীদ এর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত।
[৭৬] প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শিল্পী মাহবুবুল ইসলাম বাবুর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকর্ম প্রদর্শন করা যায়। এতে যেমন সংশ্লিষ্ট শিল্পীর শিল্পকর্ম সংরক্ষণ করা যায়, তেমনি বিক্রিও করা যায়। যা একজন শিল্পীর আয়ের প্রধানতম উৎস। শিল্পী সাইফুল ইসলাম তাঁর শিল্পকর্ম সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও বিক্রির জন্য ঢাকার বনানীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন সেজান আর্ট গ্যালারি। যাতে পোর্ট্রেইট, ল্যান্ডস্ক্যাপ, স্টিল লাইফ, মডার্ন কম্পোজিনসহ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অসংখ্য শিল্পকর্ম রয়েছে। এসব বিক্রি করে তিনি অর্থ উপার্জন করেন।[৭৭] এভাবে শিল্পী আবু তাহের, ভাস্কর রাসা, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনসহ অনেক ক্যালিগ্রাফারেরই নিজস্ব গ্যালারি রয়েছে।

২.২.৫ সাফা আর্ট ফার্ম

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা, প্রচার ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১২ সালের ৫ জুলাই রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাফা আর্ট ফার্ম। প্রতিষ্ঠানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধনকৃত। ঢাকার কলাবাগানস্থ কার্যালয়ে নিজস্ব কারিকুলামে সপ্তাহের দু'দিন তথা শুক্রবার ও শনিবার প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এর যাবতীয় কর্াক্রম ফেসবুক পেইজে নিয়মিত প্রদর্শন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার হলেন শিল্পী সাইফুল্লাহ সাফা।[৭৮]

২.২.৬ চারুকলা অনুষদ ও ইনস্টিটিউটসমূহ

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চারুকলা অনুষদ বা ইনস্টিটিউটে ক্যালিগ্রাফির উপর সরাসরি কোন বিভাগ বা বিষয় নেই। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পাঠ্যসূচিতে ক্যালিগ্রাফি সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় রয়েছে যা পড়তে গিয়ে ক্যালিগ্রাফির প্রতি অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেন। আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে অধ্যয়ন করে অধিক আগ্রহের কারণে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়

---

[৭৭] Folder: Cezzane Art Gallary

[৭৮] প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শিল্পী সাইফুল্লাহ সাফার সাথে সাক্ষাৎ ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চাও শুরু করেন। এক পর্যায়ে ভাল মানের ক্যালিগ্রাফার হয়ে উঠেন। তাছাড়া চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধিকাংশ বিভাগই ড্রইং, পেইন্টিং ও ডিজাইন ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। ক্যালিগ্রাফিও যেহেতু রঙ, তুলি ও কালি-কলমের সাথে সম্পৃক্ত। সেহেতু চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করে অনেকেই ক্যালিগ্রাফি চর্চায় ঝুকে পড়েন। যেমন- শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী সৈয়দ এনায়েত হোসেন, শিল্পী এ. এইচ. এম বশির উল্লাহ, শিল্পী কামরুল হাসান কালন, শিল্পী মীর মুহাম্মদ রেজাউল করিম, শিল্পী ফরেজ আলী, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী হাসান মোরশেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে এবং শিল্পী আমিরুল হক ও শর্মিলা কাদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হতে চারুকলার উপর ডিগ্রিপ্রাপ্ত। এভাবে আরো অনেকেই আছেন যারা নিরন্তর ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে চলছেন।

২.২.৭ আর্ট স্কুল ও কলেজসমূহ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে অনেক আর্ট স্কুল ও চট্টগ্রামে আর্ট কলেজ রয়েছে। সেসব প্রতিষ্ঠানে ড্রইং ও পেইন্টিং এর উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ হয়। ড্রইং ও পেইন্টিং এবং ওরিয়েন্টাল আর্ট যেহেতু ক্যালিগ্রাফির মতো রঙ-তুলি বা কলমের সাথে সম্পৃক্ত। আর ক্যালিগ্রাফিও একটি সৃজনশীল ও কালোত্তীর্ণ শিল্প। তাই শিল্পীরা বিভিন্ন প্রদর্শনী ও শিল্পকর্ম দেখে ক্যালিগ্রাফির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। ধীরে ধীরে প্রচেষ্টা চালিয়ে এ শিল্প আয়ত্ত্ব করেন এবং এক পর্যায়ে ভাল ক্যালিগ্রাফার হয়ে উঠেন এবং ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা করছেন। ফলে পরোক্ষভাবে হলেও আর্ট স্কুল ও কলেজ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্প চর্চা ও বিকাশে সহায়তা করে।

২.২.৮ আরবী বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণীতে তিনটি গ্রুপ রয়েছে। তাহলো- সাধারণ, আধুনিক আরবী সাহিত্য ও থিসিস গ্রুপ। তার মধ্যে সাধারণ ও আধুনিক আরবী সাহিত্য গ্রুপের ৫০৭ ও ৫০৮ নং কোর্সের ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস ও মুসলিম দর্শন-এর বিকল্প হিসেবে আরবী ক্যালিগ্রাফি-১ ও আরবী ক্যালিগ্রাফি-২ বিষয় দু'টি কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৫০ নম্বর করে দু'টি কোর্সের জন্য ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৫০৭ নং কোর্সে আরবী হস্তলিপির উদ্ভব, কুফি লিপির উন্নয়ন, আরবী বর্ণমালার সংস্কার এবং ৫০৮ নং কোর্সে গোলায়িত লিপিশৈলীর উন্নয়ন, মাগরিবী লিপির প্রধান ধারাসমূহ, প্রাচ্যে ক্যালিগ্রাফির উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে।[৭৯] এছাড়া এমফিলের সিলেবাসে আরবী ভাষাতত্ত্ব ও আরবী ক্যালিগ্রাফির একটি বিষয় রয়েছে। যাতে বিভিন্ন যুগে আরবী ক্যালিগ্রাফি ও এর তুলনামূলক পর্যালোচনার বিষয় স্থান পেয়েছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের আরবী তথা ইসলামী ক্যালিগ্রাফির পাঠ বিদ্যমান রয়েছে।

২.২.৯ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ৫০৫ নং কোর্সের শিরোনাম হচেছ- মুসলিম ক্যালিগ্রাফি ও পেইন্টিং এর উন্নয়ন। যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- পেইন্টিং এর ব্যবহার, ইতিহাস ও সভ্যতায় এর অবস্থান, ইসলামে পেইন্টিং এর উন্নয়ন ও এর দৃষ্টিকোণ, চিত্রশিল্প, মুসলিম পেইন্টিং-এর মূলভিত্তি, চিত্রের ধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ, বিখ্যাত চিত্রকর পরিচিতি ও চর্চাকেন্দ্র, আরবী ক্যালিগ্রাফি, ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন ধারাসমূহ এবং ক্যালিগ্রাফারদের সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া মাস্টার্সে তিনটি গ্রুপের মধ্যে ইসলামিক আর্ট এন্ড আর্কেওলজি গ্রুপ রয়েছে যার মধ্যে মুসলিম স্থাপত্য, মুসলিম দেশসমূহে চিত্রশিল্পের উন্নয়ন, বিশ্ব শিল্পকলার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয় পাঠ করে অনেক শিক্ষার্থী ইসলামী

---

[৭৯] *সিলেবাস*: আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেশন-২০০০-২০০১, পৃ.৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকলা সম্পর্কে অধ্যয়ন, গবেষণা, গ্রন্থ প্রণয়ন এমনকি কেউ কেউ ক্যালিগ্রাফি চর্চার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে এভাবেই ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চর্চা সম্প্রসারিত হয়।[৮০]

২.২.১০ প্রাচ্যকলা ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যকলা ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগেও ক্যালিগ্রাফির পাঠ রয়েছে। প্রাচ্যকলা বিভাগের অনার্স চতুর্থ বর্ষের OA-404 নং কোর্সে ক্লাসে ৫০ ও পরীক্ষায় ৫০ নাম্বারসহ মোট ১০০ এবং অনুরূপভাবে মাস্টার্সে OA-603 নং কোর্সে ক্লাসে ৫০ ও পরীক্ষায় ৫০ নাম্বারসহ মোট ১০০ নাম্বারের কোর্স রয়েছে।

অন্যদিকে গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের GD-1062ঃ টাইপোগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি শিরোনামীয় কোর্সে উন্মুক্ত মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক হস্তলিপি ও নতুন ফন্ট তৈরীর হরফলিপি শিল্প। ক্লাসে ৫০ ও পরীক্ষায় ৫০ নাম্বারসহ মোট ১০০ এবং অনুরূপভাবে GD-1014ঃ ক্যালিগ্রাফি শিরোনামীয় কোর্সে কালো বা রঙিন কালি ও পোস্টার রঙ মাধ্যমে বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্লাসে ২৫ ও পরীক্ষায় ২৫ নাম্বারসহ মোট ৫০ নাম্বারের কোর্স রয়েছে।[৮১] এসব কোর্স সম্পন্ন করে উপরিউক্ত বিভাগের শিক্ষার্থীগণও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন।

---

[৮০] *সিলেবাস*: ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেশন-২০০০-২০০১।
[৮১] *সিলেবাস*: প্রাচ্যকলা ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২.৩ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন

২.৩.১ ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ

ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও প্রশিক্ষণের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগঠন হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ। ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রচার, প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্যে ১২ জুলাই ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফি শিল্পাঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতীয় জাদুঘরে

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত এ পর্যন্ত নয়টি গ্রুপ ও একটি একক প্রদর্শনী এবং জাতীয় প্রেসক্লাবে ৩ বার ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ক্যালিগ্রাফার সংবর্ধনার আয়োজন করে এ সংগঠনটি। এখানে বছর ব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় এবং সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীগণ সনদপ্রাপ্ত হন। এ পর্যন্ত তিনটি ব্যাচ থেকে মোট শতাধিক শিল্পী ক্যালিগ্রাফির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। যারা এখন নিয়মিত ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে দেশে-বিদেশে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ক্যালিগ্রাফির কোর্স সম্পন্ন করার জন্য সোসাইটির নিজস্ব একটি সিলেবাস ও কোর্স আউটলাইন রয়েছে। এখানে 'ডিপ্লোমা ইন আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফি' এবং 'হায়ার ডিপ্লোমা ইন আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফি' নামক দু'টি কোর্স রয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোতে ক্লাস নেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আবদুর রহীম ও অতিথি প্রশিক্ষক বৃন্দ। শিল্পী শহীদুল্লাহ্ এফ. বারী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিতেন। এছাড়াও সংগঠনটি মাঝে মাঝে ক্যালিগ্রাফির উপর সেমিনার, মুক্ত আলোচনা ও কৃতী ক্যালিগ্রাফারদের নিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যাতে ক্যালিগ্রাফি চর্চার প্রচার হয় এবং নবীন ক্যালিগ্রাফারগণ উৎসাহিত হন। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সভাপতি ও সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন যথাক্রমে শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল ও শিল্পী আবদুর রহীম। প্রতিষ্ঠানটি মাসিক 'ক্যালিগ্রাফ আর্ট' নামে একটি পত্রিকা বেশ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশ করে। সোসাইটির সদস্যগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা ও জার্নালে ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও প্রতিবেদন লিখেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফি- সুলুস, নাসখ, দিওয়ানী' নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়। রচনা করেন- ইব্রাহীম মণ্ডল, শহীদুল্লাহ এফ. বারী ও মোহাম্মদ আবদুর রহীম। সোসাইটির শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্যালিগ্রাফি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জাদুঘর, নতুন-পুরাতন মসজিদ ও ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। পর্যায়ক্রমে ক্যালিগ্রাফি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস ও আলাদা বিভাগ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে।[৮২]

---

[৮২] অত্র সংগঠনের অফিস ও ক্লাস পরিদর্শন এবং এর সভাপতি ও সেক্রেটারীর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সোসাইটির উদ্যোগে গত ১৪ মার্চ ২০০২ থেকে বাংলা সাহিত্য পরিষদের গোলাম মোহাম্মদ মিলনায়তনে মাসব্যাপী ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, কবি আসাদ বিন হাফিজ, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল। অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণ হলেন- শিল্পী হামিদুল ইসলাম, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ ও শিল্পী তৈয়বুর রহমানসহ আরো অনেকে। কর্মশালার ক্যালিগ্রাফি ও নন্দনতত্ত্বের উপর শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার এবং ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নির্মাণকৌশল ও হাতে-কলমে শিক্ষা দেন শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী। ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস ও ক্রমধারার উপর প্রশিক্ষণ দেন চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শিল্পী সবিহ-উল আলম।[৮৩]

২.৩.২ বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি

বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও অনুশীলনকে আরো গতিশীল করার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি। এর সভাপতি ও সেক্রেটারী হচ্ছেন যথাক্রমে- শিল্পী আরিফুর রহমান ও শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার। এ প্রতিষ্ঠানটি ‘ক্যালিগ্রাফি’ নামে ত্রৈমাসিক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে এবং কয়েকটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। যাতে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও ক্যালিগ্রাফারের শিল্পকর্ম নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা-পর্যালোচনা ও শিল্প সমালোচনামূলক রচনা উপস্থাপিত হয়। তবে এর প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকায় এসেছিলেন ইরানের ক্যালিগ্রাফি শিল্পী নাসের নওরোজি মানেশ। তিনি বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমির কার্যালয় পরিদর্শন ও এর সদস্যদের সাথে মত বিনিময় সভায় মিলিত হন। পরের দিন ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র ও বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমির যৌথ

---

[৮৩] *ক্যালিগ্রাফ আর্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগে ‘সমকালীন ক্যালিগ্রাফি: ইরান ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে দু’দেশের ক্যালিগ্রাফির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়।[৮৪] বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমির এ নবযাত্রা শুধু যে ক্যালিগ্রাফিকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক তাই নয়, বরং তা চিত্রকলার পণ্ডিতদের সাথে এ শিল্পকলার তাৎপর্য ও সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠানের শিল্পীবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবেও অনেককে ক্যালিগ্রাফি শিক্ষা দিচ্ছেন।

২.৩.৩ বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন

চিত্র-৮৮: সংস্থার মনোগ্রাম

বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা, লালন ও প্রশিক্ষণের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত এ সংগঠনের সভাপতি ও সেক্রেটারী হলেন যথাক্রমে শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম ও শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন। দেশী-বিদেশী ক্যালিগ্রাফারদের শিল্পকর্ম, বিভিন্ন গবেষকদের লিখিত ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক প্রবন্ধ, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ও ইসলামী শিল্পকলা বিষয়ক অসংখ্য বই সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি ও সংগ্রহশালা রয়েছে এ সংগঠনের। ইতোমধ্যে এ সংগঠনের উদ্যোগে ‘المعجزة فى الخط الثلث’ ও ‘আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’সহ কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি করেছেন এবং বই প্রকাশ করেছেন।। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের শিল্পীদের দ্বারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অর্ধশতাধিক মসজিদে ক্যালিগ্রাফি দ্বারা সজ্জিত হয়েছে। ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতি শুক্রবার সকাল ১০টায় হাতিরঝিলস্থ কার্যালয়ে এবং প্রতি সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।[৮৫]

২.৩.৪ সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমদ মাইজভাণ্ডারী ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন

---

[৮৪] *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*,‘ক্যালিগ্রাফির ঐতিহ্যিক বলয়’, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪।

[৮৫] অত্র সংগঠনের অফিস ও ক্লাস পরিদর্শন এবং এর সভাপতির সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৮৯: সংস্থার মনোগ্রাম

সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমদ মাইজভাণ্ডারী ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও প্রশিক্ষণে বেশ ভূমিকা রাখছে। ২০০৯ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমেদ আল-হাসানী। মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ আল-হাসান ওয়াল হোসাইনী আল-মাইজভাণ্ডারী এ সংগঠনটি পরিচালনা করছেন। ১০ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির মাধ্যমে এদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শিল্পী সাইফুল্লাহ সাফা প্রশিক্ষক হিসেবে ক্লাস পরিচালনা করে থাকেন। চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ও ঢাকার মিরপুরের শাহআলীতে তাদের পরিচালিত একটি ফাযিল মাদরাসা ও কওমী মাদরাসা রয়েছে। যেখানে সপ্তাহে ৩ দিন ক্যালিগ্রাফি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। নবীনদের উৎসাহিত করার জন্য এ সংগঠনের রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম। ২০০৯ সালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ও ২০১২ সালে জাতীয় প্রেসক্লাবে ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা এবং ২০১০ সালের মে মাসে ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে ও ২০১২ সালের ১২-২০ জুন পর্যন্ত ৯দিন ব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরের নলীনিকান্ত ভট্টাশালী গ্যালারিতে এবং ২০১৯ সালে ২৬ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি দশদিন ব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। অদূর ভবিষ্যতে এর কার্যক্রম আরো জোরদার হবে বলে আশা করা যায়।[৮৬]

২.৩.৫ বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড (বিসিএজি)

বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড (বিসিএজি) বাংলাদেশের তরুণ ক্যালিগ্রাফারদের সংগঠন। ২০১৪ সালে কতিপয় উদ্যমী তরুণ

চিত্র-৯০: সংগঠনের মনোগ্রাম

৮৬ ...নিক সম্পাদক শিল্পী সাইফুল্লাহ সাফার সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফার এ সংগঠন গড়ে তুলেন। এ সংগঠনের সভাপতি শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ ও সদস্য সচিব শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ। প্রতিষ্ঠার পর ইতোমধ্যেই রাজধানী ঢাকাস্থ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারিতে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে পরপর দু'বার ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া নবীন শিল্পীরা সংগঠনের সংস্পর্শে এসে উৎসাহিত হন এবং ক্যালিগ্রাফি চর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এ সংগঠনের আয়োজিত দু'টি প্রদর্শনীতেই ব্যাপক সংখ্যক নবীন ক্যালিগ্রাফার বিশেষত নারী ও অমুসলিম শিল্পীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। তাছাড়া ২০১৮ সালের মার্চ ও অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে ৫দিন ব্যাপী করে দু'বার প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। যাতে শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।[৮৭]

২.৩.৬ বাংলাদেশ চারুশিল্পী পরিষদ

চিত্র-৯১:সংগঠনের মনোগ্রাম

আর্ট ও ক্যালিগ্রাফি শিক্ষা, চর্চা ও প্রচার-প্রসারের উদ্দেশে ২০১৭ সালে ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ চারুশিল্পী পরিষদ। চারুকলা থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী এবং বিভিন্ন পর্যায়ের শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফারদের নিয়ে এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ। এ সংগঠনে শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। সংগঠনটি ২০১৮ সালে ১২ জুন থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত ঢাকায় মাসব্যপী ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে সফলভাবে সম্পন্ন করে। তাছাড়া পরিষদের উদ্যোগে ২০১৮ সালের মে মাসে ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা এবং ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামে তিনদিন ব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এর প্রতিটি সদস্যই প্রতিনিয়ত অসংখ্য ক্যালিগ্রাফিকর্ম নির্মাণ করছেন। নাসখী ও মুহাক্কাক লিপিতে কুরআনের বেশ কিছু কপি করার পরিকল্পনা রয়েছে এ সংগঠনের। এর সভাপতি ও সেক্রেটারী হলেন যথাক্রমে শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল ও শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম।[৮৮]

---

[৮৭] অত্র সংগঠনের সভাপতি শিল্পী মাহবুব মুর্শিদের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত।

[৮৮] অত্র সংগঠনের সেক্রেটারীর সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.৭ সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের সমন্বয়ে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার (কায়াক)। প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানেই আয়োজন করেছে নবীন শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। ৯ অক্টোবর ২০০৫ হতে দশ দিনব্যাপী জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হলে ১ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এই সংগঠন 'শৈল্পিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে যাতে ইসলামী শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, শিল্প সমালোচনা, ক্যালিগ্রাফারদের সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীর উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যা ক্যালিগ্রাফির প্রচার ও প্রসারে আরেকটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ সংগঠনের মাধ্যমে নবীন শিল্পীদের পারস্পরিক সমন্বয় সাধন, শিল্প পর্যালোচনা এবং নতুন নতুন শিল্পচিন্তায় বেশ অবদান রাখছে বলা যায়। এ সংগঠনের সভাপতি ও সেক্রেটারী হলেন যথাক্রমে- শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ ও শিল্পী আতা ইমরান।[৮৯] তা ছাড়া সংগঠন পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকজন সদস্য রয়েছেন। এ সংগঠনটির কার্যক্রম ঢাকার লালবাগ এলাকায়।

২.৩.৯ ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ

বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা তথা ক্যালিগ্রাফি, স্থাপত্য, তাম্রলিপি, মুদ্রালিপি, উৎকীর্ণ লিপিসহ নানাবিধ মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাপক প্রচার, প্রসার, চর্চা, গবেষণা, সংরক্ষণ ও সর্বোপরি ইসলামিক আর্টস মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার জন্য এ সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। এটি একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- দেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যথাযথ মূল্যায়ন, ডকুমেন্টশন, সেমিনার ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার। এ উদ্দেশ্যে শিল্পকলা সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রদর্শনী, সেমিনার, মুদ্রাসহ ইসলামী প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক দ্রব্যাদি, কুরআন ও ফরমান প্রভৃতির প্রদর্শনী। এটি

---

[৮৯] মিরাজ রহমান, 'সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার আয়োজিত ১ম নবীন শিল্পী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*, জুন-২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৭ সালের ৯ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধিত একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

এ সংগঠনটি ইসলামী আর্ট ও ক্যালিগ্রাফির বিস্তৃতি ও বিকাশে কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ক্যালিগ্রাফির প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ক্যালিগ্রাফার সংবর্ধনা, ক্যালিগ্রাফি ডেমন্সট্রেশন ও সেমিনারের আয়োজন করেছে। ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণে ক্যালিগ্রাফি, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, টাইল্স, টেরাকোটা, কাঠখোদাই, ধাতবকর্ম, স্থাপত্যিক কাঠামো, হস্তশিল্প ইত্যাদির সংরক্ষণ ও এর উপর গবেষণা করে যাচ্ছে। এ বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থ সম্বলিত একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে 'প্রাচ্যদেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' শীর্ষক গ্রন্থ পরপর কয়েক বছর এবং ইসলামী শিল্পকলা বিষয়ক গবেষণাধর্মী লেখা নিয়ে জার্নাল 'ইসলামী শিল্পকলা' প্রকাশিত হয়। ইসলামী শিল্পকলার নিদর্শনাবলিকে জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ সংগঠনটি ইসলামিক আর্ট গ্যালারি এন্ড মিউজিয়ামের প্রস্তাব পাশ করেছে এবং তা বাস্তবায়নে অর্থ সংগ্রহ চলছে। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৮ জন হলেন- সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব অ. ক. ম যাকারিয়া, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সাবেক পরিচালক ড. নাজিম উদ্দিন আহমদ, জাতীয় শ্বিবিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. ওয়াকিল আহমদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক সদস্য ড. এ. কে. এম মোহসিন, জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক ড. এনামুল হক, জাতীয় আর্কাইভসের সাবেক পরিচালক ড. কে. মাহবুবুল করিম অর্গনাইজেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ও সেক্রেটারী অধ্যাপক রাশেদা বেগম।[৯০] এ সংগঠনে ৬০ জন আজীবন সদস্য আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ ইসলামী শিল্পচর্চাকারী, শিল্পসমালোচক, ক্যালিগ্রাফার ও গবেষকদের সমন্বয়ে এ সংগঠনটির পথচলা।

---

[৯০] প্রেস ব্রিফিং: ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ, ৮ মার্চ ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠনটি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সাথে যৌথ উদ্যোগে ২০০৮ সালে ২ আগস্ট সোসাইটির আর্ট গ্যালারিতে দিনব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। তাছাড়া এ উপলক্ষে বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফার শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৫টায় শেষ হয়।[৯১]

২.৩.৯ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

চিত্র-৯২: অত্র সংস্থার মনোগ্রাম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। যা ২২ মার্চ ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমসহ সারাদেশ ব্যাপী মসজিদ ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষাদান, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, অনুবাদ ও গবেষণাধর্মী বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ, ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এ প্রতিষ্ঠান। তার মধ্যে দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে প্রায় প্রতিবছর পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এতে থাকে ওয়াজ মাহফিল, হামদ-নাত মাহফিল, ক্বিরাত মাহফিল, শিশু সমাবেশ, ইসলামী বইমেলা, সেমিনার, রাসূলের শানে স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ ইত্যাদি। বিশেষ করে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররম মসজিদের উত্তর পার্শ্বের বারান্দা ও সাহানে পক্ষকাল ব্যাপী ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং মহানবী (সা.) এর জীবনী ভিত্তিক পোস্টার ও গ্রন্থ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দেশি-বিদেশী বিভিন্ন শিল্পীর নির্মিত এসব শিল্পকর্ম দুপুর ১.৩০ টা হতে সন্ধ্যা ৭.০০ টা পর্যন্ত চলতে থাকে। শিল্প ও রাসূলপ্রেমী দর্শক ও মুসল্লীগণ এ প্রদর্শনী দেখার জন্য ভীড় জমায়।[৯২]

---

[৯১] *Islamic Art*, Edited by Dr. Nazimuddin Ahmeds, Dr. Syed Mahmdul Hasan, Dhaka, 2007, pp.13-17.

[৯২] *ক্যাটালগ: ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা: ১৪৩৬ হি.।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ সালে ১০ থেকে ২৩ আগস্ট ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে শিল্পী সাইফুল ইসলামের পক্ষকালব্যাপী একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে তাঁর ৩৭টি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তৎকালীন ধর্মমন্ত্রী কেরামত আলী।[৯৩]

২.৩.১০ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

চিত্র-৯৩: অত্র সংস্থার মনোগ্রাম

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাংলাদেশের মানুষের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চাকারী প্রতিষ্ঠান। যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। এটি ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এর মহাপরিচালক হলেন লিয়াকত আলী লাকী। আবহমান বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এতে সঙ্গীত, নাট্য, চারুকলা ইত্যাদি বিভাগ রয়েছে। তবে বিগত কয়েক সছরে ইরানী কালচারাল সেন্টার, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ডসহ বিভিন্ন সংগঠন জাতীয় পর্যায়ের বেশ কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক কর্মশালা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া প্রতি দু'বছর পর পর দ্বি-বার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী হয়, যাতে বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়।[৯৪]

২.৩.১১ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের উপর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও নিয়মিত জার্নাল প্রকাশিত হয়। এতে আছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। যাতে রয়েছে

চিত্র-৯৪: অত্র সংস্থার মনোগ্রাম

অনন্য শিল্পী সাইফুল ইসলাম', *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*, ১৮ আগস্ট-১৯৯৫।

[৯৪] ওয়েব সাহঢ: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের অধ্যয়ন ও গবেষণার অবারিত সুযোগ। ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে ২০০৮ সালে ৩ আগস্ট দিনব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফার শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের সংবর্ধনা ও একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী সোসাইটির আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। যা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৫টায় শেষ হয়। কর্মশালা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। কর্মশালায় শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার সকাল ১০টা হতে ১১.৩০টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা ক্যালিগ্রাফি ও ওরিয়েন্টাল আর্ট এবং বেলা ১১.৩০টা হতে ১.০০টা পর্যন্ত শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী সুলুস জালী, দিওয়ানী ও রুক'আহ লিপির উপর প্রশিক্ষণ দেন। বেলা ১টা হতে ২টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টার বিরতির পর ২টা হতে ৫টা পর্যন্ত শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম সুলুস, মুয়াল্লা ও কুফি লিপিশৈলীর উপরে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন।

এছাড়াও ৪ থেকে ৮ আগস্ট পাঁচ দিন ব্যাপী বিকাল ৩.০০টা থেকে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফি ডেমন্সট্রেশন অনুষ্ঠিত হয়। ৪ আগস্ট শিল্পী আবুদ্ দারদা, ৫ আগস্ট শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, ৬ আগস্ট শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, ৭ আগস্ট শিল্পী ভাস্কর রাসা ও ৮ আগস্ট শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন পরিচালনা করেন। এতে নবীন-প্রবীণ অনেক ক্যালিগ্রাফার, শিল্পপ্রেমী দর্শকমণ্ডলী উপস্থিত হয়।[৯৫]

২.৩.১২ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র

ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তারে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্রের রয়েছে অনবদ্য অবদান। বাংলাদেশস্থ ইরানী দূতাবাস পরিচালিত ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্রের নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ক্যালিগ্রাফি চর্চা, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন। বিদেশী

---

[৯৫] *ক্যাটালগ: ক্যালিগ্রাফি ওয়ার্কশপ-২০০৮*, ইসলামী আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, (ঢাকা: ২০০৮), পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

এ সংস্থাটি ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে বেশ কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রদর্শনীর আয়োজন করে। পাশাপাশি বাংলাদেশী আগ্রহী শিক্ষার্থীদেরকে ক্যালিগ্রাফি শিখানোর উদ্দেশ্যে ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র বিগত কয়েক বছর আয়োজন করে ক্যালিগ্রাফি কর্মশালা এবং দু'মাস ব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রশিক্ষণ কোর্স। সপ্তাহে দু'দিন বিকাল ৪.০০টা থেকে ৫.০০টা পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন ইরানের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ও নন্দনতত্ত্ববিদ মিসেস রেজা হাশেমী ও মাহবুবে পুররহীমি মাশহাদী প্রমুখ।[৯৬] বর্তমানে শিল্পী সাইফুল্লাহ সাফা সপ্তাহের শনি, বুধ ও বৃহস্পতিবার তিনদিন বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফি ক্লাস পরিচালনা করে থাকেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সুবর্ণ জয়ন্তীতে ইরানের খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার শিল্পী নাসের নওরোজি মানেশ ঢাকায় এসে অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফারদের সাথে এক অনাড়ম্বর মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। পরের দিন ঢাকাস্থ ইরানী কালচারাল সেন্টারে 'সমকালীন ক্যালিগ্রাফি: ইরান ও বাংলাদেশ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত মত বিনিময় সভা ও কর্মশালায় শিল্পী নাসের নওরোজি মানেশ ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফারদের মাঝে দু'দেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চার বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা উঠে আসে।[৯৭]

---

[৯৬] ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য।

[৯৭] *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

২.৪ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা

২.৪.১ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত প্রদর্শনী

চিত্র-৯৫: অত্র সংস্থার মনোগ্রাম

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বাংলাদেশের ইতিবাচক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম সূতিকাগার। ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশের বিভিন্ন মাধ্যম তথা- ক্বিরাত, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, বক্তৃতা, কার্টুন, সাহিত্য চর্চা, সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র ও গবেষণা ইত্যাদির চর্চা ও বিকাশে এ সংগঠনের রয়েছে অসামান্য অবদান। বিশেষত ইসলামী আর্ট ও ক্যালিগ্রাফির বিকাশে রয়েছে সুদৃঢ় অবস্থান ও পদচারণা। এ সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় গত ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর রাজধানী ঢাকায় জাতীয়ভাবে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পরপর তিন বছর জাতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনটির বর্তমান সভাপতি ও সেক্রেটারী যথাক্রমে কবি মোশারফ হোসেন খান ও জাকীউল হক যাকী। এতে প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তাসহ দু'শতাধিক সদস্য ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তৃত পরিমণ্ডলে নিরন্তর সাধনা করে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠাকালে সংগঠনটির নাম ছিল ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। পরে ২০০৭ সালে সরকারীভাবে নিবন্ধনের সময় এর নাম দেওয়া হয় সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। নিম্নে এ সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো-

২.৪.১.১ প্রথম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৮ সালের ২৬ জুলাই থেকে ২ আগস্ট সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতীয় জাদুঘরে প্রথম যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যা ছিল জাতীয়ভাবে এবং রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ যৌথ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। এতে দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ৫ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন- শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল ও শিল্পী আরিফুর রহমান। ৮ দিন ব্যাপী এ প্রদর্শনীতে পাঁচ শিল্পীর অনিন্দ্য সুন্দর ক্যালিগ্রাফিগুলো দর্শকমন্ডলীর মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং আয়োজকগণ প্রশংসিত হন। ফলে কর্তৃপক্ষ পরের বছর এমন আয়োজনের জন্য উৎসাহবোধ করেন। এ প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক ছিলেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল। শিল্পীগণ সুন্দরের সাথে আধ্যাত্মিক চেতনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে অনিন্দ্য সুন্দর শৈল্পিক নিদর্শন সৃষ্টি করেন দৃষ্টিনন্দন সব ক্যালিগ্রাফি। সুস্থ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ইসলাম যে সুন্দর ও সত্যের কথা বলে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে এসব শিল্পকর্মে। তারা এতে তাদের নিজস্ব দর্শন ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। সেই সাথে যুক্ত হয় দেশীয় ও ইসলামী ঐতিহ্য ধরে রাখার অসীম প্রয়াস।[৯৮]

২.৪.১.২ দ্বিতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯

পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজিত দ্বিতীয় যে প্রদর্শনীটি তা ছিল শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক অংশগ্রহণে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রফি চর্চার অন্যতম দিকপাল এ শিল্পীর অসাধারণ শিল্পমাধুর্য সম্পন্ন মোট ৫২টি শিল্পকর্ম এতে প্রদর্শিত হয়। যা উপস্থিত দর্শকদের আনন্দের খোরাক জোগায় এবং দর্শকদের মাঝে ব্যাপক অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। হৃদয়ের মাঝে চেতনার মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়। যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী বছরগুলোতেও এ আয়োজনের ধারা অব্যাহত থাকে।[৯৯] ক্যানভাসে তেলরঙ ও পানিরঙে করা কুরআনের আয়াত, হাদীস, কালিমা, বিসমিল্লাহ, সালাম, লাব্বাইক, বিমূর্ত ও আবহমান গ্রাম বাংলার প্রতিকৃতি তাঁর

---

[৯৮] *ক্যাটালগ: ১ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৮*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।
[৯৯] *ক্যাটালগ: ২য় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকর্মে ফুটে উঠে। প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। এতে বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক সৈয়দ আলী আহসান ইব্রাহীম মন্ডলের ক্যালিগ্রাফি শিল্পের উপর মূল্যায়ন ভিত্তিক একটি নিবন্ধ লিখেন। এ প্রদর্শনী সুকুমার শিল্পচর্চার বহিঃপ্রকাশ এবং আমাদের সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে যে সংযোজন ঘটায় তা নতুন প্রজন্মকে সুচিন্তা ও আচরণের কর্ষণে অনুপ্রাণিত করে। বর্তমান বিশ্বায়ন ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার চরম বিকাশের ফলে আমাদের সুকুমার বৃত্তি ও নান্দনিক শিল্পের পরিচর্যায় অনেকটা অধঃগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরূপ পরিস্থিতিতে এ জাতীয় প্রদর্শনী একঘেয়ে নগর জীবনে ক্ষণিকের জন্য হলেও প্রশান্তি বয়ে আনে।

২.৪.১.৩ তৃতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ২০ জুন থেকে ২ জুলাই ২০০০ জাতীয় জাদুঘরে। এতে ৭ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন- শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী আবদুশ শাকুর, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী আমিরুল হক (ইমরুল) ও শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ প্রমুখ। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার প্রিন্ট মেকিং মিডিয়ায় মুসলিম লিপিকলার সার্থক প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। শিল্পী আবদুশ শাকুর প্রাচীন বাংলা পাণ্ডুলিপির লেখামালা নতুন আঙ্গিকে তাঁর চিত্রমালায় স্থান দেন। শিল্পী সাইফুল ইসলাম আল্লাহু আকবারকে এক নতুন রূপকল্পে সাজাবার প্রয়াস পান। এছাড়া পবিত্র কুরআনের বাণী, হাদীস ও নীতিকথা থেকে চয়ন করে আরবী লিপির উল্লম্ব, সমান্তরাল ও কৌণিক রেখায় টান-টোন কে কখনও মসজিদের আবহে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেন। বাংলা হরফকেও তিনি সুচারুরূপে আরবী লিপিকলার ফর্মে সার্থকভাবে তাঁর ক্যানভাসে উপস্থাপন করেন। শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল চমৎকার বর্ণিল ক্যানভাসে মুসলমানদের অভিভাদন তথা 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। শিল্পী আরিফুর রহমানের দক্ষ তুলি চালনা ও বর্ণলেপনের কুশলতা তাঁর আরবী লিপিকলার জন্য সমাদৃত হয়েছে। গাঢ় কালো প্রেক্ষাপটে ট্রাডিশনাল ফন্টে তাঁর লেখা 'ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহিল আন আতক্বাকুম' আধুনিক আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পী আমিরুল হক ও শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ বর্ণিল ক্যানভাসে

Dhaka University Institutional Repository

যথাক্রমে বিসমিল্লাহ ও কুরআনের আয়াত অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেন।[১০০] প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে নিবন্ধ রচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমা খান মজলিস।

২.৪.১.৪ চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০১

শৈল্পিক বোধ ও বর্ণবিন্যাসের রূপচ্ছটা নিয়ে পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ২০০১ সালে জাতীয় জাদুঘরের নলীনিকান্ত ভট্টাশালী গ্যালারিতে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে পক্ষকাল ব্যাপী চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় ক্যালিগ্রাফারগণ অংশগ্রহণ করেন। তাদের পানিরং,, গোয়াস, এক্রিলিক ও মিশ্র মাধ্যমে করা মোট প্রায় ৭০টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে ছিল কুরআনের আয়াত, হাদীস, আরবী প্রবাদ ও নীতিবাক্য এবং কালিমার ক্যালিগ্রাফি। এ প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ক্যাটালগও প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পবোদ্ধাগণ। ঢাকাসহ সারাদেশ থেকে আগত দর্শকদের সরব উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলে।[১০১] প্রত্যেকের শিল্পে এক অভিনব রূপ ফুটে উঠে এবং তাতে শিল্পমন ও ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

২.৪.১.৫ পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৭ মে থেকে ৪ জুন ২০০২ সালে। পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত পক্ষকাল ব্যাপী এ প্রদর্শনীতে ২৪ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণ হলেন- শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী ড. আবদুস সাত্তার, শিল্পী সবিহ-উল আলম, শিল্পী মীর রেজাউল

---

[১০০] প্রদর্শনীর আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য।

[১০১] *ক্যাটালগ: ৪র্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০১*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

করিম, ভাস্কর রাসা, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমীন, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, শিল্পী মুহাম্মদ আমিরুল হক (ইমরুল), শিল্পী খন্দকার মনিরুজ্জামান, শিল্পী মুহাম্মদ মনোয়ার হোসাইন, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী আবুদ্ দারদা নূরুল্লাহ ও শিল্পী মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় সংসদের তৎকালীন স্পীকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার এবং আলোচক হিসেবে মোস্তফা জামান আব্বাসী, অধ্যাপক আবদুল মতিন সরকার ও শিল্পী সবিহ-উল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার। আর প্রদর্শনীর আহবায়ক ও সদস্য সচিব ছিলেন যথাক্রমে- শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল ও শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।[১০২] প্রদর্শনীতে শিল্পীদের কর্মে বাংলার প্রকৃতি, গাছ, লতা-পাতা, ফুল, পাতার রস, আরবী ও বাংলা বর্ণমালা ইত্যাদির সৃজনশীল শিল্পময় প্রয়োগ, নতুন নতুন ফর্ম নির্মাণ, চিত্রপটে নান্দনিক আবহ তৈরি সব মিলে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করে।

২.৪.১.৬ ষষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩

জাতীয় জাদুঘর গ্যালারিতে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত ষষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ১৪-২৪ জুন থেকে ২০০৩ সালে। এ প্রদর্শনীতে ৪২ জন শিল্পীর ১৬২টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন- শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী সবিহ-উল আলম, শিল্পী মীর মুহাম্মদ রেজাউল করিম, শিল্পী এ. এইচ. এম বশির উল্লাহ, শিল্পী কামরুল হাসান কালন, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী

---

[১০২] *ক্যাটালগ: ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০২, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

খন্দকার মনিরুজ্জামান, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমীন, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী আমিরুল হক (ইমরুল), শিল্পী সৈয়দ আবদুল হান্নান, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী নাঈম মাহমুদী, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী মুহাম্মদ মনোয়ার হোসাইন, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী, শিল্পী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, শিল্পী নূর আহমেদ মাসুম, শিল্পী ওবায়দুর রহমান ফারুক, শিল্পী মাসুম আখতার মিলি, শিল্পী আইয়ুব আলী রোকন, শিল্পী নাজমুন সাঈদা পলি, শিল্পী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, শিল্পী আবুল খায়ের, শিল্পী আরেফা বেগম চৌধুরী (ঝিনুক), শিল্পী মোঃ জুয়েল, শিল্পী মুসাম্মৎ মুকাররমা, শিল্পী নিসার উদ্দিন জামিল, শিল্পী শর্মীলা কাদের ও শিল্পী রেশমা আখতার প্রমুখ। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- তৎকালীন ভূমিমন্ত্রী এম. শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন- অধ্যাপক ড. হাবিবা খাতুন ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক আহমদ নজীর ও শিল্পী সবিহ-উল আলম। সভাপতি ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন- যথাক্রমে অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর ও শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল।[১০৩] এ প্রদর্শনীতে নানা বৈচিত্রময় চিত্র সম্বলিত শিল্পকর্মগুলোয় অবলীলায় উঠে এসেছে নিবিড় ধ্যান ও বোধের রেখার সমন্বিত এক মুগ্ধ কথোপকথন।

২.৪.১.৭ সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪

২০০৪ সালের ১ জুন থেকে ১৫ জুন জাতীয় জাদুঘরের নলীনিকান্ত ভট্টাশালী গ্যালারিতে পক্ষকাল ব্যাপী সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে ৩৪ জন শিল্পীর শতাধিক ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীগণ হলেন- শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী সবিহ-উল আলম, শিল্পী এ. এইচ. এম বশির উল্লাহ, শিল্পী কামরুল হাসান কালন,

---

[১০৩] *ক্যাটালগ: ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৩, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ভাস্কর রাসা, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী খন্দকার মনিরুজ্জামান, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী আবুদ্ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী শর্মিলা কাদের, শিল্পী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী মাসুম আখতার মিলি, শিল্পী ফেরদৌসি বেগম, শিল্পী হাসান মোর্শেদ, শিল্পী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, শিল্পী ফজলে বারী মামুন, শিল্পী আতা ইমরান ও শিল্পী নিসার জামিল প্রমুখ। এতে তারা তাদের শিল্পীমন ও শিল্পায়নের সৌন্দর্য সার্থকতার সাথে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ইসলামী আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক আহমদ নজীর, শিল্পী সবিহ্-উল আলম ও মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী প্রমুখ।[১০৪]

২.৪.১.৮ অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫

৫ থেকে ১৭ জুন ২০০৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত অষ্টম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রদর্শনীতে ৩৩ জন শিল্পীর বাছাইকৃত শতাধিক ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। শিল্পী মুর্তজা বশীরের 'কালিমা তাইয়িবা', শিল্পী আবু তাহেরের 'বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি', শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তারের 'বাংলা বর্ণমালা', শিল্পী মনিরুল ইসলাম ও শিল্পী সৈয়দ এনায়েত হোসেন এর 'ড্রইং ও পেইন্টিং', শিল্পী এ.এইচ.এম বশির উল্লাহর 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন', শিল্পী সাইফুল ইসলামের 'কালিমা', শিল্পী মীর রেজাউল করিমের 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', শিল্পী ফরেজ আলীর 'ইকরা বিসমি রাব্বি কাল্লাযি খালাক', শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের 'আল্লাহু আকবার', শিল্পী আরিফুর রহমানের 'ত্বা-সীন-মীম', শিল্পী

---

[১০৪] *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শহীদুল্লাহ এফ. বারীর 'ওয়ামা আরসালনাকা', শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের 'ওয়াফী আনফুসিকুম আফালা তুবছিরুন', শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান এর 'খালাক', শিল্পী মাহবুব মুর্শিদের 'সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি আম্মা ইয়াসিফুন', শিল্পী বশির মেসবাহর 'আর-রাহমান আর রাহীম', শিল্পী আবদুর রহীমের 'আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমা ইন্নাল কুলুব', শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদারের 'বিমূর্ত', শিল্পী আমিরুল হকের 'কালিমা', শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদের 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ ও শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহর 'বিমূর্ত', শিল্পী আবুদ্ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহর 'কালিমা', শিল্পী ইসহাক আহমেদের 'আল্লাহু', শিল্পী মাসুম বিল্লাহর 'বিসমিল্লাহ', শিল্পী আতা ইমরানের 'আরবী বর্ণমালা', শিল্পী মাসুম আখতার মিলির 'হুয়াল্লাহু', শিল্পী নিসার উদ্দিন জামিলের 'আল্লাহু নুরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব', শিল্পী ফেরদৌসী বেগমের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু', শিল্পী মহিউদ্দিন আহমেদের 'আল-জান্নাতু তাহতা আকদামিল উম্মাহাত', শিল্পী ফজলে বারী মামুনের 'লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকভীম', শিল্পী আব্দুল্লাহর 'কালিমা' ও শিল্পী মুর্শিদ আলমের 'ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে প্রদর্শনীর উপর একটি প্রতিবেদন লিখেন ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী।[১০৫] প্রদর্শনীতে ক্যালিগ্রাফারগণ রঙের ব্যবহার, দৃশ্যপট ও প্রেক্ষিত সৃষ্টি এবং আলো-ছায়ার সুষম উপস্থাপনের মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফিতে গতিময়তা ও স্পন্দন বয়ে আনতে যে পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন তা শিল্প-সমালোচকদের দৃষ্টিতে প্রশংসার দাবি রাখে। তারা তাদের শিল্পকর্মগুলোকে সুলুস, তুঘরা, কুফী, দিওয়ানী, নাসতা'লিক শৈলীতে উপস্থাপন করেছেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার এবং বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে অধ্যাপক ড. নাজমা খান মজলিস, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. সাইফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[১০৬]

---

[১০৫] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, প্রাগুক্ত, ঢাকা।

[১০৬] আমিনুল ইসলাম আমিন, 'গোলাপ ফোটার সময় ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫', *দৈনিক যুগান্তর*।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪.১.৯ নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬

২০০৬ সালের ৬ মে-২০ মে জাতীয় জাদুঘরের নলীনিকান্ত ভট্টাশালী গ্যালারিতে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনীতে ২৬ জন শিল্পীর ১১০টি ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। এ প্রদর্শনীতে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন- শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী সৈয়দ এনায়েত হোসেন, শিল্পী এ. এইচ. এম বশির উল্লাহ, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী মীর রেজাউল করিম, শিল্পী ফরেজ আলী, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী জাহাঙ্গীর হোসাইন, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী কৃষাণ মোশাররফ, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী আমিরুল হক (ইমরুল), শিল্পী মুহাম্মদ আবুল ফজল, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ, শিল্পী আবুদ্ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী ফেরদৌসী বেগম, শিল্পী নিসার জামিল, শিল্পী মোঃ আব্দুল্লাহ ও শিল্পী মোর্শেদুল আলম প্রমুখ। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে সাংবাদিক সাদেক খান এর ‘সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রর ৯ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬’ শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এ প্রদর্শনীটির আহবায়ক ছিলেন শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল। শিল্পীদের রঙ-তুলিতে আঁকা কুরআনের আয়াত, হাদীস, কা‘বা শরীফ, বাংলা ভাষার কবিতার অতি চেনা পঙ্ক্তিমালা বা নীতিবাক্য দিয়ে গড়া ক্যালিগ্রাফিগুলোতে এমনভাবেই ফুটে উঠে ইসলামী সংস্কৃতির স্বপ্নীল ঐতিহ্য। তেলরঙ, পানিরঙ, মিশ্রমাধ্যম, এক্রিলিক, কোলাজ ও ডিজিটাল পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে ফুটে উঠে তুঘরাসহ শৈলীভিত্তিক বিভিন্ন ক্যালিগ্রাফি ও ফ্রি-হ্যান্ডের নিখুঁত কাজগুলো।[১০৭] শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার, বিশেষ অতিথি ছিলেন- ড. সৈয়দ মাহমুদুল

---

[১০৭] *ক্যাটালগ: ৯ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৬, প্রাগুক্ত, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক ড. নাজিম উদ্দিন, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক আহমদ নজীর ও আমার দেশ সম্পাদক আমানুল্লাহ কবীর।[১০৮]

২.৪.১.১০ দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের দশম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৮ সালের ১৫ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য এ প্রদর্শনীতে ৩৯ জন নবীন-প্রবীণ ক্যালিগ্রাফার অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন- শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী সবিহ-উল আলম, শিল্পী এ. এইচ. এম বশির উল্লাহ, শিল্পী আহমেদ নওয়াজ, শিল্পী মীর রেজাউল করিম, ভাস্কর রাসা, শিল্পী ফরেজ আলী, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী জাহাঙ্গীর হোসাইন, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী ফেরদৌসী বেগম, শিল্পী শর্মিলা কাদের, শিল্পী জামিল হামিদী, শিল্পী মোঃ আব্দুল্লাহ, শিল্পী মোরশেদুল আলম, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী মোঃ কামাল আহমদ, শিল্পী আজিজুর রহমান তালুকদার, শিল্পী হাসনাইন, শিল্পী মোঃ আতাউর রহমান, শিল্পী জাকির হোসাইন জুয়েল, শিল্পী মোঃ তাওফিকুর রহমান, শিল্পী বাচ্চু ধর পাল, শিল্পী মাহফুজুর রহমান শিমুল, শিল্পী এইচ. এম আব্দুল্লাহ আল-মামুন, শিল্পী নাহিদ রোকসানা, শিল্পী আতাউল্লাহ, শিল্পী মুহাম্মদ মহিউদ্দিন ও শিল্পী আবুদ্ দারদা নূরুল্লাহ প্রমুখ। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন- ইসলামিক আর্টস ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। সভাপতি ছিলেন- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক ভূঁইয়া শফিকুল ইসলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে অধ্যাপক সাইফুল্লাহ

---

[১০৮] শাহাবুদ্দীন চৌধুরী, ‘অনিন্দ্য সুন্দর ক্যালিগ্রাফিতে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি’, *দৈনিক আমার দেশ*, ৭ মে-২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

মানছুর ও আহবায়ক ইব্রাহীম মন্ডল। প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি আকর্ষণীয় ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। যাতে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮ শিরোনামে ড. আব্দুস সাত্তারের একটি লেখা প্রকাশিত হয়।[১০৯]

উল্লেখ্য, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত উপরিউক্ত দশটি প্রদর্শনীর মধ্যে ২য় প্রদর্শনীটির অর্থায়ন করে স্পন্দন অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার, প্রীতি প্রকাশন এবং প্রত্যয়ন প্রিন্টার্স ও প্রোডাক্টস লিমিটেড। আর বাকী নয়টি প্রদর্শনীতে এককভাবে অর্থায়ন করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। আর সবগুলো প্রদর্শনীই ছিল ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ-এর সৌজন্যে।

২.৪.২ জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা

২.৪.২.১ প্রথম জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১১

পবিত্র রবিউল আউয়াল ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজন করে প্রথম জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১১। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার মোট ১৮৭ জন ছাত্র-ছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। শিশু থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ক গ্রুপে ১১৯ জন এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ৬৮ জন ক্ষুদে ক্যালিগ্রাফির এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তারা বাংলা, ইংরেজি ও আরবী ভাষায় হরফ সাজিয়ে সুন্দরভাবে তাদের চিত্রকর্ম উপস্থাপন করে। তাদের রং-তুলিতে নান্দনিকভাবে ফুটে উঠে মহান আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বগাথা আল্লাহু আকবার, বিসমিল্লাহ, আল্লাহর গুণবাচক নাম ও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অংশবিশেষ।

---

[১০৯] *ক্যাটালগ: ১০ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া তারা এঁকেছে ৫২ এর শহীদের রক্তে রাঙানো মহান একুশের স্মৃতি বিজড়িত শহীদ মিনার ও প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত বিষয়াদি।

প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী হামিদুল ইসলাম, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী ও শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল। প্রতিযোগিতায় ক গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে- সুমাইয়া ফাতিমা শরীফ, মাসকুরা বিনতে মান্নান ও মুবাশ্বির রহমান সিদ্দিকী স্বচ্ছ এবং খ গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে- সাদিয়া নার্গিস, মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন ও রাসেল আহমদ। বিজয়ী প্রত্যেককে নগদ অর্থ, ক্রেস্ট, বই ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।[১১০]

২.৪.২.২ দ্বিতীয় জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১২

২৪ ফেব্রুয়ারি-২০১২ শুক্রবার সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও পবিত্র আউয়াল উপলক্ষে দ্বিতীয় জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা থেকে আগত ক্ষুদে শিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করে। শিশু থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যাদের বয়স অনূর্ধ ১২ বছর তারা ক গ্রুপে এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি শিক্ষার্থীরা যাদের বয়স অনূর্ধ ১৭ বছর তারা খ গ্রুপে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এতে দু'গ্রুপে প্রায় ২ শতাধিক ক্ষুদে ক্যালিগ্রাফার অংশ নেয়। তারা বাংলা, ইংরেজি ও আরবী ভাষায় হরফ সাজিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে অনিন্দ্য সুন্দর ক্যালিগ্রাফি। তাদের রকমারি রঙ ও তুলির আলতো ছোঁয়ায় ফুটে উঠে বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, কুরআনের আয়াত, হাদীস, আরবী প্রবাদ-প্রবচন

---

[১১০] 'বার্ষিক প্রতিবেদন: সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র', *সাহিত্য সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা-২০১১, এপ্রিল, পৃ.৩৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি। এছাড়া তারা এঁকেছে ৫২ এর ভাষা শহীদের রক্তে রাঙানো মহান একুশের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থাপনা ও প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট, নগদ অর্থ ও বই প্রদান করা হয়।[১১১]

২.৪.২.৩ তৃতীয় জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১৩

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও পবিত্র রবিউল আউয়াল উপলক্ষে তৃতীয় জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১৩ অনুষ্ঠিত হয় ১ ফেব্রুয়ারি-২০১৩ শুক্রবার সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে। রাজধানী ঢাকা ও তার আশে-পাশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, কওমী ও আলিয়া মাদরাসা থেকে অনেক শিশু-কিশোর শিল্পীরা এতে অংশ নেয়। শিশু থেকে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যাদের বয়স অনূর্ধ ১২ বছর তারা ক গ্রুপে এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি শিক্ষার্থীরা যাদের বয়স অনূর্ধ ১৭ বছর তারা খ গ্রুপে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এতে দু'গ্রুপে প্রায় ৩ শত ক্ষুদে ক্যালিগ্রাফার অংশ নেয়। তারা বিভিন্ন ভাষায় তাদের ক্যালিগ্রাফিকর্ম সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে প্রয়াস পায়। তারা তাদের রঙ-তুলিতে মনের মাধুরী মিশিয়ে ফুটিয়ে তুলে কুরআনের আয়াত, হাদীস, আল্লাহু আকবার, বিসমিল্লাহ, ৫২ এর ভাষা শহীদদের নাম, তাদের স্মৃতি বিজড়িত শহীদ মিনারের চিত্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ইসলামী বিষয়সমূহ। প্রতিযোগিতার শেষে এক অনাড়ম্বর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট, নগদ অর্থ ও বই প্রদান করা হয়।[১১২] শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী হামিদুল ইসলাম ও শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

২.৪.৩ বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড (বিসিএজি)

২.৪.৩.১ প্রথম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০১৪

---

[১১১] *হ্যান্ডবিল ও পোস্টার:* দ্বিতীয় জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১২
[১১২] *হ্যান্ডবিল:* তৃতীয় জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড (বিসিএজি) ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ১৬ থেকে ২৫ জুন-২০১৪ দশদিন ব্যাপী ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং প্রদর্শনী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সকাল ১০.০০টা হতে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনীতে নবীন ও প্রবীণ ১৯ জন বিশিষ্ট শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এতে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন- শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী প্রদ্যুত কুমার দাস, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী মাসুম আখতার মিলি, শিল্পী এস. এম মিজানুর রহমান, শিল্পী কামাল আহমেদ, শিল্পী নাজমুন নাহার, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী মোঃ শামীম হোসাইন, শিল্পী তাকী হাসান, শিল্পী ওসমান হায়াত, শিল্পী আরেফা বেগম চৌধুরী, শিল্পী শওকত ইমরান, শিল্পী মঞ্জুর হোসাইন ও শিল্পী সুমাইয়া সুলতানা সালওয়া প্রমুখ। প্রদর্শনীটির অর্থায়ন করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, হামদর্দ, মাসকান লিমিটেড ও স্কাই টাচ। প্রদর্শনীর আহবায়ক ছিলেন- সংগঠনের সভাপতি শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ ও সদস্য সচিব ছিলেন শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ।[১১৩]

২.৪.৩.২ দ্বিতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০১৫

বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড (বিসিএজি) ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ৩ থেকে ৯ জুলাই-২০১৫ সপ্তাহব্যাপী দ্বিতীয় ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং প্রদর্শনী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সকাল ১১.০০টা হতে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনীতে নবীন ও প্রবীণ ৩৬ জন শিল্পীর ১৪০টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। ওয়াটার কালার, ওয়েল কালার, এক্রিলিক ও মিশ্র মাধ্যমে আঁকা এসব শিল্পকর্মে উপস্থাপিত হয়েছে আরবী, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বর্ণিল নান্দনিকতা। এতে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন- শিল্পী সবিহ-উল আলম, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী

---

[১১৩] *ক্যাটালগ: ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং প্রদর্শনী-২০১৪*, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ডস, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী কানিজ ফাতেমা জয়তী, শিল্পী হোমায়রা লোপা, শিল্পী চন্দন কুমার সরকার, শিল্পী নাহিদা নিশা, শিল্পী অমিত নন্দী, শিল্পী ঈশা লাবণ্য, শিল্পী মাহফুজুর রহমান, শিল্পী লিজা ইরিন, শিল্পী শারমিন আক্তার, শিল্পী বেলাল হোসেন, শিল্পী নূরে আলম, শিল্পী শাবনুর জামান, শিল্পী শামিম আকন্দ, শিল্পী আসমা আক্তার, শিল্পী দীনা আকন্দ, শিল্পী নাজমুন নাহার, শিল্পী প্রদ্যুত কুমার দাস, শিল্পী এস. এম মিজানুর রহমান, শিল্পী কামাল আহমেদ, শিল্পী ওসমান হায়াত, শিল্পী তাকী হাসান, শিল্পী মঞ্জুর হোসাইন, শিল্পী জোনায়েদ, শিল্পী নাদিয়া বিনতে আমিন, শিল্পী শামসুল আরেফিন, শিল্পী বায়েজীদ, শিল্পী এনায়েত মোনেম, শিল্পী সুজন মাহবুব, শিল্পী তারিক তোরাগ, শিল্পী জাহাঙ্গীর আলম, শিল্পী সুমাইয়া সুলতানা সালওয়া ও শিল্পী ইনায়েতুল্লাহ প্রমুখ। ৩ জুলাই ২০১৫ রোজ শুক্রবার বিকাল ৪টায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শিল্পী সবিহ-উল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ।[১১৪]

২.৪.৪ সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার আয়োজিত প্রদর্শনী-২০০৫

গত ৯ অক্টোবর ২০০৫ হতে দশ দিনব্যাপী জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হলে ১ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দেশের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার আয়োজিত প্রদর্শনীতে ১২ জন শিল্পীর কুফী, সুলুস, রুক'আহ, দিওয়ানী, নাসতা'লিক ও ফ্রি-হ্যান্ড ইত্যাদি লিপি প্রাসঙ্গিকতাসহ চিত্রিত প্রায় অর্ধশত শিল্পকর্ম স্থান পায়। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন- শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী আতা ইমরান, শিল্পী হাসনাইন কবীর, শিল্পী মোরশেদুল আলম, শিল্পী এনামুল হক, শিল্পী কামাল আহমেদ, শিল্পী মিরাজ রহমান, শিল্পী তারিক আজিজ, শিল্পী বদরুদ্দোজা মামুন, শিল্পী আলাদিন জিয়াদ, শিল্পী জাকির হোসেন ও শিল্পী বাচ্চু ধর পাল প্রমুখ। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শিল্পসমালোচক সাদেক খান, আতাউস সামাদ, ড. আব্দুস সাত্তার ও

---

[১১৪] গাজী মুনছুর আজিজ, 'অক্ষরে বৈচিত্র', *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ৭ জুলাই-২০১৫, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

কবি আব্দুল হাই শিকদার। শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন শিল্পী সাইফুল ইসলাম।[১১৫]

২.৪.৫ সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমদ মাইজভাণ্ডারী ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশনের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী

নবীন ক্যালিগ্রাফারদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ মইনুদ্দীন আহমদ মাইজভাণ্ডারী ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহজাহান মিয়া। ২০১২ সালের ১২-২০ জুন পর্যন্ত ৯ দিন ব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে এবং ২০১৯ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ১০ দিন ব্যাপী জাতীয় জাদুঘরের নলীনিকান্ত ভট্টাশালী গ্যালারিতে জাতীয় পর্যায়ে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

২.৪.৬ বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

মাতৃভাষা মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। প্রত্যেক জাতি তার নিজ নিজ দেশের ভাষায় মনের আবেগ, অনুভূতি প্রকাশ করে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আল-হাদীস ও ইসলামের চেতনা সম্বলিত কথামালা যে ভাষার ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমেই প্রকাশ করা হোক না কেন তা ইসলামী ক্যালিগ্রাফি হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলা ভাষায় ক্যালিগ্রাফি সম্ভব কি না? প্রথমদিকে শিল্পবোদ্ধাদের মাঝেও এমন প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় সাধক ক্যালিগ্রাফারের একনিষ্ঠ শ্রম-সাধনায় তা বাস্তবে রূপ নেয়। যদিও আল-কুরআন আরবী ভাষায় রচিত। তাই আরবী ক্যালিগ্রাফি বুঝার জন্য বাংলা ক্যালিগ্রাফি চর্চার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ যে ভাষারই ক্যালিগ্রাফি হোক না কেন প্রথমে এর প্রতি আগ্রহ, উদ্দীপনা ও উদ্বেলতা সৃষ্টি হলে স্বভাবতই আরবী ক্যালিগ্রাফির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাই আরবী ক্যালিগ্রাফির বিকাশের জন্য বাংলা ক্যালিগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা

---

[১১৫] মিরাজ রহমান, 'প্রতিবেদন: সেন্টার ফর এশিয়ান ইসলামিক আর্ট এন্ড কালচার আয়োজিত ১ম নবীন শিল্পী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*, জুন-২০০৬, পৃ.৩০।

Dhaka University Institutional Repository

অনস্বীকার্য। নিম্নে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

২.৪.৬.১ বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি আয়োজিত প্রদর্শনী-২০০৩

১৪১০ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হল গ্যালারিতে সপ্তাহব্যাপী 'প্রথম বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী'র অয়োজন করে। ২০০৩ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল এটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬ জন ক্যালিগ্রাফার অংশগ্রহণ করেন। তারা হলেন- শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী মাসুম আখতার মিলি ও শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী প্রমুখ। এতে প্রায় অর্ধশত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। তার মধ্যে শিল্পী আরিফুর রহমানের বাংলাদেশ, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদের সূরা ইখলাসের অনুবাদ, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদারের তুলির ক্যানভাসে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বর্ণমালা, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ'র 'হে আসরি বাঁশরী হও', শিল্পী মাসুম আখতার মিলির 'আল্লাহু' ও শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালীর 'আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীর অর্থায়ন করে- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি, যুবক, আইক্যাব হাউজিং লিমিটেড, আল-বারাকা ইসলামিক হাসপাতাল ও পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে দু'টি লেখা প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদভুক্ত শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল আলম-এর লেখা 'নান্দনিক শিল্প ক্যালিগ্রাফি: বাংলাদেশে এর চর্চা প্রসঙ্গে' এবং শিল্পী আরিফুর রহমান-এর 'বাংলা বর্ণমালায় ক্যালিগ্রাফি'।[১১৬] বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

২.৪.৬.২ আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫

---

[১১৬] *ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৩, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড যৌথভাবে ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ তিনদিন ব্যাপী জাতীয় জাদুঘরের নভেরা হল গ্যালারিতে 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫-এর আয়োজন করে। ব্যবস্থাপনায় ছিল- বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি। এতে ১৫ জন শিল্পীর প্রায় অর্ধশত ক্যালিগ্রাফিকর্ম স্থান পায়। অংশগ্রহণকারী ক্যালিগ্রাফারগণ হলেন- শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমদ, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী মাসুম আখতার মিলি, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ, শিল্পী আবুদ্ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী আতা ইমরান, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী নূর আহমেদ মাসুম, শিল্পী শাহ ইফতেখার তারিক প্রমুখ। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ কে এম ইয়াকুব আলীর 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি: সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা' শীর্ষক একটি লেখাও প্রকাশিত হয়।[১১৭] ভাষার মাসে বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর এ আয়োজন ছিল মাতৃভাষার প্রতি সত্যিকার ভালবাসার এক অনন্য উম্মোচন।

২.৪.৭ একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

২.৪.৭.১ শিল্পী মুর্তজা বশীরের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৭৯

১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে The Light (জ্যোতি) শিরোনামে শিল্পী মুর্তজা বশীরের একক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর এ প্রদর্শনীতে অনেকগুলো ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। তিনি তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে প্রথমত জায়নামাজ, তসবিহ, তাবিজ প্রভৃতি লোকজ মোটিফ ও সোলেমানী নক্‌শাকে জ্যামিতিক প্যাটার্নে ব্যবহার করেছেন। যাতে তাঁর শিল্পকর্মে নিজস্ব সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগের প্রচ্ছদে একটি ক্যালিগ্রাফির ছবি দেওয়া হয়। যেখানে একটি হাতের মধ্যে আল্লাহ লিখে আল্লাহর ক্ষমতা এবং আল্লাহ শব্দের চারপাশে চারটি রঙের বিন্যাসকে সর্বময় ক্ষমতার প্রতীকী উপস্থাপন করা হয়। ১৯৯৫ সালের ২৭ অক্টোবর দৈনিক সংগ্রামে শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারীর একটি ক্যালিগ্রাফি

---

[১১৭] *ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন- '১৯৭৯ সালে তাঁর হজ্জযাত্রা কালে হিজবুল বাহারের নামাজ কক্ষে শিল্পী মুর্তজা বশীরের দু'টি ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং তিনি দেখেছেন। যাতে তিনি সোনালি মেটাল রং ব্যবহার করেছেন।'[১১৮]

২.৪.৭.২ শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯

পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ১৮ থেকে ২৮ জুলাই ১৯৯৯ সালে জাতীয় জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে পানিরঙ, তেলরঙ ও গোয়াস মাধ্যমে করা তাঁর মোট ৫২টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে ছিল- শুরুতেই, বিপ্লবের ঘোষণা, শান্তি কামনা, নির্ভরতা, শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা, সকল প্রশংসা, আত্মসমর্পন, আমি হাজির, সুন্দরতম নাম, প্রথম নির্দেশ, সদা উজ্জ্বলকৃত, বেহেশতি পাথর, অবিনশ্বর সত্ত্বা, অকৃতজ্ঞ হয়ো না, সত্য সমাগত, তিনি আল্লাহ, বিশ্বের রহমত, দরূদ, শুভ সূচনা, রূপময় আল্লাহ, পরশমনি, আশেক-মাশুক, সিয়াম, গ্রাম-বাংলা, উত্তম মানুষ, তিজারত, গ্রাম-বাংলা, তাহাজ্জুদ, বিপর্যয়, পাহাড়ী নিসর্গ, জীবন যাত্রা, সকালের যাত্রা, আল্লাহর নাম, মাছ ধরা, গাড়িয়াল ভাই, কাজের সন্ধানে, নৌকা, পবিত্রতম নাম ও সকলি তাঁর দান ইত্যাদি শিরোনামের শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। এ প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে 'ইব্রাহীম মন্ডলের হস্তলিখন শিল্প' শিরোনামে সৈয়দ আলী আহসানের একটি লেখা প্রকাশিত হয়।[১১৯]

২.৪.৭.৩ শিল্পী সাইফুল ইসলামের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০

২০০০ সালের ১৪-২৪ অক্টোবর জাতীয় জাদুঘরে শিল্পী সাইফুল ইসলামের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫টি বাংলা ক্যালিগ্রাফিসহ মোট ১২০টি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। ১৪

---

[১১৮] মোহাম্মদ আবদুর রহীম, 'একজন বটবৃক্ষ', *ক্যালিগ্রাফ আর্ট*, প্রাগুক্ত, ঢাকা।

[১১৯] *ক্যাটালগ: শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯*।

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমান। তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক মতলুব আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক মহাপরিচালক এ এফ এম ইয়াহইয়া। প্রদর্শিত শিল্পকর্মের মধ্যে ৬০টি কালি-কলম ও ৬০টি তৈলচিত্র। এর মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যের কাজটির শিরোনাম 'ধরায় ইসলাম'। আবছায় অন্ধকার আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির আলোয় আলোকিত পবিত্র কা'বাগৃহ। মূল্য দেড়লক্ষ টাকা। বিমূর্ত স্কেচে রঙের খেলায় আরবী ও বাংলা হরফে লেখা সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বনিয়ন্ত্রার নাম 'আল্লাহ'। একই স্পেসে দু'ভাষার চমৎকার বিন্যাস। এছাড়া প্রভূ নিরঞ্জন, নিরাকার, অনন্ত, অসীম, তিনিই মহান আল্লাহ ইত্যাদি শিরোনামীয় ক্যালিগ্রাফি। তাঁর শিল্পকর্মগুলো দর্শকদের মন ভরিয়ে দেয়। রেখার গতিময়তা, বলিষ্ঠতা, ক্ষিপ্রতা কিংবা লীলায়িত শিথিলভঙ্গি বিশেষ ব্যাঞ্জনার সৃষ্টি করে।[১২০]

২.৪.৭.৪ শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০

২০০০ সালের ৩ থেকে ১১ জুন জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তন লবিতে শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে বাংলা ও আরবী ভাষায় মোট ৩৭টি চমৎকার ক্যালিগ্রাফিকর্ম প্রদর্শিত হয়। চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর রঙ ও তুলির চমৎকার কম্পোজিশনে নির্মিত এসব শিল্পকর্মগুলো দর্শকদের হৃদয় ছোঁয়ে যায়। প্রদর্শনীর আহবায়ক ও সদস্য সচিব ছিলেন যথাক্রমে- গিয়াস কামাল চৌধুরী ও মাসুদ মজুমদার। এর অর্থায়নে ছিল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, কালচারাল কোর্স ইউ.কে, যুবক, ইয়ুথ গ্রুপ, চামু ডেন্টাল ক্লিনিক। এ প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে সৈয়দ আলী আহসানের 'হস্তলিখন শিল্প', নাসির মাহমুদের 'আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি' এবং বিদ্যুৎ বিহারীর 'বাংলা বর্ণমালায় ক্যালিগ্রাফি' শীর্ষক লেখা

---

[১২০] আহমেদ আবিদ, 'শিল্পী সাইফুল ইসলামের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী, ইসলামী হরফলিপি যেখানে আপন স্থান করে নিয়েছে শাশ্বত শিল্পধারায়, *দৈনিক বাংলার বাণী*, ১৪ অক্টোবর-২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়। এতে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমে করা- উদ্বোধন, সর্বোত্তম, আমানত, অবদান, বিশ্বাস, উত্তম আদর্শ, ক্যালিগ্রাফি, অন্বেষণে, প্রারম্ভিকা, আলিফ-লাম-মীম, আলো, বিসমিল্লাহ, শ্রেষ্ঠত্ব, আহবান, প্রার্থনা-১, প্রার্থনা-২, কলম, বাংলা ভাষা, প্রশ্নবোধক, শুরু, আমার বিশ্বাস, জ্ঞানের জন্য, অনুগ্রহ, প্রথম বাণী, আমার প্রার্থনা, আল্লাহর পথে, ওয়াটার কালারে- রাসূল (সা.) প্রশস্তি-১, ২, ৩, ৪ ও মহত্ত্ব এবং পোস্টার কালারে- ব্যবসা, জীবন বিধান, সংগ্রাম, সম্মান, ঐক্য, পবিত্রতা ইত্যাদি শিরোনামে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মগুলো প্রদর্শিত হয়।[১২১]

২.৪.৭.৫ শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০১

২০০১ সালের ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তনে শিল্পী আরিফুর রহমানের চতুর্থ একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৩ দিন ব্যাপী এ প্রদর্শনীতে মোট ২৮টি চমৎকার ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। ক্যানভাসে পানি রঙ, পোস্টার রঙ, এক্রিলিক, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও মিশ্র মাধ্যমে নির্মিত ক্যালিগ্রাফিকর্ম প্রদর্শিত হয়। দেশের খ্যাতিমান শিল্পবোদ্ধা, গবেষক, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ ও ক্যালিগ্রাফিপ্রেমিক দর্শকগণ উপভোগ করেন এবং মন্তব্য বইয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে খ্যাতিমান কয়েকজনের মন্তব্য এ ক্যাটালগে প্রকাশিত হয়।[১২২]

২.৪.৭.৬ শিল্পী মুর্তজা বশীরের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

আশির দশকের শেষভাগে এসে শিল্পী মুর্তজা বশীর বাংলার স্বাধীন সুলতানদের উপর গবেষণা শুরু করেন ফলে সুলতানী আমলের শিলালিপির তুঘরা লিপি তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তেল রঙে করা ৩৭টি ক্যালিগ্রাফিকর্ম নিয়ে 'কালিমা তাইয়িবা' শিরোনামে পেইন্টিং ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে চমক লাগিয়ে দেন। এতে প্রদর্শিত শিল্পকর্ম রঙ ও হরফের এক আশ্চার্য সম্মিলনে ভাস্বর হয়ে

---

[১২১] *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০০।
[১২২] *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

উঠে। যাতে একক ও যুক্ত আরবী বর্ণমালা প্রাধান্য পায়। পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর শিল্পোত্তীর্ণ এবস্ট্রাকশনে তিনি যে শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা সত্যিই বর্ণনাতীত।[১২৩]

২.৪.৭.৭ শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২

২০০২ সালের ৪ থেকে ১৫ মে জাতীয় জাদুঘরের মিলনায়তন লবিতে ১২ দিন ব্যাপী শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে তেল রঙ, পানি রঙ, কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও মিশ্র মাধ্যমে মোট ৩২টি চমৎকার ক্যালিগ্রাফিকর্ম প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর অর্থায়ন করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জেক্স প্রিন্ট শাড়ি, যুবক হাউজিং, যমুনা পাবলিশার্স, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, চৌকস প্রিন্টার্স, ভার্জিন কালারস ও খোশরোজ কিতাব মহল। এ প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। এতে বাণী দেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। প্রবন্ধ লিখেন শিল্পী সবিহ্-উল আলম ও অধ্যাপক আবু জাফর। তাছাড়া শিল্পী আরিফুর রহমানের শিল্পকর্ম নিয়ে সুধীজনের মন্তব্য প্রকাশিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. আব্দুল মুঈন খান, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শাহ মুহাম্মদ আবুল হোসাইন, শিল্পী মোস্তফা জামান আব্বাসী, ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী সবিহ্-উল আলম, ইউএবি রাজিয়া আক্তার বানু। সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহবায়ক আখতার-উল আলম এবং সদস্য সচিব ছিলেন ড. আব্দুল ওয়াহিদ। রঙ ও তুলির চমৎকার কম্পোজিশনে নির্মিত এসব শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে আগত দর্শকদের হৃদয়ে নাড়া দেয়।[১২৪]

---

[১২৩] *Catalogue: The Kalima Tayeba, Recent Paintings by Murtaja Baseer*, (Dhaka: Bangladesh Shilpakala Academy, 2002), p.5.
[১২৪] *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪.৭.৮ শিল্পী বশির মেসবাহ'র দ্বিতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬

২০০৬ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ৩১ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত দশদিন ব্যাপী মরহুম কাজী নোমান আহমদ স্মরণে শিল্পী বশির মেসবাহ-এর 'দ্বিতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। যাতে বাংলা ভাষায় অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য সম্পন্ন ২৮টি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে ছিল, গোয়াস মাধ্যমে- স্মরণ, উৎকৃষ্ট পথ, আশা, বড়ত্ব, জানা, সুদ, প্রশংসা, মিশ্র মাধ্যমে- মুক্তিদাতা, সুদ, সূরা ইখলাস ও অনুগ্রহ, তেল রঙে- বড়ত্ব ও আল্লাহ, এক্রিলিক মাধ্যমে- বাসমালাহ, জ্ঞান, কালিমা, কালির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব, সূরা ফাতিহা ও সূরা আর-রহমান, ডিজিটাল প্রিন্টে- বড়ত্ব, সঙ্গ ও বিসমিল্লাহ এবং ফ্লাশ-ব্যাকে- আল্লাহ ইত্যাদি শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি। প্রদর্শনীটির অর্থায়ন করেছে- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল দৈনিক আমার দেশ। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রদর্শিত ক্যাটালগে তৎকালীন আমার দেশ সম্পাদক আমানুল্লাহ কবির শুভেচ্ছা বাণী দেন এবং বশির মেসবাহ'র ক্যালিগ্রাফির উপর 'শিল্প ও বিশ্বাস' শিরোনামে সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখেন- শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ।[১২৫]

২.৪.৭.৯ শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের তৃতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮

শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের তৃতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২ থেকে ৮ আগস্ট-২০০৮ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন-এর অর্থায়নে ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সহযোগিতায় আয়োজিত উক্ত প্রদর্শনীতে শিল্পী আমিনের অর্ধশতাধিক শিল্পকর্ম স্থান পায়। তিনি সুরভিত ক্যানভাসে বহুমাত্রিকতায় তেলরঙ, পানিরঙ, মেটাল, পাথর, গ্লাস, গ্রাফিক ও মিশ্র মাধ্যমে মানব দেহের গঠন, বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন পদ্ধতিসহ বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ও বাংলা ভাষায় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ধাতব পদার্থ যথা- পাথর ও গ্লাসের সাহায্যে আকর্ষণীয় বিভিন্ন শিল্প নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি Proposed Islamic Art Museum Layout-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে

---

[১২৫] *ক্যাটালগ: বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬।*

Dhaka University Institutional Repository

একটি ইসলামী আর্ট মিউজিয়ামের স্বপ্ন উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত ‘আলিফ-লাম-মীম’ ও ‘ইকরা বিসমি’ দ্বারা ভাস্কর্য ক্যালিগ্রাফি দর্শক মহলে রীতিমত সাঁড়া পড়ে।

এ প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে মোহাম্মদ আবদুর রহীম কর্তৃক লিখিত ‘শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের ক্যালিগ্রাফি’ এবং মাসুম বিল্লাহর ‘ক্যালিগ্রাফি ভাস্কর্য ও সুধীজনের মন্তব্য’ স্থান পায়।[১২৬] আয়োজনটি ছিল শিল্পী আমিনুল ইসলামের সংবর্ধনা ও তাঁর শিল্পকলা প্রদর্শনী। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব আ. ক. ম জাকারিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, বিশেষ অতিথি ছিলিন শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন আর্কেওলজি বিভাগের সাবেক পরিচালক ড. নাজিম উদ্দিন আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামিক আর্টস অর্গনাইজেশনের সভাপতি ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ ইসমত আরা বেগম ও অধ্যাপক মাহফুজা খানম। অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি শিল্পী আমিনুল ইসলামকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন।

২.৪.৭.১০ শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদের দ্বিতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৯

শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদের দ্বিতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৯ সালের ২ থেকে ৭ এপ্রিল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় অনুষ্ঠিত হয়। ‘সুন্দরতম নামঃ মেহেদী পাতার রঙে’ শিরোনামে প্রদর্শনীতে তিনি হ্যান্ডমেড পেপারে দেশজ বর্ণ ও অঙ্কনরীতি অনুসরণ করে নিজস্ব ধারায় বিভিন্ন ফুলের প্রতিকৃতির উপর মেহেদী পাতার রসে মহান আল্লাহর ৯৯টি নামের অপূর্ব উপস্থাপনা বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চায় আরেক নতুন মাত্রা যোগ করে। এতে তিনি আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতির দিকে ধাবিত হয়েছেন এবং দেশজ ফুলের নক্শার অভ্যন্তরে আল্লাহর গুণবাচক ক্যালিগ্রাফি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছেন। এজন্য তিনি চয়ন করেছেন- নক্শা,

---

[১২৬] *Calligraphy of Aminul Islam Amin*, 3rd Solo Calligraphy Exhibition, Dhaka-2008.

Dhaka University Institutional Repository

টেক্সচার, থানকুনি পাতা, বাঁশ, জবা, কেয়া, বকুল, শিমুল, পদ্ম, জারুল, কদম, অপরাজিতা, কাঞ্চন, গোলাপ, হিমচাঁপা, পরশ পিপুল, কলাবতী, নীল বনলতা, গ্লাডিওলাস, লিলি, সূর্যমুখী, বকফুল, নাগলিঙ্গম, গুলনার্গিস, স্থলপদ্ম, গোস্তাভিয়া, মাকড়ী শাল, রুদ্র পলাশ, ধুতরা, নলরাস্না, কনকচাঁপা, রজনীগন্ধা, দুপুরমণি, বনচালতা, ঢোল কলসী, বেল, চালতা, হরগোজা, ওলটচন্ডাল, পটপটি, দাঁতরাঙা, তিল, বাতাবী লেবু, মহামরীবচ, বনকলা, শঠি, কলাবতী, তেলকুচি, নীলমণিলতা, শিয়ালকাঁটা, নয়নতারা, কচুরীপানা, গোলাপজাম, আকন্দ, কৃষ্ণচূঁড়া ও গন্ধরাজ ইত্যাদি দেশজ ফুলের মোটিফ।

আরবী লিপির পাশাপাশি তিনি বাংলা অক্ষর বিন্যাস করে আল্লাহর নামসমূহের বাংলা অর্থসহ ক্যালিগ্রাফি করেছেন। যা দর্শকদের এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান প্রদানে সাহায্য করে। তাঁর চিত্রে শুধু একটি লালচে ব্রাউন বর্ণ ব্যবহার করেছেন। দক্ষতার সাথে এই সীমিত বর্ণ ব্যবহারের ফলে যে হাফটোন ও পানিরঙের আবহ সৃষ্টি করেছে, তাতে তাঁর একক বর্ণলেপনের একঘোয়েমিতা প্রশমিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে- সুরা ফাতিহা, কালিমা ও সালাম ইত্যাদি। তিনি এসবকে দেশজ ঐতিহ্য ও পরম্পরার সাথে সম্পৃক্ত করে বিন্যাস করেছেন। তাঁর দক্ষ হাতের অনিন্দ্য সুন্দর ক্যালিগ্রাফিকে বিন্যাস করেছেন নকশী কাঁথা, শীতল পাটি, জামদানী শাড়ি ও দেশজ ফুলের ও লতা-পাতার নক্‌শার অভ্যন্তরে।[১২৭]

২.৪.৭.১১ শিল্পী সাইয়েদ জুলফিকার জহুরের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৯

২০০৯ সালের ২০ থেকে ২৬ আগস্ট ঢাকার ধানমন্ডিস্থ দৃক গ্যালারিতে 'ক্যালিগ্রাফি অন কুরআনিক কসমোলজি' শীর্ষক সপ্তাহ ব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ১৯৬৮ সালের ৭ অক্টোবর যশোর শহরে জন্মগ্রহণকারী জুলফিকার জহুর দারুল উলুম দেওবন্দ হতে দাওরাহ এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতে থিওলজিতে মাস্টার্স পাশ করেন। তিনি একাধারে

---

[১২৭] *ক্যাটালগ: শিল্পী ফেরদৌস আরা আহমেদের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৯, পৃ.৭-৮।*

Dhaka University Institutional Repository

একজন আর্কিটেক্ট, গবেষক, জ্যোতির্বিদ, মসজিদের খতিব ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি একজন ব্যতিক্রম ধারার ক্যালিগ্রাফার। তিনি তাঁর প্রদর্শনীতে পবিত্র কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি সংযোজন করে গ্রাফিক্সের মাধ্যমে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। আয়াত ও ছবির অপূর্ব কম্বিনেশনে প্রত্যেকটি অনন্য শিল্প হিসেবে ফুটে উঠেছে। যা দর্শকদেরকে যেমন কুরআনের আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তেমনি তাদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। প্রায় দেড় সহস্রাধিক বছর পূর্বে আল-কুরআনে বর্ণিত মহাজগত সম্পর্কে অনেক নির্ভুল তথ্য দিয়েছে। আর অতি সম্প্রতি নাসার হাবল টেলিস্কোপ মহাকাশে করেছে কাব্যিক দৃষ্টিপাত। এ দু'টির সমন্বয়েই মূলত তাঁর ক্যালিগ্রাফির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যা বিজ্ঞানমনস্কদের জন্য উম্মোচন করে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার।[১২৮]

২.৪.৮ অন্যান্য প্রদর্শনী

২.৪.৮.১ HSBC আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০১০

২০১০ সালের ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত গুলশানের 'কায়া' গ্যালারিতে HSBC তার ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস 'HSBC-আমানাহ'-এর পরিচিতি উপলক্ষে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বাংলাদেশের বর্ষীয়ান শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফার মুর্তজা বশীরের তৈলরঙে নির্মিত ১২টি অনন্য শিল্পকর্ম এ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। পবিত্র আল-কুরআনের শুরুতে মুকাত্তা'আত আয়াত ও প্রতিকৃতিসমূহকে ক্যানভাসের উপরে অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো- The Muqatta'at-2 শিরোনামে নীল, সাদা ও গাঢ় লাল, সাদা, নীল ও উজ্জ্বল সবুজ রঙে 'ত্বাহা' অঙ্কন করেন। The Muqatta'at-4 শিরোনামে নীল, সাদা ও লাল রং ব্যবহার করে 'ইয়া-সিন' অঙ্কন করেন। The Muqatta'at-6 শিরোনামে ক্যানভাসের উপর লাল, নীল, সবুজ ও সাদা রঙে আরবী হরফ 'ত্বা-সীন-মীম' অঙ্কন করেন। যার মাঝে সুদৃশ্য সাদা রঙের সংমিশ্রণ ঘটান। The Muqatta'at-10 শিরোনামে লাল ও হাল্কা সবুজ রঙের সংমিশ্রণে 'আলিফ-

[১২৮] *Catalogue: Calligraphy on Quranic cosmology by sayed Zulfiquar Zahur,* Dhaka-2009.

Dhaka University Institutional Repository

লাম-মীম’, ‘আলিফ-লাম-রা’ অঙ্কন করেন। যা দর্শকদের নয়ন জুড়িয়ে দেয়। ক্যালিগ্রাফি কর্মগুলো HSBC ব্যাংকের গ্রাহকরা ক্রয় করেন আর এ অর্থ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল তহবিলে জমা দেন।[১২৯]

২.৪.৮.২ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ওআইসি আয়োজিত আর্ট ও ফটো প্রদর্শনী-২০০৮

২০০৮ সালের ১৬-১৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চারুকলা অনুষদের জয়নুল গ্যালারিতে তিন দিনব্যাপী আর্ট ও ফটো প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীটি যৌথভাবে আয়োজন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ওআইসির Research Centre for Islamic History Art and Culture (IRCICA)। ‘ইসলামিক সিভিলাইজেশন ইন সাউথ এশিয়া’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম উপলক্ষে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে ইসলামী ঐতিহ্য বহনকারী বিভিন্ন ছবি ও শিল্পকর্মের মধ্যে বাংলাদেশের শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীমসহ খ্যাতিমান শিল্পীদের বিভিন্ন শৈলীতে ও মাধ্যমে নির্মিত বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফি স্থান পায়।

প্রদর্শনীতে শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তারের ‘আল্লাহু আকবার’, শিল্পী আরিফুর রহমানের ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ ও ‘তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ’ ও বিভিন্ন শিল্পীদের ‘আল্লাহ’, ‘মুহাম্মদ’, ও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ইত্যাদি ক্যালিগ্রাফিকর্ম দর্শকদের হৃদয় কাড়তে সক্ষম হয়। প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়। প্রদর্শনীটির অর্থায়ন করে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।[১৩০]

২.৪.৮.৩ জালালাবাদ কলেজে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০১৩

---

[১২৯] Star Art & Entertainment, The Splendour of Islamic calligraphy, *The Daily Star*, 27 December-2010.
[১৩০] *ক্যাটালগ: আর্ট ও ফটো প্রদর্শনী-২০০৮*, ঢাকা, পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

২০১৩ সালের ২০ ও ২১ জুলাই সিলেট নগরীর সোবহানীঘাট এলাকার জালালাবাদ কলেজ ক্যাম্পাসে দু'দিনব্যাপী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ের ৭ শিল্পীর অংশগ্রহণে প্রায় অর্ধশত দৃষ্টিনন্দন ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম নিয়ে আয়োজিত এ প্রদর্শনী সিলেট শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে ছিল একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অংশগ্রহণকারীগণ হলেন- শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী ফরেজ আলী, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ ও শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ। কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ ফরিদ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও কো-অর্ডিনেটর আব্দুস শাকুরের পরিচালনায় উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী হামিদুল ইসলাম ও কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক বাকী চৌধুরী প্রমুখ।[১৩১]

২.৪.৮.৪ প্রথম আল-কুরআন প্রদর্শনী-২০০১

২০০১ সালের ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় জাদুঘরে আল-কুরআন রিসার্চ একাডেমি আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী আল-কুরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন শরীফের ত্রিশ পারার সম্পূর্ণ আরবী হরফের বৈচিত্রপূর্ণ সংস্করণের এক ব্যতিক্রমধর্মী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন- সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। পবিত্র কুরআন শরীফের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় এর তরজমা, তাফসীর এবং এ সংক্রান্ত প্রায় চারশত গ্রন্থ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এ ছাড়া রাসূল (সা.) এর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আরবী হস্তাক্ষর ও এর বিবর্তনের একশত চৌদ্দটি ক্যালিগ্রাফিও এতে প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে রাজশাহীর হামিদুজ্জামান কর্তৃক লিখিত বৃহদাকার একটি কুরআনের ক্যালিগ্রাফি সবার নজর কাড়ে। যা তিনি

[১৩১] *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ২০ জুলাই ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ আট বছর ধরে কঠোর সাধনা করে সম্পন্ন করেন। প্রদর্শনীর তিন দিনই জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারিটি সকল বয়সের নারী-পুরুষ দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল।[১৩২]

২.৪.৮.৫ দ্বিতীয় কুরআন প্রদর্শনী-২০০৫

আল-কুরআন রিসার্চ একাডেমির উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২৩ থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী দ্বিতীয় আল-কুরআন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পবিত্র কুরআনের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। এতে দর্শকগণ আরবী, বাংলা ও ইংরেজিসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন আকৃতির বৈচিত্রপূর্ণ অজস্র কুরআন শরীফের একত্র সমাবেশের পাশাপাশি শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন এবং কয়েকজন বিদেশী শিল্পীর নির্মিত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ক্যালিগ্রাফিকর্ম স্থান পায়। প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ ছিল- রাজশাহী জেলার জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশের কৃতিশিল্পী মোঃ হামিদুজ্জামানের স্বহস্তে লিখিত পৃথিবীর কুরআন শরীফের বৃহত্তম কপিসমূহের মধ্যে অন্যতম কুরআন শরীফটি প্রদর্শিত হয়। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছরের কঠোর সাধনার ফসল এ কুরআন শরীফটি। আর্ট পেপারের উপরে কালো লেখা কুরআন শরীফটির ওজন ৬০ কেজি। মোট ১১০০ পৃষ্ঠার এ কুরআন শরীফটি লিখতে সর্বমোট ৩৫০ দোয়াত কালি ব্যয় হয়েছে।[১৩৩] ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে এ প্রদর্শনীটি আয়োজন করা হয়। এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে দর্শকদের মাঝে কুরআনের প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং ক্যালিগ্রাফির প্রতি তাদের তীব্র আকর্ষণ সহজেই অনুমেয় হয়।

---

[১৩২] 'পবিত্র কুরআন ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী', *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৮ সেপ্টেম্বর-২০০১।

[১৩৩] *প্রচারপত্র: মহিমান্বিত কুরআন প্রদর্শনী*, ঢাকা, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪.৮.৬ পঞ্চদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী-২০০২

২৬ ডিসেম্বর ২০০২ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত মাসব্যাপী বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চদশ জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী। এতে প্রায় ৬০০ শিল্পীর দেড় হাজার শিল্পকর্ম জমা পড়লেও এর মধ্যে ২৩৮ জন শিল্পীর ২৮৬ ও আমন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পীদের ১৫টিসহ মোট ৩০১টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। এর মধ্যে প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন ও রফিকুল্লাহ গাজালীর অসাধারণ ২ টি ক্যালিগ্রাফি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। শিল্পী আমিনের 'জিকির' শিরোনামে লেখানির্মিত ক্যালিগ্রাফিকর্ম 'আল্লাহ' এবং রফিকুল্লাহ গাজালীর 'শ্রেষ্ঠত্ব' শিরোনামে নির্মিত ক্যালিগ্রাফি দু'টি দর্শক মহলে বেশ সাড়া জাগায়। এতে শিল্পীরা তেলরঙ, এক্রিলিক, ছাপচিত্র, টেম্পরা, মিশ্র মাধ্যম, গ্রাফিক্স ও ভাস্কর্যসহ নানাবিধ শিল্পকর্মের মাধ্যমে দেশীয় ও স্বকীয় সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৩৪]

২.৪.৮.৭ দ্বাদশ এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী-২০০০

এশিয়া মহাদেশভুক্ত দেশগুলোর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ আয়োজন দ্বি-বার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী। এর দ্বাদশ প্রদর্শনীটি বাংলাদেশের ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ৩৩টি দেশের মোট সাড়ে তিনশত শিল্পকর্ম স্থান পায়। যার মধ্যে শুধু বাংলাদেশী শিল্পীদের শিল্পকর্মের সংখ্যা প্রায় দুইশত। প্রদর্শনীতে ইরান ও তুরস্কের প্রায় ত্রিশটি ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম স্থান পায়। গ্রান্ড প্রাইজ প্রাপ্ত তিন শিল্পীর একজন ছিলেন ইরানের ক্যালিগ্রাফার সিদাঘাত জাব্বারী। তিনি 'পবিত্র নামসমূহ' শিরোনামে ক্যালিগ্রাফি করেন। তাঁর তিন ভাগে বিভক্ত সোনালি ক্যানভাসে রয়েছে হরফের অস্পষ্ট কম্পোজিশন ও বর্ণগভীরতা।[১৩৫]

---

[১৩৪] আশীষ উর রহমান, প্রতিবেদন: 'নগরজুড়ে চারুকলার প্রদর্শনী, শিল্পীদের রং-তুলিতে উদ্ভাসিত হয়েছে স্বদেশ স্বকালের স্বরূপ', *দৈনিক জনকণ্ঠ*।

[১৩৫] মানাম মায়মুন, '১২তম দ্বি-বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী ক্যালিগ্রাফি প্রসঙ্গে', *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*, জুন-২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনীতে যে সকল ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। তাঁর প্রত্যেকটি চিত্রই দর্শকমন্ডলীর হৃদয় কাড়তে সক্ষম হয়। এতে ক্যালিগ্রাফি চিত্রের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের সাদেকাইন, ইন্দোনেশিয়ার আব্দুল জলিল পাইরোস, আলী আল-মাহমিদ, ইরানের আর. মাফি, বি. জাভিদ, এম. এহসাঈ, জর্ডানের রফিক লোহান ও কুয়েতের জাবের আহমাদসহ বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল- শিল্পীদের স্বকীয়তা ও বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনায় দৃষ্টিনন্দিত শিল্পসমূহ। যাতে শিল্পের বিন্যাস কিংবা কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অনেক শিল্পে কাব্যিক রূপ আরোপেরও প্রচেষ্টা বিদ্যমান ছিল। ফলে তাদের শিল্পগুলো কোমলতায় ও নান্দনিক রসে ছিল সমৃদ্ধ।

২.৪.৮.৮ ইসলামী শিল্পকলার বিশেষ প্রদর্শনী-১৯৭৮

১৯৭৮ সালে ৩ থেকে ২৮ এপ্রিল ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে ইসলামী শিল্পকলার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সরকারী উদ্যোগে ২৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনীতে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য ফুটে উঠে। এ প্রদর্শনীতে ১২টি বিষয়ের মোট ৩৪১টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। যার মধ্যে রয়েছে কুরআনের পাণ্ডুলিপি, অন্যান্য পাণ্ডুলিপি, মুঘল মিনিয়েচার, ক্যালিগ্রাফি, পানিরঙের পেইন্টিং, ডকুমেন্ট, উৎকীর্ণ লিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য, পোশাক-পরিচ্ছেদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও ডেকোরেটিভ আর্ট ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ মোট ১২টি বিষয়ের প্রায় ৩৪১টি শিল্পকর্ম। এতে ৫টি ক্যালিগ্রাফিকর্ম প্রদর্শিত হয়। খাজা শামসুদ্দিন মাহমুদ গুলজার ও নাসতা'লিক এবং মুহাম্মদ ইউসুফ নাসতা'লিক ও গুলজার লিপিতে কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি কর্ম প্রদর্শন করেন। যা ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রতি ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। এ উপলক্ষে 'বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা' নামে একটি ক্যাটালগ প্রকাশিত হয় যা সংকলন করেন জাতীয় জাদুঘরের তৎকালীন পরিচালক এনামুল হক।[১৩৬]

---

[১৩৬] *Catalogue of the special exhibition of Islamic Art in Bangladesh*, Dacca Museum, 3-28 April-1978.

Dhaka University Institutional Repository

২.৪.৮.৯ ভারতীয় ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনী-১৯৯৪

ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে মাসব্যাপী ভারতীয় ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবেশী দু'বন্ধু রাষ্ট্রের মাঝে শিল্প ও সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশে আয়োজিত ইসলামী শিল্পকলার এ প্রদর্শনীতে ক্যালিগ্রাফি, পাণ্ডুলিপি, চিত্রাঙ্কন ও রাষ্ট্রীয় ফরমান ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। ভারতীয়, ইরানী, মধ্য এশিয় ও আরব দেশীয় পণ্ডিতদের লিখিত ও অঙ্কিত ১৫১টি শিল্পকর্ম এ প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এর মধ্যে অধিকাংশই ফেরদৌসি, সাদী, খৈয়াম, হাফিজ, মীর আলীর মত লব্ধ প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত, কবি ও লিপিকুশলীদের কৃতি বিদ্যমান। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিল্পকর্মগুলো মূলত নিম্নে বর্ণিত তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল:

১. ভারতের বাইরে লিখিত, চিত্রিত ও মীনা (Illumination) করা পাণ্ডুলিপি

২. অভারতীয় পণ্ডিত ও কলা-কুশলীদের দ্বারা ভারতেই লিখিত, চিত্রিত ও মীনা করা পাণ্ডুলিপি

৩. ভারতীয় পণ্ডিত ও কলা-কুশলীদের দ্বারা ভারতেই লিখিত, চিত্রিত ও মীনা করা পাণ্ডুলিপি

প্রদর্শনীতে 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' ও 'দিওয়ান-ই-জাফর' স্থান পায়। তাছাড়া এতে বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফি ও ফরমানের কয়েকটি মনোমুগ্ধকর কপির নমূনাও দেখা যায়। নয়াদিল্লির রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালার সংগ্রহ থেকে আয়োজিত এ প্রদর্শনী মুঘলদের শিল্প সম্বন্ধীয় গৌরব ও ঐতিহ্যের আলেখ্য বহন করে।[১৩৭]

২.৪.৮.১০ আমেরিকান সেন্টারে আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০১৪

রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডিস্থ মাইডাস সেন্টারের ১০ম তলায় আমেরিকার এডওয়ার্ড এম. কেনেডি (ইএমকে) সেন্টারে ২০১৪ সালের ১ থেকে ৫ নভেম্বর পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় তরুণ ও নবীন শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। প্রতিদিন সকাল ৯টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত এ প্রদর্শনী দর্শকদের

---

[১৩৭] *ক্যাটালগ: ভারতীয় ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনী*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (ঢাকা: ১৯৯৪), পৃ.৭-৮ ও ২০।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য উন্মুক্ত থাকে। এতে মোট ৬ জন নবীন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শনীতে পঙ্কুশ কুমার এর ৩টি, সুসান রহমতুল্লাহ'র ৭টি, ওসামা বিন নূরের ৩টি, শিল্পী মাহফুজা সুলতানা উম্মেহানীর ৩টি, শিল্পী সুমাইয়া সুলতানা সালওয়ার ২ টি ও শিল্পী খলিলুল্লাহ মুহাম্মাদ বায়জীদের ৫টিসহ মোট ২৩ শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীটি উপস্থিত দর্শকদেরকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রতি সম্মোহিত করে।[১৩৮]

২.৪.৮.১১ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্রের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৭

২০০৭ সালের ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারিতে ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে দশদিন ব্যাপী এক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। আল-কুরআনের আলোকে ক্যালিগ্রাফি ও পেইন্টিং শীর্ষক এ প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এ. বি. এম আব্দুল হক চৌধুরী। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক শিল্পী মাহমুদুল হক এবং ইরানী দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর ড. এম আর হাশেমী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক কামরুল হাসান।

প্রদর্শনীতে ৭ জন ইরানী শিল্পীর ৫২টি শিল্পকর্ম স্থান পায়। তারা হলেন- শিল্পী আসাদুল্লাহ কিয়ানী, শিল্পী সিয়াভাস লাতিফী, শিল্পী হামিদ নিরুমান্দ, শিল্পী মুহাম্মদ আলী ফারাসাতী, শিল্পী খোরাসানী, শিল্পী সিদাঘাত জাব্বারী ও শিল্পী নুবিজাদেহ প্রমুখ। তাঁরা ক্যানভাসে পানি রঙ ও তেলরঙের মাধ্যমে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, কালিমা, দরুদ ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর

---

[১৩৮] প্রদর্শনীটিতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সাথে সাক্ষাতে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চমৎকার ক্যালিগ্রাফি করেছেন। এছাড়া কাঠ ও টাইলসের উপরও নান্দনিক ক্যালিগ্রাফি করেছেন। আল-কুরআনের আয়াতকে তারা দৃষ্টিনন্দনরূপে ভাস্কর্যেও উপস্থাপন করেছেন। এসব শিল্পকর্মের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সূরা হামদ, আল্লাহু আকবার, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, কালিমা, সূরা বাকারা, ইয়া আবা আবদিল্লাহ, আসমাউল হুসনা, আয়াতুল কুরসি, ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা, হুয়াস সামি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি।[১৩৯]

২.৪.৮.১২ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও ISESCO আয়োজিত ক্যালিগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী-২০১২

চিত্র-৯৬: সংস্থাটির মনোগ্রাম

ঢাকা: এশিয়া অঞ্চলের ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী-২০১২ উদযাপন উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও Islamic Educational Scientific and Cultural Orgnization (ISESCO)-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গ্যালারিতে ক্যালিগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন ৩২ জন শিল্পীর শতাধিক ক্যালিগ্রাফি এতে স্থান পায়। এসব শিল্পকর্ম ছিল রঙ-রেখা ও শিল্পনৈপুণ্যে অসাধারণ। যাতে ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন শৈলী যেমন- সুলুস, কুফি, দিওয়ানী, মুয়াল্লা, নাসতা'লিক ইত্যাদি লিপির সফল প্রয়োগ দেখা যায়। ৪০০ বছর আগে ঢাকা রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রাচীন এ শহরে অসংখ্য মনোহর কারুকার্য খচিত ইমারত, মসজিদ, মাজার প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। প্রদর্শনীতে ইসলামী সংস্কৃতির পরিচায়ক এসব স্থাপত্যের ফটোগ্রাফিও প্রদর্শিত হয়। ঢাকার প্রাচীন মুসলিম স্থাপত্যিক নিদর্শনসমূহের উপস্থাপিত আলোকচিত্র ফুটিয়ে তুলেছে কালের পরিক্রমায় টিকে

---

[১৩৯] *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১২ জানুয়ারি-২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

থাকা ঢাকার অতীত ইতিহাসকে। যার মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম খুঁজে পায় ইতিহাসের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

প্রদর্শনীতে শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী মনিরুজ্জামান, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ, শিল্পী আবুদ্ দারদা নূরুল্লাহ, শিল্পী নিসার জামিল, শিল্পী হাসান মোরশেদ, শিল্পী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, শিল্পী ফজলে বারী মামুন, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী সাইফুল্লাহ সাফা, শিল্পী ওসমান হায়াত, শিল্পী মঞ্জুরুল ইসলাম, শিল্পী লামিয়া, শিল্পী সুমাইয়া সুলতানা সালওয়া, শিল্পী ইমরান, শিল্পী মহিব্বুল্লাহ গালিব, শিল্পী হাসান, শিল্পী সাকিব, শিল্পী আলী, শিল্পী রায়হান সানি ও শিল্পী রুকাইয়া রিমি প্রমুখ।

প্রদর্শনীতে শিল্পী মুর্তজা বশীরের- কালিমা তাইয়িবা-১৩ ও কালিমা তাইয়িবা-৩৯, শিল্পী সাইফুল ইসলামের- আল্লাহু আকবার, আল্লাহ- যিনি হৃদয়ের প্রশান্তি, শ্রমের ফল তৃপ্তিময় ও সৃষ্টি রহস্য, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের- কালিমা তাইয়িবা, রহমাতুল্লিল 'আলামিন, আল্লাহ মহান ও বিসমিল্লাহ, শিল্পী আরিফুর রহমানের- মুহাম্মদ (সা.), তিনিই দয়ালু তিনিই দাতা, হরফে মুকাত্তায়াত-১ ও হরফে মুকাত্তায়াত-২, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের- আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, মহামহিম তিনি, শেফা ও ইনফিনিটি, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদের- সুবহানাল্লাহ, সর্বজ্ঞ, আল্লাহ ও সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীমের- পবিত্র নাম-১, অসীমের গান-১, অসীমের গান-২ ও ক্ষমতা রহস্য এবং শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদের- সূরা ফাতিহা, তিনি সর্বজ্ঞ, প্রস্ফুটিত ও নক্ষত্র ইত্যাদিসহ শতাধিক ক্যালিগ্রাফিকর্ম দর্শকদের হৃদয় কাড়তে সক্ষম হয়। প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়। এর সম্পাদনা করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। ক্যালিগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীটি দর্শক মনে অন্যরকম আনন্দানুভূতি বয়ে আনে।

Dhaka University Institutional Repository

উদযাপন উপলক্ষে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৪ জুলাই ২০১২ রোজ শনিবার সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ISESCO-এর ডিরেক্টর জেনারেল ড. আব্দুল আজিজ উসমান আত্ তাওয়ারজি ও শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ প্রমুখ।[১৪০]

ইসলামিক কালচারাল হেরিটেজ অব ঢাকা উপলক্ষে চিত্রকর্ম প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ রোজ রবিবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারিতে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিজয়ীগণ, অংশগ্রহণকারী শিল্পী ও দর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

২.৪.৮.১৩ কাতিব-ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের ক্যালিগ্রাফি চর্চা

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে যে সকল কাতিব পবিত্র কুরআন শরীফ নকল করতে শুরু করেন তাদের হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত চমৎকার। তখন যে কাতিবের হাতের লেখা যত সুন্দর ছিল তাকে তত বড় শিল্পীর মর্যাদা দেওয়া হত। একারণেই হাতের লেখা সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন করার জন্য কাতিবরা কঠোর সাধনা করেছেন। কাতিব হিসেবে যারা শৈলীনির্ভর কাজে নিজেদের প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন এ রকম দু'জন খ্যাতিমান কাতিব হচ্ছেন- মাওলানা গরিবুল্লাহ মাসরুর ইসলামাবাদী ও মাওলানা সিরাজুল হক ইসলামাবাদী। মাওলানা গরিবুল্লাহ মাসরুর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ২৫ খানা বইয়ের লেখক ও অনুবাদক। তিনি কিতাবাতে বিশেষ দক্ষতা

---

[১৪০] *ক্যাটালগ: ঢাকা- এশিয়া অঞ্চলের ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী*-২০১২ *উদযাপন উপলক্ষে ক্যালিগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০১২, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়েছেন, 'নেক তাহরির' নামে তিনি একটি মূল্যবান বই লিখেছেন, যাতে হাতে-কলমে আরবী হরফের কয়েকটি লিপিশৈলী দেখা যায়। এছাড়া ছোট-বড় ১০খানা কুরআনের কপি এদেশীয় নাসখী লিপিতে লিখেছেন। এ কপিগুলো এমদাদিয়া লাইব্রেরি ছাপার ব্যবস্থা করেছে। মাওলানা সিরাজুল হক ইসলামাবাদীও কিতাবাতে সুখ্যাতি পেয়েছেন। তিনি ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদসহ রিয়াদুস সালেহীনের প্রথম খণ্ডের কুরআন ও হাদীসের বাণীকে আরবী নাসখী ও সুলুসের মিশ্রিত রূপে লিখেছেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে- ঢাকা বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের মিহরাবের উপর কালিমা, গম্বুজের ভেতর, বাইরে গেটের উপর আল্লাহু আকবারসহ আরো যেসব ক্যালিগ্রাফি রয়েছে, সেগুলো তিনি ডিজাইন করে দিয়েছিলেন।[১৪১]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

২.৫ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যবহারভিত্তিক অনুশীলন

২.৫.১ লোকজ ক্যালিগ্রাফি

বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় লোকজ ধারার ক্যালিগ্রাফির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এদেশের মানুষের জীবনে আবহমান কাল ধরে চলে আসা লোকজ সংস্কৃতিতে অবচেতন মনে ক্যালিগ্রাফি চর্চার একটি ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। নক্‌শী কাথায়, জায়নামাজে, তালের পাখায় ও বালিশের কভারে ফুল, লতা-

চিত্র-৯৭: মাটির পাতে লোকজ ধারায় অঙ্কিত কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি

১৪১ *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত

পাতা, নানা জীবজন্তুর ছবি, মসজিদের মিনার ও নানান মোটিফ আঁকার পাশাপাশি আল্লাহু, মুহাম্মাদ, মা ইত্যাদি লেখা ও ছন্দোবদ্ধ বাণী লেখার সময় এক ধরনের ক্যালিগ্রাফিক ইমেজের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তালপাতার পাখায় ছিদ্র করে লেখা এবং ধান ও তেতুল বিচি দিয়ে আটার প্রলেপে লেখায়ও চমৎকার লিপিশৈলীর বহু বর্ণিল লোকজ প্রয়োগ। এমনকি ম্যাচের কাঠি ও পাটশোলা দিয়েও এক ধরনের লেখার প্রচেষ্টা দেখা যায়।[১৪২]

লোকজ ক্যালিগ্রাফি হাজার বছরের প্রাচীন একটি ধারা। পুঁথিপত্র, মসজিদের নামফলক, কাষ্ঠখণ্ড ও বাঁশের চাঁচ দিয়ে নির্মিত জিনিসপত্র, ধান ও মাছের আশ দিয়ে বানানো শিল্পকর্ম আমাদের নিকট বেশ পরিচিত। এছাড়া বাস, ট্রাক, রিকশা, অটোরিকশা, টেম্পু, ট্রলার ও জাহাজসহ বিভিন্ন যানবাহনে কমার্শিয়াল পেইন্টারদের উদ্ভাবিত নান্দনিক আঁচড়ে আল্লাহ, মুহাম্মাদ, বিসমিল্লাহ, কালিমা ও বিভিন্ন দু'আর ক্যালিগ্রাফি খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের দেশের পল্লী গ্রামের মেয়েরা সূচিকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ, মুহাম্মদ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইত্যাদি কাপড়ে ফুটিয়ে তুলেন। তাছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- কলমদানি, ব্যাগ, শো-পিস, ফুলদানি, তৈজষপত্র এমনকি জামাকাপড়েও ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[১৪৩] গ্রামীণ মহিলারা পিঠা তৈরির কাজেও ক্যালিগ্রাফির মত বিভিন্ন জ্যামিতিক নক্শা ব্যবহার করে থাকে ।

আরবী ভাষা একটি প্রতিষ্ঠিত ভাষা। ফলে এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব লিপিশিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষার প্রতি ভালবাসাও এর অন্যতম কারণ। জনসাধারণের মধ্যে ক্যালিগ্রাফিক ফর্ম ছাড়াও শুধু দেখতে সুদৃশ্য হাতের লেখাও বিপুল উৎসাহে সমাদৃত হয়ে থাকে। শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার একদিকে বিচিত্র শৈলী অন্যদিকে হরফ, শব্দ ও বাক্যকে ইমেজের কাছে ছেড়ে দিয়ে

---

[১৪২] মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক ভাবনা', *স্মারক- ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি* (২০০২: সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র), পৃ.১২৪-১২৫।

[১৪৩] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

একটি কম্পমানতার জন্ম দেন। যেখানে দৃশ্যমান হয় আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ রূপকের ব্যবহার। অনেকটাই বাংলার প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের মত। ইতোমধ্যেই তিনি শিল্পক্ষেত্রে বাংলালিপিকে নিজস্বধাচে আনতে সক্ষম হয়েছেন। লোকজ ও মাটির গন্ধ মেশানো সিম্বল তাঁর ক্যানভাসে উপস্থিত হয়ে রূপান্তর ও ভিন্ন আঙ্গিক লাভ করে। হাতপাখা, ঘুড়ি, কলস, দোতারা ও পালতোলা নৌকা ইত্যাকার বিষয়াদি নিয়ে বিশদ বর্ণবৈচিত্রে তিনি ক্যানভাস সাজান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকজ প্রাসঙ্গিকতাকে ক্যালিগ্রাফিক প্রতীতিতে বিন্যাস করেন।[১৪৪]

২.৫.২ ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফি

ভাস্কর্যে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার শিল্পাঙ্গনে একটি নব সংযোজন ও নির্মাণকৌশল। শিল্পচর্চার সর্বোচ্চ আসনে আসীন করার এক অনুপম মাইলফলক। রাসূল (সা.) বলেছেন-بعثت لكسر الاصنام অর্থ- আমি মূর্তির বিনাশ সাধনের জন্যই এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন সড়কের মোড়ে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও অফিস আদালতের সামনে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতির নির্মিত ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। যা ইসলামী চেতনার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। অথচ এর বিপরীতে ক্যালিগ্রাফি কেন্দ্রিক ভাস্কর্য নির্মাণ করা সম্ভব। লিপিশৈলীর নান্দনিক প্রয়োগ আর উল্লম্ব-আনুভূমিক স্বভাব এবং বিভিন্ন পরিসরে স্থাপনযোগ্য ত্রি-মাত্রিক পট ও প্রাসঙ্গিকতায় ক্যালিগ্রাফির সৌন্দর্য বর্তমানে বিশ্বশিল্পে সমাদৃত।[১৪৫]

এভাবে সম্প্রতি স্থাপিত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সামনে হাইওয়ের মাঝখানে কুরআনের আয়াত ও তার শীর্ষদেশে মেটাল হরফে লিখিত ‘আল্লাহ’ এর অনবদ্য ভাস্কর্য ক্যালিগ্রাফি শিল্পপ্রেমী দর্শক মহলে রীতিমত অনুভূতির সঞ্চার করেছে। এভাবে ঢাকার কাকরাইল মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে স্থাপিত কালো মার্বেল

[১৪৪] *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত,
[১৪৫] *ক্যাটালগ: আরিফুর রহমানের*

rsity Institutional Repository

পাথরের উপরে মেটালিক হরফে লিখিত ক্যালিগ্রাফি 'আল্লাহু' ও 'মুহাম্মদ' এর নান্দনিক ভাস্কর্যটি বেশ পবিত্রতার পরশ বুলিয়েছে। তেজগাঁওস্থ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত মৃণাল হকের 'রত্নদ্বীপ' ভাস্কর্যে 'আল্লাহ', 'মুহাম্মাদ' লেখাটি দর্শকদের হৃদয়ে ইতিবাচক অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। এভাবে শিল্পাঙ্গনের সামগ্রিক আবহে ভাস্কর্যে ক্যালিগ্রাফির দরজা ক্রমেই উন্মুক্ত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল- ইকরা, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্ল-াহ, শিল্পী আরিফুর রহমান- আল্লাহ, মুহাম্মদ, আলিফ-লাম-মীম ও আলিফ বিন্যাস এবং শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন- ইকরা, আলিফ-লাম-মীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি ভাস্কর্যের রূপকল্প নির্মাণ করেছেন। নির্মাণকৌশলের দিক থেকে এসব চিত্রকল্প শিল্পবৃত্তে অনন্য মহত্ত্বের উন্মোচন।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের কুয়েত, সৌদি আরব, দুবাই ও ইরানে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ভাস্কর্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশেও যদি সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সামনে, জনবহুল রাস্তার মোড়ে, সংসদ ভবন চত্বরে, বঙ্গভবন মোড়ে, বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গনে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন পার্কের সামনে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করতে ক্যালিগ্রাফি ভাস্কর্য নির্মাণে এগিয়ে আসা যায় তাহলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশের প্রতিফলন ঘটবে। নান্দনিকতা, সৃজনশীলতা, সাধনা ও শিল্প সুষমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

২.৫.৩ ইসলামী শিলালিপি

বাংলার ভূখণ্ডে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চায় শিলালিপির উন্মেষ একটি বৈচিত্রময় সংস্কৃতি বিকাশের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। মুসলমানদের আগমনের পর এ অঞ্চলে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রচার, প্রসার ও বিকাশ ঘটতে থাকে। এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হলে মুসলমানগণ কর্তৃক স্থাপত্য কার্যক্রম শুরু হয় এবং তারা বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা, প্রাসাদ ও দূর্গ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এ সকল স্থাপত্যে বা ইমারতগাত্রে কোন না ভাবে শিলালিপির ব্যবহার হয়। যাতে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন শৈলী তথা- সুলুস, নাসখী, মুহাক্কাক, রায়হানী, তাওকী', রুক'আহ, তুঘরা, বিহারী ও ইজাযাহ ইত্যাদির প্রয়োগ দেখা যায়।

সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর শাসনামলে সর্বপ্রথম বাংলায় গৌড় থেকে বিশ মাইল দক্ষিণের সুলতান গঞ্জে তথা বর্তমান বাংলাদেশে প্রাপ্ত একটি সেতুর শিলালিপির সন্ধান মেলে। যা ছিল তাওকী' লিপিশৈলীতে সম্পন্নকৃত। সুলতান বাহাদুর শাহের শাসনামলেও গৌড় থেকে দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের ওয়াজির-বিলডাঙ্গা গ্রামে আবিষ্কৃত টাকশালের (১৩২২ খ্রি.) শিলালিপির সন্ধান পাওয়া যায়। যার প্রতিটি হরফের শেষপ্রান্ত পরের হরফের সাথে জোড়া লেগে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন শিকলের রূপধারণ করে। যা 'মুসালসাল' নামে পরিচিত। সুলতান সিকান্দার শাহের শাসনামলে (৭৫৯-৭৯২ খ্রি.) আদীনা মসজিদের মিহরাবের উপর একটি চমৎকার শিলালিপি দেখা যায়। যাতে একদিকে সুলুস লিপি অন্যদিকে কুফী লিপিতে লিখিত বাণী শিলালিপির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। একটি শিলালিপিতে ক্যালিগ্রাফির দু'টি শৈলীর প্রয়োগ সে সময় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

বাংলার কোন কোন শিলালিপিতে রুক'আহ লিপির প্রচলনও দেখা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে তা তাওকী' রীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও এর হরফগুলো ততটা মোটা হয় না এবং এর লেখাগুলো সুলুসের ন্যায় কিছুটা ঢালু ও বাঁকানো। এর উল্লম্ব প্যাঁচানো রেখা ও বন্ধনীগুলো মাঝে মাঝে রায়হানী রীতির মত লম্বা হয়। রুক'আহ এর কিছু বৈশিষ্ট্য সিয়ানে প্রাপ্ত খানকাহ শিলালিপিতে (১২২১ খ্রি.) দেখা যায়। এর চমৎকার একটি নমূনা পাওয়া যায় বিহার শরীফের হাতিম খান প্রাসাদ শিলালিপি (১৩০৭ খ্রি.) এবং হাতিম খান মসজিদ শিলালিপিতে (১৩১৫ খ্রি.)। শিলালিপি দু'টি শুধু প্যাঁচানো আকৃতিতে নয় বরং পাথরের স্লাবের এ দু'টি খোদাইয়ের দক্ষতাও আকর্ষণীয়। যা দর্শকদেরকে সত্যিই বিস্মিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৯৯: জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত উমরপুর দারসবাড়ি মসজিদের শিলালিপি

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত উমরপুর দারসবাড়ি মসজিদের শিলালিপি বাংলার সে যুগের ক্যালিগ্রাফির অপূর্ব নিদর্শন। স্থাপত্য ক্যালিগ্রাফিতে সুলুসে জালীকে অনেক সুন্দর দেখায়। যাতে লেখাগুলো বেশি স্ফীত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ দেখায়। এটি অধিক পুষ্ট ও জাঁকজমকপূর্ণ। জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত একটি সমাধিফলক মুহাক্কাক রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৪৮২ খ্রিস্টাব্দের গৌড়ের একটি খানকাহ শিলালিপিতে এ রীতির প্রয়োগ দেখা যায়। রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত কুরআনের একটি আয়াত সম্বলিত একটি শিলালিপি রায়হানী লিপিতে লেখা হয়।

মধ্যযুগের বাংলায় শিলালিপির বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। বাংলার সুলতানদের সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি সমূহের উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। আর কিছু রয়েছে সংশ্লিষ্ট স্থাপত্যের গায়ে। আরবী ও ফারসী ভাষায় উৎকীর্ণ এ সকল শিলালিপিতে সাধারণত কুরআনের আয়াত, হাদীস, সুলতানের পরিচয়, উৎকীর্ণকারীর পরিচয় ও তারিখ উল্লেখ থাকত। শিলালিপিগুলোর সিংহভাগই মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, প্রাসাদ, সেতু, ঈদগাহ, ফটক, পুকুর ও কুয়া ইত্যাদি নির্মাণ বা খননের সময় উৎকীর্ণ হত। ড. আহমদ হাসান দানী ১৯৫৭ সালে সর্বপ্রথম বিভিন্ন সময় উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহের একটি বিস্তারিত তালিকা ‘এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান’ জার্নালের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৯৬০ সালে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর রাজশাহী থেকে প্রকাশিত শামসুদ্দিন আহমদ প্রণীত Inscription of Bengal, Vol.IV নামক গ্রন্থে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহের পাঠ ও বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থ দু’টি সুলতানী বাংলার শিলালিপি সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা দেয়।[১৪৬]

[১৪৬] এ. কে. এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি-১৯৯৯), পৃ.৪১।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিহারের মানেরে অঞ্চলে অবস্থিত শাহ দৌলতের সমাধিতে ও রাজস্থানের জালোরে তৈরি একটি ঈদগাহে ফারসী শিলালিপি (১৩১৮ খ্রি.) গুজরাটের আহমাদাবাদ জামে মসজিদের পূর্ব ফটকের উপরে একটি আরবী শিলালিপি (১৩২৪ খ্রি.) ও কুতুবশাহী সুলতান মুহাম্মদ আমীনের সমাধি ফলক (১৫৯৫-৯৬ খ্রি.) ইত্যাদি শিলালিপিতে তুঘরা অলঙ্করণের রীতির অনুসরণ দেখা যায়। তবে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার শিলালিপি গুলোতে 'বেঙ্গল তুঘরা' এর ব্যবহার দেখা যায়। গৌড় দুর্গ শহরের মিয়ানাহ দ্বারের নীম দরজা শিলালিপি (১৪৬৬-৬৭ খ্রি.) যা বর্তমানে গৌড়ের মাহদিপুর গ্রামের মিনারওয়ালী মসজিদের দেয়ালে স্থাপিত রয়েছে এবং মিয়ানাহ দ্বারের ছাঁদ দরজা শিলালিপি উভয়টিই এ রীতির অপূর্ব উদাহরণ। বাংলার তুঘরার অলঙ্করণে লেখার গতি ও হরফের ছন্দোবদ্ধ চিত্রের বিচিত্র বিষয়বস্তু কল্পনা করা যায়। এসব লিখনশিল্পের মধ্যে আমরা কখনও খুঁজে পাই বাংলার জীবন, প্রকৃতি ও পরিবেশের বিমূর্ত রূপ। কখনও বাংলার আদিবাসীদের প্রাকৃতিক তীর-ধনুকের শিকার জীবন, কখনও নৌকা ও দাঁড়ের দৃশ্য আবার কখনও হাঁস বা নদীমাতৃক গ্রাম-বাংলার নলখাগড়ার রূপকভাবের প্রকাশ।

চিত্র-১০০: পাথরে বেঙ্গল তুঘরায় অঙ্কিত শিলালিপির অংশবিশেষ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলের একটি মাইলফলকের চমৎকার উদাহরণ সেতুর শিলালিপি (১৬৯০ খ্রি.)। এ শিলালিপিতে নাসতা'লিক রীতির বর্ণবিন্যাসে সঠিক পরিমাপ ও অনুপাত ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া শিকাসতা একটি বিরল লিপিশৈলী যাতে হরফের জড়ানো ও প্যাঁচানো রূপ ক্রমশ নীচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে যায় এবং অবশেষে পরবর্তী শব্দের সাথে মিশে যায়। ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের রাজমহলের গাজী ইব্রাহীমের সমাধি ফলকে শিকাসতা লিপির এক বিরল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বাংলার কিছু শিলালিপিতে ইজাযাহ লিপির ব্যবহার দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। যেমন- বর্তমান বানিয়া পুকুরের শেখ 'আলা আল-হক মসজিদ শিলালিপি (১৩৪২ খ্রি.) গৌড়ের গুনমন্ত মসজিদ শিলালিপি (১৪৮৪ খ্রি.) ও সুলতানগঞ্জ মসজিদ শিলালিপি (১৪৭৪ খ্রি.) ইত্যাদি। আরেকটি অসাধারণ লিপিশৈলী হলো মুসান্না বা প্রতিবিম্ব লিপি। স্থাপত্য শিলালিপিতে কিছুটা দুর্লভ হলেও এর একটি উদাহরণ দেখা যায় গৌড়ের মাহদিপুর হাইস্কুল জাদুঘরে সংরক্ষিত একটি ভিন্নধর্মী শিলালিপি (১৪৫৮-৫৯ খ্রি.)। সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩৭-৬০ খ্রি.) অজানা একটি মসজিদ থেকে আরবী শিলালিপি পাওয়া যায়। যাতে চিরাচরিত প্রথাবিরোধী একেবারে ভিন্নধর্মী মুসান্না রীতির অনুসৃত হয়েছে। আয়নায় দেখলে যেমন প্রতিবম্বের সৃষ্টি হয়, এ শিলালিপিটি সেইরূপ দেখা যায়।

এভাবে বাংলায় ভিন্নধর্মী ও সমৃদ্ধিশালী শৈল্পিক ধারার মাঝে আমরা খুঁজে পাই বহুত্বের মধ্যে একত্বের এক অনবদ্য নিদর্শন। এসব শিলালিপি স্বকীয়তায় সমৃদ্ধশালী এবং ইসলামী ক্যালিগ্রাফির এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত। যা এ অঞ্চলের এক গৌরবোজ্জ্বল নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিচায়ক। ইসলামী সংস্কৃতির অনুষঙ্গী লিপি অঙ্কনের এ শিল্প প্রকরণ (তুঘরা) শিলালিপিগুলোতে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়ে সমকালীন বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে।

২.৫.৪ বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি

শিল্পকলার অন্যান্য শাখার শিল্পীগণকে ক্যালিগ্রাফির নিয়ম-কানুন রপ্ত করার পাশাপাশি এ শিল্পে পারদর্শিতাও অর্জন করতে হয়েছে। কারণ বিভিন্ন শিল্পের অলঙ্করণের ক্ষেত্রে ক্যালিগ্রাফি একটি বিমূর্ত অলঙ্করণ কৌশল হিসেবে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। স্বর্ণকার, কর্মকার, মৃৎশিল্পী, বয়নশিল্পী এবং কাঠ ও পাথরে উৎকীর্ণ শিল্পীকে অবশ্যই ক্যালিগ্রাফির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। এসব শিল্পকর্মেও ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন পদ্ধতিতে লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে। ফলে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চাহিদা বেড়ে যায় এবং এর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। হিজরী একাদশ শতাব্দীতে ত্রিশের অধিক লিপিরীতির প্রচলন লাভ করে। তাছাড়া এ আমলেই ক্যালিগ্রাফারগণ নিজেদের চিন্তাধারাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার হাফিজ উসমান এ ক্ষেত্রে অগ্রণী

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা পালন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে বিমূর্ত ছবি সৃষ্টির চিন্তা করেন। তার এ চিন্তাধারা পরবর্তীকালে ‘হিলইয়া’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

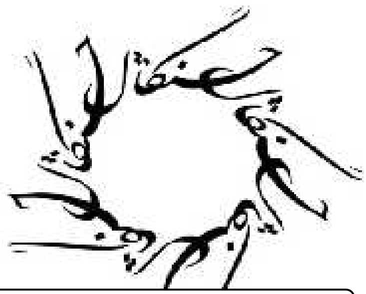

চিত্র-১০১: ট্যাটু আকৃতিতে বিমূর্ত ধারার ক্যালিগ্রাফি

শিল্প হলো মনের আবেগ অনুভূতির রঙ, রেখা ও কর্মের মাধ্যমে নান্দনিক উপস্থাপনা। যার মধ্যে থাকতে হয় রসবোধ। যা ইল্যুয়েশন তৈরি করে এবং দর্শকদের ভাবায় ও তাড়িত করে। সম্প্রতি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হয়েছেন ইরাকের বিখ্যাত শিল্পী সাদী আল-কাবী। তাঁর ক্যালিগ্রাফির বিষয়বস্তু ছিল- মরুভূমিতে শিলালিপি। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনীতে পাকিস্তানের শিল্পী গুলজীর লিপিশৈলী- ১, ২, ৩, ৪ নামে চারটি ছবি প্রদর্শিত হয়। যা দর্শকদের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়। ক্যানভাসে স্পেচুলা ও তুলি দিয়ে আঁকা ছবি মোটা তেলরঙে তাঁর যে ব্রাশিং, তা দর্শকদের রীতিমত মুগ্ধ করে। তাঁর ছবি দেখে মনে হয় যে, তা আরবী লেখা। কিন্তু কী লেখা? তা বুঝা ছিল বড়ই দুরূহ ব্যাপার।[১৪৭]

২০০০ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের চিত্র প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের শিল্পী কালিদাস কর্মকারের যে ছবি পুরস্কার পায় তা ছিল একটি বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি। আরবী ক্যালিগ্রাফির ধারাসমূহ পরোক্ষভাবে সমকালীন নক্শা প্রণয়নে বিমূর্ত মূর্তিতে সহায়তা করে। যা এখনও পর্যন্ত মনোরমভাবে শব্দের উপস্থাপন এবং হরফের প্রতিস্থাপনা উন্মুক্ত করে। বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফির ক্ষেত্রে শিল্পকলার সেই মূলনীতিটি স্মরণ রাখা উচিৎ- মূর্ত ছবি আঁকতে না জানলে, তার বিমূর্ত ছবি আকার অধিকার নেই। অর্থাৎ ক্যালিগ্রাফির মৌলিকজ্ঞান না থাকলে তার জন্য বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি না করাই উত্তম। ঠিক একথা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও, কবিতার ক্ষেত্রেও। ছন্দ জানার পরই ছন্দ ভাঙার অধিকার অর্জিত হয়। শিল্প-সংস্কৃতি জগতের এটাই বিধি।

[১৪৭] ইব্রাহীম মন্ডল, *‘ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিকাশ ও বর্তমান সমাজে প্রভাব’*, *মাসিক তানযীমুল উম্মাহ*, পৃ.১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে তার ট্রাডিশনাল ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বিমূর্ত ধারা। আধুনিক ধারার ক্যালিগ্রাফারগণ বিমূর্ত ধারার ক্যালিগ্রাফি করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। দৃষ্টিমুগ্ধ ও শিল্পমানে উত্তীর্ণ এসব ক্যালিগ্রাফি সমকালীন ধারারই একটি অংশ। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি সমকালীন ধারায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।[১৪৮]

২.৫.৫ পাণ্ডুলিপিতে ক্যালিগ্রাফি

চিত্র-১০২: হস্তলিখিত আল-কুরআনের পাণ্ডুলিপি

ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে কুরআন শরীফ বা অন্য কোন গ্রন্থ ছাপানো সম্ভব ছিল না। তাই তা সুন্দর হস্তলিখনের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ কিংবা সংরক্ষণ করা হতো। ফলে তখন সুন্দর হস্তলিখনের ব্যাপক কদর ছিল। শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন ফন্টে কুরআন শরীফ কিংবা বিভিন্ন গ্রন্থ লিখত। যাকে পাণ্ডুলিপি[১৪৯] বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। নিম্নে বিভিন্ন সময়ে লিখিত কিছু পাণ্ডুলিপির সাইজ, লেখার মাধ্যম, ব্যবহৃত ফন্ট, কাতিব ও এগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো-

---

[১৪৮] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

[১৪৯] The manuscript materials for the study of calligraphy in pre-Mughal India are very scarce. Fortunately calligraphy forms an integral part of Islamic archetecture. So inscriptions on monuments bear witness to the development of calligraphy. But monuments of the earliest period are also rare. Moreover, photographs of inscriptions out of the context of the monuments to which

Dhaka University Institutional Repository

ক. পবিত্র আল-কুরআন

- উনবিংশ শতাব্দীতে নাসখী লিপিতে করা ১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৬-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ কুরআনের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এর কাতিবের নাম জানা যায়নি। এর প্রথম ২টি পৃষ্ঠা লাল, নীল, কালো ও স্বর্ণালি রঙে সজ্জিত। আর বাকী পৃষ্ঠাগুলোর আউটলাইনগুলো ছিল স্বর্ণালি বর্ণে রচিত।
- বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে নাসখী লিপিতে করা ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৭-৩/৪ ইঞ্চি প্রস্থ কুরআনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন গোলাম জিলানী। যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় ১৫টি করে লাইন ছিল। এর প্রথম, মাঝখান ও শেষ লাইনগুলো লাল এবং অন্যান্যগুলো কালো রঙে সুসজ্জিত ছিল।
- বিংশ শতাব্দীতে ৩৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৭-৩/৪ ইঞ্চি প্রস্থ কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন আবুল ফাতহ। পাণ্ডুলিপিটি ছিল নাসখী লিপিতে রচিত। এর প্রথম অংশটুকু ছিল স্বর্ণালি বর্ণে ও বাকীগুলো ছিল হাল্কা স্বর্ণালি বর্ণে। যার আয়াতগুলো এরাবেস্ক-এর উপর অঙ্কিত ছিল।
- বিংশ শতাব্দীতে এজতেবাউর রহমান খান উপস্থাপন করেন ১-১/৪ ইঞ্চি স্কয়ার সাইজের কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি। এটি নাসতা'লিক লিপিতে লিখিত। যার চতুষ্পার্শ্বের আউটলাইন গুলো ছিল লাল বর্ণে এবং ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো ছিল কমলা, নীল ও স্বর্ণালি বর্ণে সজ্জিত।
- ১৯৭৭ সালে নাসখী লিপিতে ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৮-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন-জাহানারা বেগম। মেশিন উৎপাদিত পিঙ্ক পেপারে লিপিবদ্ধ এ পাণ্ডুলিপির প্রতি পৃষ্ঠায় কালো বর্ণে ২০ লাইন করে লেখা হয়।

---

they belong do not convey even half of their original artistic qualities. (*Islamic Calligraphy in the medieval India*, Ibid, p.1)

Dhaka University Institutional Repository

- বাংলাদেশে হাতে লেখা সর্ববৃহৎ কুরআন লিখেন মোঃ হামিদুজ্জামান। তিনি রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানার বামনাহাল গ্রামের অধিবাসী। তিনি ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত মোট ৮ বছরে এ পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন। পাণ্ডুলিপিটির দৈর্ঘ্য ২ ফুট ৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ১ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতা ৯ ইঞ্চি। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০০ ও ওজন ৬১ কেজি।
- চট্টগ্রামের ভুজপুর থানার হেয়াকো গ্রামের মফিজুল হক নূরীর স্বহস্তে লিখিত কুরআন শরীফের সন্ধান পাওয়া যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরিতে। যা সম্পন্ন হয় ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সাল থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত সময়ে। অর্থাৎ ২ বছর ২ মাস ১১ দিনে। পাণ্ডুলিপিটির দৈর্ঘ্য ১ ফুট, প্রস্থ ৯ ইঞ্চি, উচ্চতা ১ ইঞ্চি। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬০ ও ওজন প্রায় ১ কেজি।
- ঢাকার উত্তর মুগদার অধিবাসী জহির উদ্দিন আহমেদের নিকট ক্ষুদ্রতম কুরআনের সন্ধান পাওয়া যায়। যা বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরিতে রয়েছে। যার দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চি, প্রস্থ ০.৭৫ ইঞ্চি, উচ্চতা ০.৭০ মিলিমিটার ও ওজন মাত্র ২.৩৮ গ্রাম।[১৫০]

খ. অন্যান্য পাণ্ডুলিপি

- **মাখযান আল-আছার:** ৭-৩/৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫ ইঞ্চি প্রস্থ, নাসতা'লিক লিপিতে লিপিবদ্ধ এ পাণ্ডুলিপি উপস্থাপন করেন অধ্যাপক এ. বি. এম হাবীবুল্লাহ। এটি ছিল গাঁজা অধিবাসী ইলিয়াস আবু মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন রচিত একটি পারস্য কাব্যগ্রন্থ।
- **শাহনামা:** এজতেবাউর রহমান খানের উপস্থাপিত পাণ্ডুলিপিটি ছিল ৯-১/৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫-১/৮ ইঞ্চি প্রস্থ। এটি ইরানের তুস নগরীর আবুল কাশেম ফেরদৌসি কর্তৃক রচিত বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক পারস্য মহাকাব্য। যাতে ষাট হাজার শ্লোক রয়েছে ।

---

[১৫০] *পোস্টার: ইসলামী ফাউন্ডেশন, মহানবী (সা.)-এর জীবনীভিত্তিক পোস্টার ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৮।*

Dhaka University Institutional Repository

- **ফতওয়ায়ে আলমগীরী:** এটি ৪ ভলিউমে রচিত ফিক্‌হ বা আইন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি। ১৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৯-১/৪ ইঞ্চি প্রস্থ এ পাণ্ডুলিপিটি আরবী ভাষায় নাসখী লিপিতে লেখা। এটি সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের অনুরোধে মোল্লা নিজাম উদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত উলামা বোর্ডের মাধ্যমে সংকলিত হয়।
- **মাকতুল হোসাইন:** এ পাণ্ডুলিপিটি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পাওয়া যায়। যার দৈর্ঘ্য ছিল ১২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ছিল ৭ ইঞ্চি। এটি মুহাম্মদ খাঁন রচিত একটি কাব্যকর্ম। যাতে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের নৃশংস ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[১৫১]

- **সংবিধান গ্রন্থ:** বাংলাদেশের সংবিধান গ্রন্থে প্রেসের টাইপ ব্যবহার না করে পুরো গ্রন্থটি হাতে লেখা হয়েছে। এর লিপিকার হলেন- শিল্পী আবদুর রউফ। এটি ক্যালিগ্রাফি, অন্যান্য নক্‌শা ও চিত্রের জন্য উল্লেখযোগ্য একটি শৈল্পিক গ্রন্থ।[১৫২]

২.৫.৬ টাইলসে ক্যালিগ্রাফি

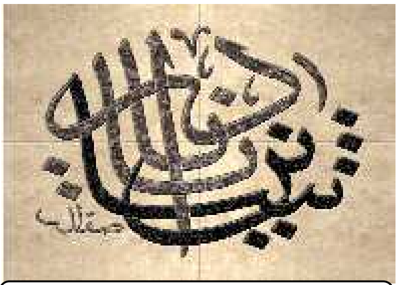

চিত্র-১০৩: টাইলসের উপর আঁকা সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফি

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহুবিধ ব্যবহারের মধ্যে টাইলসে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বিগত কয়েক দশক ধরে আমাদের দেশে টাইলসে ইসলামী বিষয় তথা কুরআনের আয়াত, হাদীস, দু‘আ, আল্লাহর গুণবাচক নাম, আল্লাহ, মুহাম্মাদ ইত্যাদি টাইলসের উপর লেখা হয়। কেউ কেউ রঙ-তুলিতে ক্যালিগ্রাফি আঁকেন। তবে বর্তমানে টাইলসের উপর ক্যালিগ্রাফির ছাপ দেওয়া হয়। এসব টাইলস মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, মাজার ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়। আবার কিছু

---

[১৫১] এনামুল হক, *বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা*, জাতীয় জাদুঘর (ঢাকা: এপ্রিল-১৯৭৮), পৃ.১৭-২০।
[১৫২] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *চারু ও কারুকলা*, বাংলাদেশ, নবম-দশম শ্রেণি, পুণর্মুদ্রণ-২০১৭, পৃ.২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মভীরু ব্যক্তি আছেন যারা তাদের নির্মিত ভবনের ফটকে কিংবা ড্রইংরুমে ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত টাইলস ব্যবহার করে সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস চালান।

২.৫.৭ কাঠে উৎকীর্ণ লিপি

চিত্র-১০৪: কাঠখোদাই করা একটি ক্যালিগ্রাফির অংশ বিশেষ

শান্তিপূর্ণ পৃথিবী সবারই কাম্য। পৃথিবীর ঊষালগ্ন হতেই তা লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম যুগে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির অভাবে মানুষ কাঠের নিজস্ব আকার-আকৃতি ও স্বভাবকে অক্ষুণ্ন রেখে সব কাজে ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু পরে বৃক্ষ সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির অধিকারী হওয়ায় তারা কাঠকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলঙ্করণের মাধ্যমে কাঠকে আকর্ষণীয় শৈল্পিক রূপ দিয়েছে। উন্নতমানের আসবাবপত্র, দর্শনীয় ঘর-বাড়ি ও ভাস্কর্য নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। ভাস্কর্য ও ঘর-বাড়ির পাশাপাশি প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত আসবাবপত্রকে দর্শনীয় অলঙ্করণের মাধ্যমে রুচিশীল করেছে। ফলে খাট-পালঙ্ক, কাঠের বেড়া, ঘর-বাড়ি ও দালানকোঠায় ব্যবহৃত কড়িবর্গা পর্যন্ত দর্শনীয় শিল্পরূপ ধারণ করেছে। ১৭৭৮ সালে প্রথম কাঠের বাংলা অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অতপর গ্রন্থ ছাপার ও গ্রন্থকে সচিত্রকরণের ক্ষেত্রে কাঠখোদাই চিত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে। একপর্যায়ে কাঠখোদাই চিত্র শিল্পকলার জগতে সম্মানজনক স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। বর্তমানে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১৯৮৫ সালের ২০ অক্টোবর হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়ার স্লোভেঞ্জ গ্রাডাকে কাঠখোদাই চিত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। যা জাতিসংঘের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়। স্পেনের শিল্পী চিলিডা এডোয়ার্ডে বিমূর্তধারায় কাঠ দিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের রেহাল তৈরি করেন। শিল্পী তাঁর সৃষ্ট চিত্রের নাম

Dhaka University Institutional Repository

দেন ‘Wood for the book of the Koran’. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিল্পের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকার কামনা শান্তিকামী সব মানুষের।[১৫৩]

কাঠখোদাই করে শিল্প নির্মাণ বাংলাদেশীদের এক চিরায়ত রীতি। এতে বিভিন্ন ফুল, ডিজাইন ও ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করে শিল্পরসিক মানুষগণ তাদের শিল্পীত মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। রাজধানী ঢাকার খিলগাঁও এর বাসিন্দা মাওলানা আব্দুল হালিম তাঁর ঘরের অভ্যন্তরীণ দরজার বহিরাংশে ‘কুল্লু ‘আমিন ওয়া আনতুম বিখাইর’ শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি সংযোজন করেছেন। অনেকেই আবার তাদের ঘরের আসবাবপত্র বানানোর ক্ষেত্রে কাঠখোদাইয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত ভাস্কর রাসা কাঠখোদাই করে ‘মুহাম্মাদ’ নামের ক্যালিগ্রাফি করে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। তাছাড়া তিনি এভাবে বাংলা ও আরবী ভাষার বর্ণমালাকে উপজীব্য করে কাঠখোদাইয়ে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। ১৯০৯ সালে টাঙ্গাইল জেলার করটিয়ায় ১১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৫৯-১/২ ইঞ্চি প্রস্থ কাঠ নির্মিত একটি উৎকীর্ণ লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ লিপিটি ভারতের কলকাতা জাদুঘরে সংরক্ষিত হয়। যা ছিল নাসখী লিপিতে করা।[১৫৪]

২.৫.৮ মুদ্রা লিপি

প্রাচীনকাল থেকেই ইসলামের মুদ্রা ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে প্রভাবিত করছে। কোন কিছুর ছাপ, রাজার ছবি বা কোন মূর্তি অঙ্কনের বিপরীতে মুদ্রায় লিপিশিল্পের বিকাশ মুসলমানদের বিশেষ অবদান। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই মুসলমানদের বিশ্বাসের মৌলিক ভিত্তিগুলো ইসলামী ক্যালিগ্রাফি দিয়ে মুদ্রার পিঠে অঙ্কন করার চর্চা ছিল একটি বিশেষ ঐতিহ্য। ৭১১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই শ্রেষ্ঠবীর তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক স্পেন বিজয়ের মধ্য দিয়ে ইউরোপের প্রবেশদ্বার খ্যাত স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরের বছর মুসা ইবন নুসাইর স্পেনের অবশিষ্ট এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ল্যাটিন লিপিতে তাঁর নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা ছাপান। স্পেনে মুসলিম

[১৫৩] ড. আব্দুস সাত্তার, ‘শান্তির জন্য কাঠখোদাই’, দৈনিক *নয়াদিগন্ত*, ঈদ সংখ্যা-০৮, ঢাকা, পৃ.৫১২-৫১৩।
[১৫৪] *জার্নাল: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ* (ঢাকা: ১৯৫২), পৃ.২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিজয় এবং এর প্রভাব পরবর্তীতে দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে সমকালীন বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলিম মুদ্রার এ অলঙ্করণে আকৃষ্ট এবং প্রভাবিত হয়েছেন খোদ ব্রিটেনের এক রাজা। তিনি তাঁর রাজত্বকালের স্বর্ণমুদ্রায় সরাসরি মুসলমানদের বিশ্বাসের প্রতিভূ কালিমা অঙ্কন করেছেন। ইংল্যান্ডের মার্সিয়ার রাজা ওফ্‌ফা রেক্স (৭৫৮-৭৯৬ খ্রি.) এর তৈরি এ স্বর্ণমুদ্রা ইংল্যান্ডের মুদ্রার ইতিহাসে সম্ভবত প্রথম স্বর্ণমুদ্রা। যা বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। মুদ্রাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে- This gold Dinar, minted by king Offa of merica (Kent, England) between 758-796 CE, was probably the first gold coin minted in England. এ মুদ্রাটির উপরিভাগে সরাসরি আরবী হরফে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু’ লেখা রয়েছে। এভাবে মুদ্রাটিতে কালিমা তাইয়িবা ও কালিমা শাহাদাতের মধ্যাংশ একত্র করে আল্লাহর একত্ববাদের স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

চিত্র-১০৫: মেটাল মুদ্রার উপর অঙ্কিত সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফির নমূনা

মুদ্রাটির উপরের মার্জিনে আরবী ভাষায় যে বাক্য লেখা রয়েছে- ‘হুয়াল্লাযি আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা ওয়া দীনিল হাক্ক, লিয়ুজহিরাহু ‘আলাদ্দীনি কুল্লিহ’। মুদ্রাটির অপর পিঠে যা লেখা ছিল ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন বিজয়ের পর মুসলমানরা স্পেন থেকে ইউরোপ বিজয়ে অগ্রসর না হলেও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি আশপাশের দেশগুলোর উপর প্রভাব ফেলে। এ মুদ্রা মুদ্রণকালে স্পেনে আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের শাসনকাল (৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.) চলছিল। তিনি স্পেনে উমাইয়া রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আমলেই কর্ডোভা নগরী হয়ে উঠে

Dhaka University Institutional Repository

Jewel of the world. সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক হিট্টি বলেন, 'মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে স্পেন একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেন।'[১৫৫]

উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের মুদ্রালিপি ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বড় নিদর্শন। তখন মুদ্রা ছিল সোনার দিনার, রূপার দিরহাম ও অন্যান্য। এসব মুদ্রায় ক্ষুদ্রাকারের অনেক ঐতিহাসিক চিত্র বা ক্যালিগ্রাফি মুদ্রিত থাকত। এসব ঐতিহাসিক চিহ্নের মাধ্যমে মুসলিম শিল্প ঐতিহ্যের নিদর্শন লক্ষ্যণীয়। এসব মুদ্রায় অঙ্কিত, মুদ্রিত বা খোদিত শিল্প এবং ক্যালিগ্রাফি ৭৭ হিজরীর পরে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক দ্বারা তৈরি হয়। আব্বাসী যুগে সুইডেনে বিভিন্ন আরবী ক্যালিগ্রাফি অঙ্কিত ষাট হাজার মুদ্রা রক্ষিত আছে। রাশিয়া ও মুসলিম বিশ্বের বাইরে এটাই হচ্ছে সর্বাধিক ইসলামী ক্যালিগ্রাফি খোদিত মুদ্রা। এভাবে আমাদের দেশেও মুসলিম শাসনামলে বিভিন্ন সুলতান মুদ্রালিপি ব্যবহার করেন। আজও জাতীয় জাদুঘরে বিভিন্ন সময়ের এসব মুদ্রালিপি সংগৃহীত আছে। এছাড়া অলঙ্কৃত অসংখ্য নিদর্শন, মৃৎপাত্র, স্থাপত্যকীর্তি, ধাতবপাত্র ও চিত্রকলায় দেখা যায়। এসব নিদর্শনে কুফী, নাসখী, মুহাক্কাক, সুলুস, রায়হানী ও তুঘরা লিপির ব্যবহার দেখা যায়।[১৫৬]

২.৫.৯ ক্যালিগ্রাফির ডিজিটালাইজেশন

বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। অনেক তরুণ শিল্পী চিত্রকলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে ১৯৮১ সাল থেকে এশিয় চারুকলার প্রদর্শনীগুলোর আয়োজন ঢাকায় হওয়ায় বিভিন্ন দেশের শিল্পচর্চা ও শিল্পকলার বিষয়গুলো নিয়ে সেমিনার, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্পের বিশাল ক্ষেত্র আমাদের সামনে এসে গেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ মহাদেশসহ প্রায় ৪৫টি দেশের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের

---

[১৫৫] মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, '৮ম শতাব্দীর ব্রিটিশ মুদ্রায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', *ইসলামিক ফাইন্যান্স*, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, আগস্ট-২০০৬), পৃ.১৩।
[১৫৬] আমিনুল ইসলাম আমিন, 'স্বর্ণমুদ্রার লেখা কালিমা তায়্যিবা', *দৈনিক যুগান্তর*, ৯ ডিসেম্বর-২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রশিল্পের নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। প্রতিটি প্রদর্শনীতে প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট চিত্রকর্ম শিল্পী ও শিল্পরসিকদের আনাগোনা চোখে পড়ার মত। যেমন- এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী, জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী, এমনকি তরুণ চারুকলা প্রদর্শনীতে নানারকম ইনস্টলেশন, ডিজিটাল আর্টসহ প্রযুক্তিনির্ভর চিত্রকলা প্রদর্শিত হচ্ছে। ২০০৩ সালে ঢাকায় একাদশ চারুকলা প্রদর্শনীতে বেশ কিছু ডিজিটাল পেইন্টিং স্থান পায় এতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর চিত্রকলার অস্ট্রেলিয়ার চিত্রশিল্পী মিশেল মিলির ক্লাউড নামের শিল্পকর্মটি পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশের শিল্পী অশোক কর্মকারের ই-ইনস্টলেশন ট্রিবিউট নামের শিল্পকর্ম একই প্রদর্শনীতে স্থান পায়। দ্বাদশ চারুকলা প্রদর্শনী-০৬ তে ডিজিটাল পেইন্টিং ও ই-ইনস্টেলেশন সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। জাপানের হিরোশি ফুজি ই-ইনস্টেলেশন এবং বাংলাদেশের শিল্পী ঢালী আল-মামুন, ইন্দোনেশিয়ার শিল্পী পুনিমিন এম. হাম-এর Mixed media Climbing on empty expection staires নামের ই-ইনস্টলেশন। বাংলাদেশের শিল্পী মাহবুবুর রহমানের The Length of time ইনস্টলেশন এবং ইরানের শিল্পী আহমেদ নাদালিরানের Paradise শিল্পকর্ম। যাতে ইন্টারএকটিং মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। ইনস্টলেশন শিল্পে অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু শিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এতে বুঝা যা যে, বর্তমানে অতীতের চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীরাও পিছিয়ে নেই।[১৫৭]

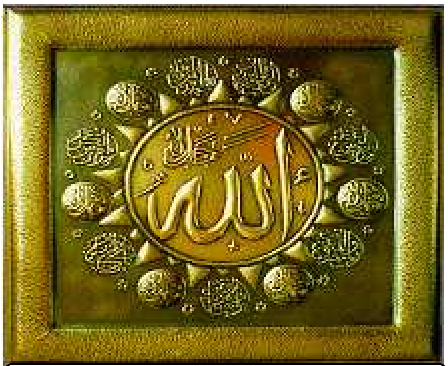

চিত্র-১০৬:মেটালের উপর ছাপকৃত ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নমূনা

বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফিতে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সংযোগ ঘটেছে। এদেশের ক্যালিগ্রাফারগণ এ শিল্পের ঐতিহ্যিক স্বভাবকে স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করেন। বাঁশের কঞ্চির সুতীব্র টান থেকে ক্যালিগ্রাফারগণ পানিরং, তেলরং হয়ে ভাস্কর্যের দিকেও ধাবিত করেছেন। তবে এ শিল্প বিভিন্ন প্রযুক্তির যোগসাজশের উপস্থিতি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ডিজিটাল ইফেক্টিভ ক্যালিগ্রাফি কি রঙ-

[১৫৭] *জার্নাল: এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তুলি, ক্যানভাস কিংবা কালি-কাগজের ক্যালিগ্রাফির নান্দনিক সারিকে স্পর্শ করতে পারবে? ক্যালিগ্রাফিতে নান্দনিকতার অবলম্বন অথবা প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ততা কিছু শিল্পীকে ভাবিয়ে তুললেও অনেকে এতে অবিরাম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন। শিল্পী আরিফুর রহমান সর্বপ্রথম ডিজিটাল মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি আঁকার প্রয়াস পান।[১৫৮]

কোন কোন শিল্পী মনে করেন, শিল্পকর্মের ডিজিটালাইজেশন বা প্রিন্ট করার দ্বারা শিল্পের মান ক্ষুণ্ন হয় না। কারণ পৃথিবীর সব বড় বড় শিল্পীর শিল্পকর্মের প্রিন্ট রয়েছে। যদি মানক্ষুণ্ন হতো, তাহলে পিকাসোর আঁকা মোনালিসা কিংবা ভ্যানগগের আঁকা বিখ্যাত ছবি সংগ্রহে রাখা সম্ভব হতো না। ফলে সবাই বিশ্বশিল্পের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকত। মূল শিল্পকর্ম তার মূলস্থানেই থেকেই যায়। মোনালিসার প্রিন্ট করা ছবি বাজারে বিক্রি হলেও এর মূল শিল্পকর্মটির মান কিংবা দাম কিন্তু কমেনি। তাই শিল্পকর্মের ডিজিটালাইজেশন একটি ভালো বিষয় বলে অনেকে মনে করেন। কারণ এতে শিল্পকর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে এবং শিল্পকর্ম সহজলভ্য হয়।[১৫৯]

---

[১৫৮] মিরাজ রহমান, *শৈল্পিক ৬৯*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২।

[১৫৯] মিরাজ রহমান, '*দেশের জন্যই আমার এসব শিল্পকর্ম*', শিল্পী মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম-এর সাক্ষাৎকার, গ্রহণ করেছেন- *দৈনিক আজকালের খবর*, ২১ জুন-২০১২, পৃ.৪।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

২.৬ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহুমাত্রিক ব্যবহার

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি সুদূর অতীতকাল থেকে শিল্পকলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ শিল্পই বাণীবদ্ধভাবে পটভূমিতে অঙ্কিত হয়ে এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। সম্প্রতি ক্যালিগ্রাফির সাথে সমকালীন অন্যধারার চিত্রকলার সংযোগে এ শিল্পে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশ্বব্যাপী ক্যালিগ্রাফি নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা ও কৌতুহল বেড়েছে এবং বেড়েছে এর বহুমাত্রিক ব্যবহারও।[১৬০] নিম্নে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহুমাত্রিক ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

২.৬.১ মসজিদে

মসজিদ আল্লাহর ঘর। হাদীসের ভাষ্যমতে মসজিদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান। মুসলমানদের ইবাদতের পবিত্রতম স্থান। তাই পৃথিবীর সব দেশেই মসজিদগুলো নির্মাণ করা হয় অনেক কারুকার্য ও স্থাপত্যশৈলীতে। মসজিদের ভেতরের অংশ, সাহান, মিনার প্রভৃতি সেই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। মসজিদ অলঙ্করণে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার শুরু হয়েছে রাসূল (সা.) এর সময় থেকেই। মসজিদে নববীতেও অনেক ক্যালিগ্রাফি বিদ্যমান। ৭০৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এ মসজিদের দেয়ালে কুফী লিপি দিয়ে সোনালি হরফে পূর্ণমাপে ক্যালিগ্রাফি করেন খালিদ ইবনে সাইয়োজ। বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মসজিদগুলোতে ক্যালিগ্রাফির নান্দনিক কাজ দেখা যায়। মুসলিম জাহানের উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ মসজিদে কুফী, সুলুস, দিওয়ানী, নাসখী ও তুঘরা লিপিশৈলীতে ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে।

---

[১৬০] মুবাশ্বির মজুমদার, *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি,২০০৪), পৃ.১৮।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী আমল (১১৯২-১৫২৬ খ্রি.) থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তও মসজিদ অলঙ্করণে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার চোখে পড়ার মত। এ আমলে সুলুস, নাসখী, রায়হানী, মুহাক্কাক, রুক'আহ ও বেঙ্গল তুঘরা ইত্যাদি শৈলীতে ক্যালিগ্রাফি করা হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে একটি নবতর ধারা হিসেবে ক্যালিগ্রাফি বিশেষ একটি স্থান লাভ করেছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হিসেবে এদেশের মুসলিমগণ ক্যালিগ্রাফিকে সাদরে গ্রহণ করছে। দেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলায় সরকারী অনুদানে এবং দেশের আনাচে কানাচে জনগণের অর্থায়নে মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। যার অনেকগুলোতেই কম-বেশি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

শিল্পী সাইফুল ইসলাম ঢাকাসহ বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট মসজিদে ক্যালিগ্রাফি সংযোজন করেছেন। মসজিদের মিহরাব ও দেয়ালে কাঠ, ধাতু ও মার্বেলে কালিমা ও কুরআনের আয়াত দিয়ে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী ঢাকার ধানমন্ডির লেকপাড় মসজিদ, ফকিরাপুল মসজিদে, নোয়াখালীর মাইজদিকোর্ট প্রভৃতি মসজিদে কুফী, সুলুস, দিওয়ানী, নাসখী ইত্যাদি শৈলীতে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। শিল্পী আরিফুর রহমান কুমিল্লার দেবিদ্বারে একটি মসজিদে ক্যালিগ্রাফি করেন। মসজিদটিতে সিরামিক প্লেটভাঙ্গা ও রঙিন কাচের টুকরা ব্যবহার করে ক্যালিগ্রাফি ও অলঙ্করণ করা হয়েছে। ভেতর, বাহির ও মিনারসহ সর্বত্রই চমৎকার অলঙ্করণ ও ক্যালিগ্রাফি করেছেন। ঢাকার কসাইটুলী মসজিদেও ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে। কুফী, সুলুস, নাসখী ও নাসতা'লিক শৈলীতে কালিমা ও কুরআনের আয়াতগুলো লেখা হয়েছে। শিল্পী মনিরুজ্জামান মুন্সীগঞ্জের একটি মসজিদে পাথরে কালিমার ক্যালিগ্রাফি করেছেন। তাছাড়া তিনি আরো কয়েকটি মসজিদেও পাথরে খোদাই করে কালিমার ক্যালিগ্রাফি করেছেন।

শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মসজিদে ক্যালিগ্রাফি দ্বারা

চিত্র-১০৭: মসজিদ সুসজ্জিত করণের জন্য অঙ্কিত ক্যালিগ্রাফি

Dhaka University Institutional Repository

সজ্জিত করেছেন। তিনি চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় সমুদ্র বন্দরের ৫নং জেটি গেটের পাশে অবস্থিত একটি মসজিদে। এটি মূলত একটি প্রাচীন মসজিদ। যা ২০০০ সালের পর পুণসংস্কারের উদ্দেশ্যে ক্যালিগ্রাফি দিয়ে পুরো মসজিদকে সজ্জিত করা হয়। মসজিদটির মিহরাব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেওয়াল ও গম্বুজ প্রভৃতি স্থানে মার্বেল পাথর, কাঠ, সিরামিক ও কালো পাথরে কুফী, সুলুস, নাসখী ও তুঘরা লিপিতে ক্যালিগ্রাফি অলঙ্করণ করা হয়েছে। তিনি মুন্সীগঞ্জের লৌহজং থানার অদূরে সুন্ধিসার গ্রামে একটি মসজিদে আন্দালুসিয়ান, মাগরিবী, কুফী, প্রাচীন কুফী ও সুলুস লিপিশৈলীতে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। ঢাকার বারিধারা ডিওএইচএস একটি মসজিদের অভ্যন্তরে পিলারের উপরিভাগে বেঙ্গল তুঘরায় আল্লাহর গুণবাচক নামের ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ১২টি আর্চে কুরআন ও হাদীসের বাণী সম্বলিত ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং এবং মিহরাবে কালিমার ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে। মসজিদটি ২০০৫ সালের ৩০ অক্টোবর উদ্বোধন করা হয়।

এভাবে বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদেই কালিমা, কুরআনের আয়াত, রাসূলের হাদীস, আল্লাহর গুণবাচক নাম, মসজিদের প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দু'আ সম্বলিত নান্দনিক ক্যালিগ্রাফি দৃশ্যমান হয়। যা তিলাওয়াতের মাধ্যমে একজন মুসল্লী যেমন পুণ্যের অধিকারী হন, তেমনিভাবে দৃষ্টিনন্দন এসব ক্যালিগ্রাফি মানুষের হৃদয়ে পবিত্র অনুভূতি জাগ্রত করে। পাশাপাশি ইসলামী শিল্পকলার এ গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ক্যালিগ্রাফির দ্রুত প্রচার, প্রসার ও বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

২.৬.২ মাদরাসায়

চিত্র-১০৮: ক্যালিগ্রাফিতে মাদরাসার নাম

মাদরাসা একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান। যেখানে আল-কুরআন, আল-হাদীস, ফিক্‌হ, আরবী সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসসহ ইসলামী শিক্ষার নানাবিধ গ্রন্থাবলি পড়ানো হয়। সঙ্গত কারণেই মাদরাসার শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী বা তদসংশ্লিষ্ট সবাই ইসলামী সংস্কৃতি লালনের অবারিত সুযোগ পান। তাই

Dhaka University Institutional Repository

কওমী ও আলিয়া উভয় নিসাবের মাদরাসায় ইসলামী সংস্কৃতির লালন দৃশ্যমান হয়। যার ফলশ্রুতিতে মাদরাসা ভবনে, ফটকে ও বাউন্ডারি ওয়ালে আল-কুরআনের আয়াত, রাসূল (সা.)-এর বাণী নীতিকথা, প্রবাদ-প্রবচন, বিখ্যাত দার্শনিকদের উক্তি, জ্ঞানার্জন বিষয়ক হাতের লেখা বা ক্যালিগ্রাফি চোখে পড়ে। অনেক প্রতিষ্ঠানের দেয়ালেই এসব শোভা পায়। আবার কোন কোন মাদরাসায় প্রকাশিত বার্ষিক দেয়ালিকা ও হাতের লেখা পোস্টারে ক্যালিগ্রাফির উপস্থাপন দেখা যায়।

২.৬.৩ অফিসে

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অফিসের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান, উর্ধ্বতন নির্বাহী কিংবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা রুচিশীল ও ধর্মভীরু হন, তারা তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত শো-পিছ কিংবা শিল্পকর্ম অফিসের দেয়ালে টানিয়ে রাখেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাসভবনেও শিল্পী সাইফুল ইসলামের নির্মিত ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম সংস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের অফিসের দেয়ালে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি সংযোজিত হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় অফিসে এ ধরনের শিল্পের অবস্থান ক্যালিগ্রাফারদের জন্য নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক।

বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্যশিল্পী লুই আই ক্যান এর নক্শায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন বিশ্ব স্থাপত্যকর্মের এক অনন্য সংযোজন। এ স্থাপত্যকর্মের মূল আকর্ষণ হলো সংসদ কক্ষ। সংসদের কার্যক্রম শুরু হয় ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ দিয়ে। তাই সংসদের অধিপতি স্পীকারের কুরসির উপরিভাগে স্থাপন করা হয়েছে একটি ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম। সেখানে জুট ট্যাপেস্ট্রি শিল্প মাধ্যমে স্থাপন করা হয়েছে বাংলা ক্যালিগ্রাফি ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’। এ শিল্পকর্মটি করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী মরহুম রশিদ চৌধুরী। বাংলাদেশে ট্যাপেস্ট্রি

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প মাধ্যমের স্বার্থক প্রয়োগকারী এবং লোকজ ধারার প্রয়োগে পথিকৃৎ শিল্পী রশিদ চৌধুরী তাঁর সমগ্র অর্জনকে ফুটিয়ে তুলেছেন এ শিল্পকর্মে। বাংলাদেশে বিসমিল্লাহ শব্দটি শুধু অর্থগত ভাবেই নয় লোকজ অর্থেও এটি গুরুর প্রতীকী হিসেবে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে সমাদৃত।

২.৬.৪ ভবনে

চিত্র-১০৯: গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় ক্যালিগ্রাফি

অনেক ধার্মিক ও রুচিশীল ব্যক্তি আছেন, যারা তাদের নির্মিত ভবনে নির্মাণশৈলী বা বাহ্যিক সৌন্দর্যের অংশ হিসেবে কা'বা ঘরের দৃশ্যসহ ইসলামী শিল্পকলার বিভিন্ন নিদর্শন বিশেষত ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম স্থাপন করেন। সরকারী ভবনেও এসব নজির বিদ্যমান। রাজধানী ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-রাজউক ভবনের পশ্চিম দেয়ালে সংস্থাটির লগোর মাঝে শিল্পী সাইফুল ইসলাম কর্তৃক সিমেন্টে নির্মিত ক্যালিগ্রাফি 'রাব্বিজ'আল হাযা বালাদান আমিনান' সবার নজর কেড়েছে। আয়াতটির অর্থ হলো- হে প্রভূ! তুমি এ শহরকে নিরাপদ শহর বানিয়ে দাও। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কুরআনের আয়াতের এ ক্যালিগ্রাফি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি শিল্পকর্ম- এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২.৬.৫ ফটকে

চিত্র-১১০: ফটকে বিসমিল্লাহ'র ক্যালিগ্রাফি

মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, মাজার ও কবরস্থানের প্রবেশের জন্য স্থাপিত ফটকে টাইলসে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের লেখা সম্বলিত ক্যালিগ্রাফি আগত ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনে সহায়ক হয়। অনেকে আবার বাসার প্রধান ফটকে লোহা বা স্টিলে নির্মিত 'আল্লাহ', 'মুহাম্মাদ' কিংবা মসজিদের ফটকে প্রবেশের দু'আ ইত্যাদি দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

শোভিত করেন। কেউ সৌখিনতা বশত বাসার ভেতরের দরজায় কাঠে খোদিত নক্শায় বিভিন্ন ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। বিশেষত বাসা বা বাড়ির প্রধান ফটক কিংবা অভ্যন্তরীন দরজায় ব্যবহৃত এসব ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈল্পিক নিদর্শন একদিকে যেমন ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করে অন্যদিকে ক্যালিগ্রাফি এসব আগত ব্যক্তির সামনে দৃশ্যমান হওয়ার সাথে সাথে ঐ ভবনে বসবাসকারীর রুচি ও তার ধর্মীয় চেতনা সম্পর্কে সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

২.৬.৬ যানবাহনে

আজকাল প্রায় সব ধরনের যানবাহনেই হস্তলিখিত কিংবা স্কচটেপে কৃত কালিমা তাইয়িবা, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ, মুহাম্মাদ, মা-শাআল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন ইত্যাদি সম্বলিত ক্যালিগ্রাফি চোখে পড়ে। বাস, ট্রাক ইত্যাদির পাশাপাশি প্রাইভেট কার, মাইক্রো বাস, এ্যাম্বুলেন্স, অটো রিক্সা, রিক্সা, টেম্পো, মোটর সাইকেল ইত্যাদিতে এসব লেখা সচরাচরই দেখা যায়। যা আরোহনকারী ব্যক্তিদের অন্তরে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

চিত্র-১১১: ট্যাক্সি ক্যাবের গ্লাসে বিসমিল্লাহ'র ক্যালিগ্রাফি

২.৬.৭ তৈজষপত্রে

চিত্র-১১২: ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত পানপাত্র

অগেকার আমলে রাজা বাদশাহ কিংবা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত বাসন-কোসন তথা গ্লাস, জগ, মগ, ফুলদানীসহ নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন উপকরণে আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষায় লিখিত বিভিন্ন ইসলামী কথামালা সম্বলিত ক্যালিগ্রাফির বহুল ব্যবহার ছিল। বর্তমানে এর ব্যবহার অনেকটা কমে গেলেও শিল্পপ্রেমী কিছু মানুষ আছেন, যারা এখনও এসব তৈজষপত্রে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬.৮ পোশাকে

চিত্র-১১৩:গেঞ্জিতে তুঘরা লিপির বিসমিল্লাহ

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের গায়ে দৃষ্টিনন্দন ডিজাইনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা গেলেও বাংলাদেশে এর চর্চা একেবারেই সীমিত। শুধু কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মাদরাসা, ইসলামী সংগঠন কিংবা কোন পীরের পক্ষ থেকে মিলাদুন্নবী (সা.), আশুরা দিবস কিংবা অন্যান্য ইসলামী অনুষ্ঠান উদযাপনের অংশ হিসেবে পরিধেয় গেঞ্জি, টুপি ইত্যাদিতে ক্যালিগ্রাফির কিছু ব্যবহার দেখা যায়।

২.৬.৯ প্রচ্ছদে

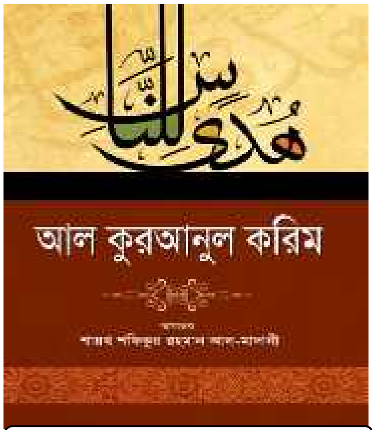

চিত্র-১১৪: প্রচ্ছদে কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি

বিভিন্ন ধরনের ইসলামী বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ডায়েরি, ব্রশিয়ার কিংবা ক্যাটালগের প্রচ্ছদে উক্ত বিষয়ের শিরোনাম, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি সম্বলিত ক্যালিগ্রাফি ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয়। শিল্পীগণ মনের মাধুরী মিশিয়ে বর্ণমালার বিভিন্ন প্রয়োগে বইয়ের নাম দিয়ে প্রচ্ছদ চিত্রণে এক শিল্প সুষমার উৎপত্তি করেন। আল-কুরআনের প্রচ্ছদের কারুকাজ এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এসব প্রচ্ছদ শিল্পকর্ম কোনটি ক্যালিগ্রাফি ধারায় ও নির্দিষ্ট ফর্মে আবার কোনটি ফ্রি-হ্যান্ড শিল্পকর্ম হিসেবে মূল্যায়িত। বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাসেম (জ. ১৯১৩ খ্রি.) এর শিল্পকর্মে ক্যালিগ্রাফির দ্যোতনা ও ব্যাঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বইয়ের প্রচ্ছদেও বাংলা ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার করেছেন। তিনি শুধু প্রথম মুসলিম চিত্রশিল্পীই নন বরং তিনিই এদেশে বাংলা ক্যালিগ্রাফির সূচনা করেন। পাঠক বা গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও দৃষ্টি নন্দন করতে প্রচ্ছদ শিল্পী কিংবা, গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের এসব

Dhaka University Institutional Repository

নান্দনিক উপস্থাপনা গ্রাফিক্স ডিজাইনের ভূবনে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। নানান ঢং ও বর্ণচ্ছটায় শোভিত এসব ক্যালিগ্রাফি পাঠকের হৃদয়ে ঝংকার সৃষ্টি করে।

২.৬.১০ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়

দেশে বর্তমানে অর্ধশতাধিক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বিশেষত টিভি চ্যানেল রয়েছে। এ সকল চ্যানেলে সংবাদ, বিভিন্ন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, নাটক, সিনেমা, বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে আলেখ্য অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়। এসবের মধ্যে মাহে রমজান জুড়ে ইফতার ও সাহরী অনুষ্ঠান, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), সীরাতুন্নবী (সা.), শবে বরাত, শবে মি'রাজ, শবে কদর ইত্যাদি ধর্মীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান, বিষয় ভিত্তিক আলোচনা, হামদ, না'ত, ইসলামী গান, কাওয়ালী, কবিতা আবৃত্তি, কুরআন তিলাওয়াত, হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা, কুরআনের তাফসীর, দারসে হাদীস, ইসলামী প্রশ্নোত্তরের আসর, কুইজ শো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আজান ইত্যাদি প্রায় সব চ্যানেলেই প্রচারিত হয়। দেশের খ্যাতিমান উপস্থাপক, আলেম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, হাফিজ, ক্বারী, শিল্পী ও আবৃত্তিকারগণ এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এসব অনুষ্ঠানের সেট নির্মাণ বা এনিমেশনে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যাতে একদিকে যেমন এসব প্রোগ্রাম চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠে তেমনি দর্শকদের মানসে ইসলামের পবিত্র ছোঁয়া অনুভূত হয়। বিদেশী টিভি চ্যানেল আল-জাজিরায় ব্যবহৃত লগো 'আল-জাজিরা' তুঘরা লিপির একটি ক্যালিগ্রাফি।

চিত্র-১১৫:আল-জাযিরাহ'র লগো

২.৬.১১ প্রিন্ট মিডিয়ায়

বাংলাদেশের প্রিন্ট মিডিয়াও একেবারে কম বিস্তৃত নয়। জাতীয়, স্থানীয়, বিষয় ভিত্তিক, সংস্থা ভিত্তিক, সংগঠন ভিত্তিক, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, দ্বি-মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক বিভিন্ন ভাষায় মোট প্রায় পাঁচ শতাধিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও জার্নাল প্রকাশিত হয়। এসব প্রকাশনার মধ্যে ধর্মীয় তথা ইসলামী ম্যাগাজিন ও দৈনিক পত্রিকাগুলোর ধর্মীয় পাতায় ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করতে দেখা যায়। দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ, মাসিক তানযীমুল উম্মাহ, মাসিক মদীনা, মাসিক জিজ্ঞাসা-এর প্রায় প্রতিটি লেখার সাথে, সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য সংস্কৃতি' স্মারকে প্রতিটি লেখার সাথে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

গত শতাব্দীর শেষ দশক হতে প্রিন্ট মিডিয়ায় কারুকাজ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় প্রিন্টিং জগতে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার অনেক বেশি বেড়ে গেছে। শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী আমিনুল ইসলাম, শিল্পী হা.মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী শাহ ইফতিখার তারিক ও শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফসহ অনেকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্যালিগ্রাফির প্রচার, প্রসার ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

২.৬.১২ ক্যালেণ্ডারে

এক সময় মানুষ বা জীব-জানোয়ারের ছবি দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডার প্রকাশ হত। বর্তমানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি সম্বলিত, বিভিন্ন ইতিহাস-ঐতিহ্যের তথ্য ও ছবি সম্বলিত ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়। তবে বিগত কয়েক দশক থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষত ইসলামী চেতনার লালন করে এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠনগুলোর ক্যালেণ্ডারে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বিআরবি ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিজ লি., মানামা গ্রুপ, হজ্জ ফাইন্যান্স কোম্পানী লি., ইবনে সিনা, ইসলামী ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান ও প্রডাকশন সেন্টারগুলো ওয়াল ক্যালেন্ডার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার ও ভিউকার্ড ইত্যাদিতে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পথিকৃতের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকায় রয়েছে। ক্রমে ক্রমে এর ব্যবহার বেড়ে অনেক প্রতিষ্ঠানই এর চর্চা ও লালন করে আসছে। যা প্রকাশনা শিল্পে এক নব সংযোজন বলেই মনে হয়।

২.৬.১৩ শুভেচ্ছা কার্ডে

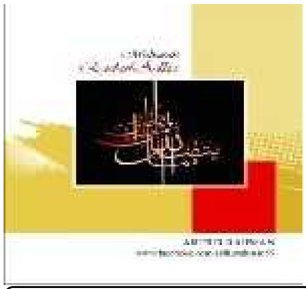

চিত্র-১১৬: ঈদকার্ডে আয়াতের ক্যালিগ্রাফি

ঈদ, বাংলা ও ইংরেজি নববর্ষ, কিংবা সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংগঠন কর্তৃক শুভেচ্ছা কার্ড প্রকাশ করে। যার মাধ্যমে ঐসব প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা শুভানুধ্যায়ীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। ইদানিং এসব শুভেচ্ছা উপকরণেও ক্যালিগ্রাফির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যাতে একদিকে যেমন পরস্পরের আবেগ, অনুভূতি ও ভালবাসা বিনিময় হয়। অন্যদিকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চার বিস্তৃতি লাভ করে।

২.৬.১৪ ওয়ালমেটে

চিত্র-১১৭: ওয়ালমেটে আয়াতুল কুরসীর ক্যালিগ্রাফি

সুদৃশ্য ওয়ালমেট, শো-পিছ কিংবা হস্তলিখিত লোকজ ধারার শিল্প উপাদান দ্বারা নিজের আবাসস্থলকে সজ্জিতকরণ বাংলাদেশের মানুষের চিরায়ত ঐতিহ্য। কালের বিবর্তনে প্রতিনিয়ত তা আরও আধুনিক রূপ লাভ করেছে। অনেকেই ক্যালিগ্রাফিকে উপজীব্য করে কাপড়ের উপর সুতা দিয়ে নিজ হাতে সেলাই করে লোকজ ধারার ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। বিশেষ করে ডিজিটালাইজেশনের এ যুগে ঘর সাজানোর জন্য কুরআন ও হদীসের বাণী সম্বলিত নান্দনিক ক্যালিগ্রাফির ওয়ালমেট প্রায় প্রতিটা ঘরেই দেখা যায়। যা ঐ ঘরে বসবাসকারী ও অভ্যাগত অতিথির মনে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির নান্দনিক পরশ বুলিয়ে দেয় এবং পবিত্র অনুভূতির সঞ্চার করে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

২.৭ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিষয়ভিত্তিক অনুশীলন

২.৭.১ আল-কুরআনের আয়াত

চিত্র-১১৮: হাতে লেখা সূরা ফাতিহা

আল-কুরআন মহান আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। যা ইসলামী শরী'আতের প্রধানতম উৎস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে কেন্দ্র করেই মূলত ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সূচনা। এর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনেই পাণ্ডুলিপি ও ক্যালিগ্রাফির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাসূল (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীন একে উৎসাহিত করেন। ফলে তৎকালীন লিপিকারগণ এ কাজকে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করতেন। তাই ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সিংহভাগই আল-কুরআনের আয়াতকে কেন্দ্র করে। আল-কুরআনের আয়াত নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা বিশ্বের প্রায় সব দেশেই হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। সমকালীন বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা বলতে যা বুঝায় তার সিংহভাগই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াতকে কেন্দ্র করেই।

২.৭.২ আল-হাদীসের বাণী

চিত্র-১১৯: রাসূল (সা.) বিঘোষিত হাদীসের ক্যালিগ্রাফি

রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেই হাদীস বলে। যা ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয়তম

Dhaka University Institutional Repository

উৎস। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াতের পাশাপাশি হাদীসের কথামালা দিয়ে প্রায় প্রত্যেক ক্যালিগ্রাফার ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করে থাকেন। বাস্তবিক জীবনে প্রয়োজনীয় বাণী বা দু'আ সম্বলিত ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। বিশেষ করে বিভিন্ন কাজের জন্য হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ এবং উপদেশমূলক ছোট ছোট বাক্য সম্বলিত আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সচরাচরই দৃশ্যমান হয়। হাদীসের এসব বক্তব্য ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে উপস্থাপনের কারণে মানুষের মাঝে হাদীসের প্রতি আরো আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং একে ধারণ করার ইচ্ছা তৈরি হয়।

২.৭.৩ সীরাতুন্নবী (সা.)

মুসলিম স্থাপত্য, মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ ইত্যাদির দেয়ালে লিপিকলায় মহানবী (সা.) এর বাণী উপস্থাপন লক্ষ্যণীয়। রাসূল (সা.) এর পুরো জীবনকেই সীরাতুন্নবী (সা.) বলে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ নিয়ে বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা ও চর্চা করে থাকেন। তাঁর মহিমা, বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি ও প্রশংসায় ক্যালিগ্রাফারগণ বিভিন্ন ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেছেন। বাংলাদেশে আরবী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সীরাতুন্নবীর উপর ক্যালিগ্রাফি চর্চা দেখা যায়। এসব ক্যালিগ্রাফি মানুষকে রাসূলপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে।

চিত্র-১২০: নান্দনিক ক্যালিগ্রাফিতে রাসূল (সা.) কে উপস্থাপন

কুরআনের আয়াত মুহাম্মদ (সা.) এর নাম, তাঁর বাণী, তাঁর উপর দরুদ ও সালামের পঙ্ক্তি ইত্যাদি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও গুরুত্বের সাথে বিশ্বব্যাপী চর্চা চলছে। ক্যালিগ্রাফিতে মহানবীর বাণী ও সীরাত চর্চার কারণ হিসেবে ভাষা ও শিল্পবিজ্ঞানীরা মন্তব্য করেছেন, মুসলমানদের জন্য প্রাণীর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ[১৬১] বিধায় তারা সৃজনশীল প্রতিভা

[১৬১] The prohibition of images for veneration or worship led the Muslims to turn their mind to utilitarian and decorative objects such as textiles, ceramics, glass, wood works, metal weares, carpets, calligraphy, miniature, paintings and above all to architectural monuments of all purpose

Dhaka University Institutional Repository

লিখনের মাধ্যমে মহানবী (সা.)কে উপস্থাপন করেন। তাছাড়া ইসলামের মর্মবাণী অনুধাবন এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে লিপিবদ্ধ করা ধর্মীয় কর্তব্য বলে বিশ্বাসও তার অন্যতম একটি কারণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক্যালিগ্রাফিতে সীরাতচর্চা সুকুমার বৃত্তি বিকাশের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুষঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ক্যালিগ্রাফি চর্চা মহানবীর (সা.) আমলেই প্রাথমিক পর্যায় বলে গণ্য করা হয়। মহানবীর জীবদ্দশায় লিখিত হাদীস, সীরাত সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য লিপিকলায় রূপ পায়। মহানবীর বাণী, তাঁর প্রতি উৎসর্গীকৃত কবিতা, দরুদ, ইত্যাদি উমাইয়া-আব্বাসী আমলে খলীফাদের দরবারে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। পর্যায়ক্রমে মুসলিম বিশ্বে ক্যালিগ্রাফিতে সীরাতচর্চার বিকাশ ইরানসহ মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপক প্রসার লাভ করে।[১৬২]

সীরাতচর্চায় ক্যালিগ্রাফিতে মহানবী (সা.)-এর নাম ও পবিত্র কুরআনে মুহাম্মদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো ব্যবহার হয়। মুর্তজা বশীর 'মুহাম্মদকে' আরবীতে এবস্ট্রাক্ট পেইন্টিংয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ, মহানবীর (সা.) আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ, বালাগাল উলাবি........ওয়া আলিহী ইত্যাদি বাণীগুলো শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফিতে যেন এক অনবদ্য কাব্যরূপ। নূর মুহাম্মদ মাসুমও বালাগাল উলাবি........ওয়া আলিহীর কম্পিউটার গ্রাফিক্সে মধুর রঙ ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় সীরাতচর্চায় ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম নির্মাণে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর ব্যবহার হয়ে বেড়েছে এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তা'লিক লিপিতে আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে তীর্যকভাবে লিখিত 'বালাগাল 'উলা বিকামালিহি' দেখে ঝুলন্ত মনে হয়। 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' নাসতা'লিক লিখনে তরবারির ন্যায় বাঁকা, যা অনেকটা অর্ধচন্দ্র, ছন্দায়িত গতি ও স্বরচিহ্নের ব্যবহারযুক্ত। এতে আবদুর রহমান আল-খাওয়ারেজমী, কায়েম সাদী, গিয়াস উদ্দিন ইস্পাহানী ও ইমাদ উদ্দিন আল-হোসাইনি প্রমুখ সীরাত চর্চায় অংশ নেন। সপ্তদশ শতকে

---

and verities. (Islamic Art in Bangladesh, *Catalogue of the Special Exhibition of Islamic Art in Bangladesh* (Dacca Museum:1978, p.12)

[১৬২] মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, 'ক্যালিগ্রাফিতে সীরাতচর্চা', *শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফার দরবেশ আব্দুল মজিদ তালিকানী রাসূলপ্রেমের চতুষ্টয় পঙ্ক্তি বিভিন্ন শৈলীতে উপস্থাপন করেন। আল-কুরআনের আয়াত, কালিমা, মুহাম্মদী দরুদ এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন পুরো লিপিটা একত্রে একটি প্রাণীর রূপধারণ করে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশে যারা ক্যালিগ্রাফিতে সীরাত চর্চা করছেন তারা হলেন- শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী, শিল্পী সবিহ-উল আলম, শিল্পী মীর রেজাউল করিম, শিল্পী এ.এইচ.এম বশির উল্লাহ, শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী কামরুল হাসান কালন, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হান্নান, শিল্পী খন্দকার মনিরুজ্জামান, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ, শিল্পী আবুদ্ দারদা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, শিল্পী আতা ইমরান, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ, শিল্পী ইসহাক আহমেদ, শিল্পী মাসুম আখতার মিলি, শিল্পী আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ অন্যতম।

২.৭.৫ কবিতার চরণ

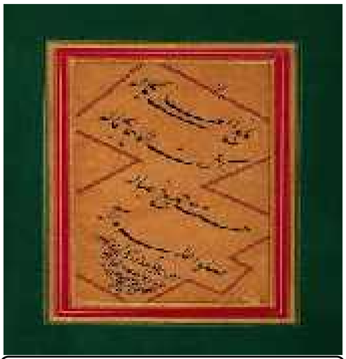

চিত্র-১২১: ক্যালিগ্রাফিতে কবিতার পঙক্তিমালা

প্রাক ইসলামী যুগে ওকাজ মেলার সময় মক্কার পবিত্র কা'বা ঘরকে সুন্দর হস্তাক্ষরে কবিতার পঙ্ক্তি দিয়ে ক্যালিগ্রাফি করে সাজানো হত। কবিগণ কবিতার ছোট্ট ছোট্ট পঙ্ক্তিতে তাদের হৃদয়ের পরিশীলিত ভাবকে উপস্থাপন করে থাকেন। আর সেই উপস্থাপনা ক্যালিগ্রাফি কর্মে হলে তা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। কবিতার পঙ্ক্তিতে থাকে শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান সহ নানা চিন্তার প্রতিফলন।

Dhaka University Institutional Repository

আর এসব চরণমালা যখন ক্যালিগ্রাফিতে প্রকাশ পায় তখন তা শিল্পের ষোলকলায় পূর্ণ হয়। সমসাময়িক কালের ক্যালিগ্রাফারদের মাঝে কবিতার চরণ নিয়ে ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক প্রচলন দেখা না গেলেও অনেকেই তাদের ক্যালিগ্রাফিতে বিখ্যাত কবিতার চরণমালাকে স্থান দেয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

২.৮ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীভিত্তিক অনুশীলন

২.৮.১ কুফী লিপি

কুফী লিপি নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন- শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী আবু তাহের, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার ও শিল্পী মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ। মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ শিল্পী আব্দুস সাত্তার অ, আ, ক, খ বর্ণগুলো আরবী কুফী রীতিতে সৃষ্ট ক্যালিগ্রাফির সাথে সম্পৃক্ত করেন। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত সপ্তম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে শিল্পী আবু তাহের যে লিপিশিল্প প্রদর্শন করেন তাতে কুফী রীতিতে অঙ্কিত 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' শব্দটি স্থান পায়। তেলরঙের এ শিল্পকর্মটিতে সৃজনশীলতা ও নতুনত্ব দেখা যায়।[১৬৩]

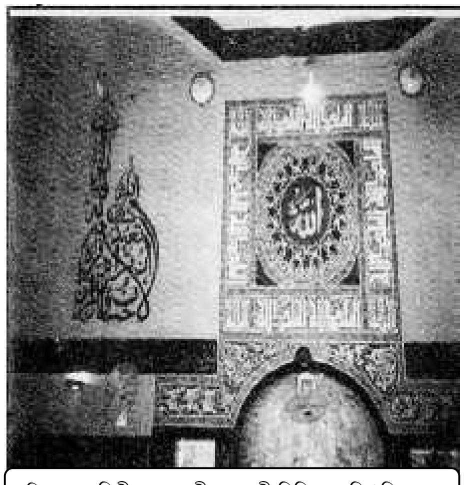

চিত্র-১২২: শিল্পী আব্দুর রহীমের কুফী লিপির ক্যালিগ্রাফি

তৃতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল কুফী লিপির সাহায্যে ঋজু ও বিসর্পিল রেখার বিন্যাস ঘটিয়ে সুন্দর লিপিকর্ম গড়ে তুলতে সক্ষম হন। শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম ধর্মীয় ইমারতে বিশেষত মসজিদের গাত্রে কুফী শৈলীতে ক্যালিগ্রাফির অলঙ্করণ করে খ্যাতি অর্জন

[১৬৩] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি চট্টগ্রামের সমুদ্র বন্দরের ৫ নং জেটি গেটের কাছে প্রাচীন একটি মসজিদের সংস্কারের পর ক্যালিগ্রাফি দিয়ে অলঙ্কৃত করেন। মসজিদের দরজার উভয় পার্শ্বে বৃত্তাকার চারটি ক্যালিগ্রাফি করেছেন। যার প্রত্যেকটির মাঝে দশবার 'মুহাম্মাদ' ও মাঝখানে দু'বার 'আল্লাহ' শব্দটি কুফী লিপির নান্দনিক ধারায় খোদাই করে লেখা হয়েছে।[১৬৪] শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ কুফী রীতি ব্যবহার করে 'আল্লাহ', 'মুহাম্মাদ', 'সূরা ফাতিহা', 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ছাড়াও নক্‌শী কাঁথার পটভূমিতে ক্যালিগ্রাফি করে সুনাম অর্জন করেন। যাতে মেহেদী পাতার একক দীপ্ততায় তাঁর চিত্র গভীর ব্যাঞ্জনা বহন করে।

২.৮.২ সুলুস লিপি

চিত্র-১২৩: শিল্পী আমিনের সুলুস লিপির ক্যালিগ্রাফি

সুলুস লিপি নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন- শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন ও শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার প্রমুখ। শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল গোয়াস, এক্রিলিক, পেইন্টিং ও তেল রঙে সুলুস লিপিতে বেশ কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। তাঁর মতে, লতা-পাতার সাথে ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় আছে। তাই তিনি ক্যালিগ্রাফির আশে-পাশে তাঁর চিত্রকে লতা-পাতার মতো ডেকোরেটিভ করে তুলেন। ফুল ও পত্র-পল্লবের প্রাসঙ্গিকতায় আলো-আঁধারির সরব উপস্থিতি তাঁর চিত্রকে বিশদ ব্যাঞ্জনায় উপস্থাপন করেছে। তিনি আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ও আল্লাহর মহত্ত্ব উপলদ্ধি করে তা ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে প্রকাশ করেন।[১৬৫] শিল্পী আরিফুর রহমান কর্তৃক 'রাব্বি যিদনী ইলমা' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি কাগজের উপর এক্রিলিক মাধ্যমে সুলুস রীতিতে নির্মিত বেশ চমৎকার উপস্থাপন। সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত পঞ্চম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে

---

[১৬৪] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫-৭৬।
[১৬৫] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনের অপূর্ব ট্রাডিশনাল ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। তিনি গাছের শিকড়, গাছপালা ও লতা-পাতার পটভূমিতে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কে সুলুস রীতিতে প্রকাশ করেছেন যা ইল্যুশনের সৃষ্টি করেছে।[১৬৬] শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম চট্টগ্রামের সমুদ্র বন্দরের ৫ নং জেটি গেটের কাছে প্রাচীন একটি মসজিদের মিহরাবের উপরাংশে চতুর্ভূজাকৃতি ক্যালিগ্রাফির মাঝে সুলুস লিপিতে ‘আল্লাহ জাল্লা জালালুহু’ অঙ্কন করেছেন। চারপাশের দেয়ালে কালো মার্বেল পাথরে সোনালি রঙের মেটালিক হরফে সুলুস লিপির ‘আর-রাহমান’ এবং দক্ষিণ পাশের দেয়ালে সাদা মার্বেল পাথরে কালো কালিতে ‘ইয়া আইয়ু হাল্লাযিনা আমানু ইযা নুদিয়া লিস সালাতি....’, ‘আল্লাহু আকবার’ ও ‘ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকার’ অর্থসহ সুলুস লিপিতে লেখা হয়েছে।

২.৮.৩ নাসখী লিপি

চিত্র-১২৪: শিল্পী আরিফুর রহমানের নাসখী লিপির

নাসখী লিপি নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন- শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী মাসুম বিল্লাহ ও শিল্পী আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ। শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল আরবী হরফের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে কালিমা ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ’ কে রঙ-তুলির মাধ্যমে নাসখী রীতিতে নির্মাণ করেছেন। তাঁর সৃজনশীলতা, তাঁর শিল্পকর্মে বিধৃত হয়েছে।[৬৩] শিল্পী আরিফুর রহমানের নির্মিত ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি বিস্ময়কর শিল্পকর্ম। জ্যামিতিধর্মী নাসখী রীতিতে লেখা কাজটি যেন তাঁর দীপ্তিময় প্রয়াস।[১৬৭] শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম ঢাকার

---

[১৬৬] *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩।

[১৬৭] হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, ‘শ্রেষ্ঠদের শীর্ষশিল্প’, *দৈনিক সংগ্রাম*, ২০ জুন-২০০৪, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

বারিধারা ও ডিওএইচএস মসজিদের দরজার উপরে নাসখী লিপিতে মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার দু‘আ খোদাই করে লিখেছেন। শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ নাসখী রীতি ব্যবহার করে ‘আল্লাহ’, ‘মুহাম্মাদ’, ‘সুরা ফাতিহা’, ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ ছাড়াও নক্‌শী কাঁথার পটভূমিতে ক্যালিগ্রাফি করে সুনাম অর্জন করেন। শিল্পী এইচ. এম আব্দুল্লাহ আল-মামুন নাসখী লিপিতে অর্ধশতাধিক ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করেছেন

২.৮.৪ মুহাক্কাক লিপি

মুহাক্কাক লিপি নিয়ে শিল্পী ফরেজ আলী ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। তিনি মিক্সড মাধ্যমে মুহাক্কাক লিপিতে মোট ১৫টি শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। যার প্রত্যেকটি শিল্পকর্মই মাধুর্যমণ্ডিত ও প্রতিভাদীপ্ত। ক্যানভাসে তেলরঙে তিনি তেমনি নির্মাণ করেছেন আরবী হরফের একটি অনুপম ক্যালিগ্রাফি। যেখানে জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি শিল্পকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় মানসম্মত শিল্পকর্মে সিদ্ধহস্ত। তিনি তাঁর শিল্পকর্মে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন।[১৬৮]

চিত্র-১২৫: শিল্পী ফরেজ আলীর মুহাক্কাক লিপির ক্যালিগ্রাফি

২.৮.৫ রায়হানী লিপি

চিত্র-১২৬:ফরেজ আলীর রায়হানী লিপির ক্যালিগ্রাফি

রায়হানী লিপি নিয়ে শিল্পী ফরেজ আলী ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। তিনি মিক্সড মাধ্যমে রায়হানী লিপিতে ১৩টি শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত অষ্টম

...০৫, প্রাগুক্ত, পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শিল্পকর্মগুলো বেশ চমক সৃষ্টি করে। তিনি চমৎকারভাবে তাঁর পেইন্টিং-এ ক্যালিগ্রাফির জিওমেট্রিক ফর্মের সমন্বয় করেছেন। তাঁর শিল্পকর্মে নৈসর্গিক আবহ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রঙের ব্যবহার খুবই চমৎকার। রেখালিপির পটভূমিতে দৃশ্যগুণের রূপনির্ভর বা বর্ণস্পর্শ বৈচিত্র নির্ভর সমারোহ তাঁর কর্মে গুরুত্ব লাভ করেছে। বর্ণাঢ্য ক্যানভাসে অপরূপ ভঙ্গিমায় অঙ্কিত 'ইকরা বিসমি রাব্বি কাল্লাযি খালাক' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফি এক অন্যরকম দ্যোতনা সৃষ্টি করে।[১৬৯]

২.৮.৬ রুক'আহ লিপি

চিত্র-১২৭: শিল্পী আবদুর রহীমের রুক'আহ লিপির ক্যালিগ্রাফি

রুক'আহ লিপি নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন- শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম। তিনি বর্ণাঢ্য ক্যানভাসে অত্যন্ত সুচারুরূপে রুক'আহ লিপিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' শীর্ষক যে ক্যালিগ্রাফিটি নির্মাণ করেছেন তা শৈল্পিক মানে উন্নীত। তাছাড়া বেশ কয়েকজন নবীন ক্যালিগ্রাফারের মাঝে এ লিপিতে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে।

২.৮.৭ দিওয়ানী লিপি

দিওয়ানী লিপি নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন- শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মাহমুদ মোস্তফা আল-মারুফ ও শিল্পী আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ। শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল কর্তৃক গোয়াস, এক্রিলিক, পেইন্টিং ও তেল রঙে দিওয়ানী ধারায় নির্মিত শিল্পকর্মে তাঁর হলুদের প্রয়োগ অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও নান্দনিক। তাঁর ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে ড. আব্দুস সাত্তার বলেন- 'তাঁর ক্যালিগ্রাফির মধ্যে

চিত্র-১২৮: আমিনুল ইসলামের দিওয়ানী লিপির ক্যালিগ্রাফি

---

[১৬৯] *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃ.

Institutional Repository

বর্ণবিন্যাস এমনভাবে করা হয়েছে যে, রঙ ও হরফ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। ফলে তাঁর চিত্রে একটি ভিন্ন স্বভাব পরিলক্ষিত হয়।'[১৭০] শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারীর 'স্বাগতম' শিরোনামে মিশ্র মাধ্যমে দিওয়ানী রীতিতে ছুরির মাধ্যমে 'আহলান-সাহলান' বেশ সুন্দর এঁকেছেন। শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিনও এক্রিলিক, তেলরং ও মিশ্রমাধ্যমে দিওয়ানী লিপিতে কাজ করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তিনি ক্যালিগ্রাফির আশে-পাশে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ উপস্থাপনাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শিল্পী আব্দুল্লাহ আল-মামুনসহ বেশ কয়েকজন নবীন শিল্পীও দিওয়ানী লিপি নিয়ে কাজ করছেন।

২.৮.৮ তুঘরা লিপি

চিত্র-১২৯: সাইফুল ইসলাম এর তুঘরা ক্যালিগ্রাফি

বাংলাদেশে তুঘরা রীতির চর্চা বিদ্যমান রয়েছে। এ লিপিতে বিভিন্ন সময় ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেছেন- শিল্পী মুর্তজা বশীর, শিল্পী সাইফুল ইসলাম, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম ও শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার প্রমুখ। শিল্পী সাইফুল ইসলাম তুঘরা লিপিতে 'আল্লাহু আকবার' শীর্ষক একটি ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। যা নবম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে স্থান পায়। এ শিল্পকর্মে শীর্ষ শিল্পের অনেক রেখা-ভাবনাই উন্মোচন করেন। রেখা-নির্ভর বৃত্তান্তে কালির প্রবাহ কতটা উচ্চতায় বা দ্রুততর হয়ে উঠে তিনি সেসব গতি বিন্যাস করেন। একটি ক্যালিগ্রাফিতে কা'বা শরীফের অটল আবাহন এমন মুগ্ধতায় আঁকেন যেন সকলেই সেই কালো রঙ ছুঁয়ে এসেছে। এভাবে তাঁর ক্যালিগ্রাফির কর্মধারা দেশে ব্যাপক সমাদরে গৃহীত হয়েছে।[১৭১] শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী তুঘরা রীতিতে কুরআনের আয়াতগুলো শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন।

---

[১৭০] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৭।

[১৭১] *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অধিকাংশ ক্যালিগ্রাফির পটভূমিতে লতা-পাতা ও ফুলের নক্‌শা দৃশ্যমান। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্যালিগ্রাফির কথা ভাবতে গেলে 'তুঘরা' লিপির সাথে অনেকের পরিচয় আছে বলেই ভাবতে হয়। কারণ বাংলাদেশে মসজিদ ও অন্যান্য স্থান থেকে প্রাপ্ত যে সকল ক্যালিগ্রাফি শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই তুঘরা লিপিতে সম্পন্ন।

২.৮.৯ তা'লিক লিপি

চিত্র-১৩০: শিল্পী নাসির উদ্দিনের তা'লিক লিপির ক্যালিগ্রাফি

তা'লিক লিপি নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন- শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ ও শিল্পী মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ। শিল্পী আরিফুর রহমানের ট্রাডিশনাল শিল্পকর্মের মধ্যে প্রাচীন যুগের তা'লিক লিপির বেশ প্রভাব দেখা যায়। ১৯৯৯ সালে সপ্তম 'ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার'-এ প্রদর্শিত তাঁর ক্যালিগ্রাফির কালার কম্পোজিশন সম্পর্কে ইরানের প্রেসিডেন্ট ভুঁয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরবী-ফারসী ক্যালিগ্রাফির বিভিন্ন বইপত্র ও দেশ-বিদেশের ক্যালিগ্রাফির সাথে নিবিড় হতে শুরু করেন। এ রীতিতে শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান নির্মিত 'খালাক' ও হুরুফে মুকাত্তা'আত নিয়ে তাঁর নির্মিত কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি তা'লিক লিপির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিশেষত ১৫x৮ মাপের সিরামিকে নির্মিত 'মুদহাম্মাতান' শীর্ষক চার রঙের তৈলচিত্র সত্যিই অসাধারণ একটি শিল্পকর্ম।

২.৮.১০ নাসতা'লিক লিপি

নাসতা'লিক লিপি নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা

sity Institutional Repository

করেন- শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ. বারী, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম ও শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ প্রমুখ। ইসলামী লিপিকলার প্রতি শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল-এর দুর্বলতা ও ভালবাসা তাকে ধাবিত করেছে নিরন্তর ক্যালিগ্রাফি চর্চায়। তিনি এ লিপির সাহায্যে ঋজু ও বিসর্পিল রেখার বিন্যাস ঘটিয়ে সুন্দর লিপিকর্ম গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কালিমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' কে তিনি রং-তুলির মাধ্যমে ত্রি-মাত্রিক ধারায় ট্রাডিশনাল নাসতা'লিক ক্যালিগ্রাফি করেন, যা এক ঐন্দ্রজালিক আবেশের সৃষ্টি করে। ইসলামী শিল্পকলার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ১৯৭৮ সালে ৩ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল ঢাকা জাতীয় জাদুঘরে আয়োজন করা হয় বিশেষ প্রদর্শনীর। এতে খাজা শামসুদ্দিন মাহমুদ ও মুহাম্মদ ইউসুফ নাসতা'লিক লিপিতে কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি কর্ম প্রদর্শন করেন।[১৭২]

২.৮.১১ শিকাসতা লিপি

শিকাসতা লিপি নিয়ে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন- শিল্পী আরিফুর রহমান ও শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী প্রমুখ। শিল্পী আরিফুর রহমান ট্রাডিশনাল শিল্পকর্মের মধ্যে প্রাচীন যুগের শিকাসতা লিপির প্রভাব দেখা যায়। নতুন প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিশীল ক্যালিগ্রাফার রফিকুল্লাহ গাজালী শিকাসতা রীতিতে সিদ্ধহস্ত। তিনি তাঁর শব্দগুলোকে ভেঙ্গে নতুন ফর্ম সৃষ্টি করে এক ঐন্দ্রজালিক কম্পোজিশন সৃষ্টি করেন।[১৭৩]

২.৮.১২ ঘুবার লিপি

চিত্র-১৩২: ফেরদৌসির ঘুবার লিপির ক্যালিগ্রাফি

ঘুবার লিপি নিয়ে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন- শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ। তিনি ঘুবার রীতি ব্যবহার করে 'আল্লাহ', 'মুহাম্মাদ', 'সূরা ফাতিহা', 'বিসমিল্লাহির রাহমানির

[১৭২] *Catalogue of the Special Exhibition of Islamic Art in Bangladesh*, Ibid, p.17.
[১৭৩] নাসির আহমেদ খান, 'ক্যালিগ্রাফি চর্চা ও বিকাশ', পৃ.২।

Dhaka University Institutional Repository

রাহীম’ ছাড়াও নক্শী কাঁথার পটভূমিতে ক্যালিগ্রাফি করে সুনাম অর্জন করেন। যাতে মেহেদী পাতার একক দীপ্ততায় তাঁর চিত্র গভীর ব্যাঞ্জনা বহন করে।

২.৮.১৩ মাগরিবী লিপি

মাগরিবী লিপি নিয়ে বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম। তিনি এ লিপিতে বেশ কিছু মানসম্পপন্ন ক্যালিগ্রাফি করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণির ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ৫০৮ নং কোর্সে আরবী ক্যালিগ্রাফি-২ মাগরিবী লিপির প্রধান প্রধান ধারাসমূহ বিষয়টি সিলেবাসভুক্ত। যা এ লিপি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে।[১৭৪] ১৯৯৭ সালের ২৪ জুলাই দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায় ‘ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে মাগরিবী লিপি’ শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়।

২.৮.১৪ মুসান্না বা আয়নালী লিপি

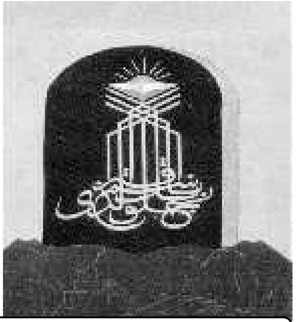

চিত্র-১৩৩: রফিকুল্লাহ’র মুসান্না ক্যালিগ্রাফি

বাংলাদেশের শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী মিরর স্টাইলে অর্থাৎ বিপরীত রীতির মাধ্যমে ডান ও বাম দিক থেকে অক্ষরগুলো সাজিয়ে ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেছেন। তাঁর ছবিতে নিবিড় ধ্যানের বুনট রয়েছে এবং সমান্তরাল হতে উর্ধ্বে উঠা লিপি চিত্রণের ছন্দোবদ্ধ গতি রয়েছে। তিনি তাঁর শিল্পের এ হরফ বিন্যাসের পিছনের অংশ অর্থাৎ জমিনের হালকা লালচে ও নীলচে রঙ ব্যবহার করে পুরো ছবিটা আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

২.৮.১৫ উন্মুক্ত ধারা

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলীগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফারগণ উপরিউক্ত শৈলীগুলো ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেছেন। বাকী বেশ কয়েকটি শৈলী তথা তাওকী‘, বিহারী, তাউস, সাক্কি, তাজ,

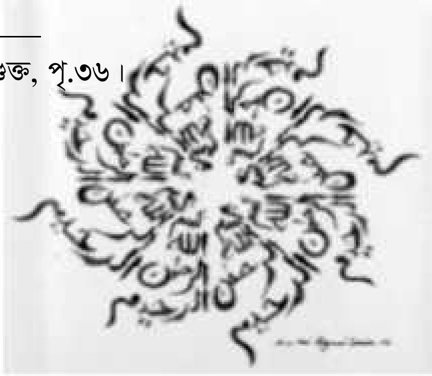

[১৭৪] *সিলেবাস:* আরবী বিভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬।

ersity Institutional Repository

জুলফ-ই-আরুস, হুর, সুম্বুল রীতিতে বাংলাদেশের কোন ক্যালিগ্রাফার কর্তৃক এখনও পর্যন্ত কোন শিল্পকর্ম সম্পন্ন করতে দেখা যায়নি। বর্তমান অনেক ক্যালিগ্রাফার এসব ট্রাডিশনাল ধারা অনুসরণ না করে উন্মুক্তভাবে ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করে আসছেন। এসব ক্যালিগ্রাফি ট্রাডিশনাল ফন্টের অনুসরণে না হলেও শিল্প মানে উত্তীর্ণ। শিল্পী সবিহ-উল আলমের ক্যালিগ্রাফি 'আল্লাহ' শিল্পকর্মটি একটি নতুন ধারার কাজ। যা স্কেচ চিত্রকলায় ত্রি-মাত্রিক ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। দৃষ্টি বিভ্রমের মাধ্যমে তিনি ত্রি-মাত্রিক (Three dimensional) ক্যালিগ্রাফি চিত্র নির্মাণ করে এক নতুন ধারার প্রচলন করেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফিতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দ্বিবিধ ভূমিকায় বিভাজিত হয়ে তৈরি হয়েছে রহস্যের প্রাবল্য।[১৭৫] শিল্পী মীর রেজাউল করিমের 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' শীর্ষক শিল্পকর্ম গোলায়িত বৃত্ত ঘুর্ণায়মান ঘুর্ণির মত মনে হয়। তিনি একে অপূর্ব নন্দনতাত্ত্বিক মোহজালে আবদ্ধ করেছেন। শিল্পী এ এইচ এম বশির উল্লাহ'র 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' শীর্ষক ক্যালিগ্রাফিতে বেশ গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ অবয়ব নির্মাণ করে সাধারণ লিখন দিয়েই তিনি সমান্তরাল ব্যাঞ্জনায় এবং উল্লম্ব বিন্যাসে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। এভাবে আরো অনেক শিল্পীই উন্মুক্ত ধারায় ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণ করে খ্যাতি লাভ করেছেন।

[১৭৫] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদ

২.৯ বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অনুশীলন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সময় থেকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা চলে আসছে। যেমন- বাংলা, ইংরেজি, আরবী, ফারসী, চীনা ইত্যাদি ভাষার ক্যালিগ্রাফি। তবে আরবী ও ফারসী ভাষায় যতটা সাবলীলভাবে এর চর্চা করা যায়, অন্যভাষায় তা পারা যায় না। বিশেষত কুরআন লিখনে আরবী ভাষা ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। আরবী পাণ্ডুলিপিতে ১৯২৮ সালের আগে প্রায় একহাজার বছর তুর্কী অক্ষর প্রচলিত ছিল। যার মধ্যে এক ধরনের নান্দনিকতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া আরবী হরফগুলো নানারকম ফর্মে পরিবর্তন করে উপস্থাপন করা হয়। তুর্কী অটোমান সাম্রাজ্যের আমলে বিভিন্ন আঙ্গিকে এ আরবী হরফগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়। প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে ল্যাটিন হরফের পরেই আরবী হরফের সবচেয়ে বেশি লেখা হয়ে থাকে। মুসলিম খলীফাদের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে আনাতোলিয়া ও সিরিয়া থেকে গ্রিক হরফ উত্তর আফ্রিকা থেকে ল্যাটিন হরফ এবং বসনিয়া থেকে সেরেলিক হরফের ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে আরবী হরফ নিজের প্রভাব বিস্তার করে। ফলে আজ ঐসব দেশের ভাষাগুলো লিখতে আরবী হরফ ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব কারণে বর্তমানে সেমিটিক গোষ্ঠীর ভাষাগুলো ছাড়াও ফার্সী, উর্দূ,

Dhaka University Institutional Repository

মালয়, সোমালি, সুদানি, পশতু, মালাগাছি প্রভৃতি বহু অসেমিটিক ভাষা আরবী হরফে লেখা হয়।[১৭৬]

২.৯.১ আরবী ভাষার ক্যালিগ্রাফি

চিত্র-১৩৫: আরবী ভাষার লিখিত সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফি

ভাষা হিসেবে আরবী বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাগুলোর অন্যতম এবং আধুনিক বিশ্বেও এ ভাষার আবেদন সার্বজনীন। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৫০ কোটি লোকের ভাষা আরবী। প্রাক ইসলামী যুগে আরবী সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল গড়ে উঠলেও ইসলামের আবির্ভাবের পরই প্রকৃতপক্ষে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বব্যাপী পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করে। ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। তাই ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এ ভাষার উল্লেখযোগ্য বিস্তার ও বিকাশ সাধিত হয়। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের একটি বিস্তৃত এলাকার ব্যবহারিক ও রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করে।[১৭৭] ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ২৮তম অধিবেশনে আরবী ভাষাকে জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ

---

[১৭৬] *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮।

[১৭৭] ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, *আরবী সাহিত্য সমালোচনা* (ঢাকা: সুলতানা প্রকাশনী-১৯৮৯) পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১৭৮]

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির মূল উপজীব্য যেহেতু কুরআন, হাদীস তথা ইসলামী বিষয়ের উপরই নির্ভরশীল। আর এসবের ভাষাও হচ্ছে আরবী। সঙ্গত কারণেই বিশ্বের যেসব দেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা বিদ্যমান সেদেশের ভাষা আরবী না হলেও আরবী ভাষার ক্যালিগ্রাফি চর্চাই বেশিই হয়। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের চিত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের ভাষা বাংলা হলেও এদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফি চর্চাই বেশিই হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আয়োজিত প্রদর্শনীগুলোতে দেখা যায়- ক্যালিগ্রাফারদের সিংহভাগ শিল্পকর্মই আরবী ভাষার ক্যালিগ্রাফি।

২.৯.২ উর্দূ ভাষার ক্যালিগ্রাফি

চিত্র-১৩৬: নাসতা'লিক লিপিতে উর্দূ ভাষার ক্যালিগ্রাফি

উর্দূ ভাষা ইংরেজ আমলে ভারতে বিশেষত মধ্য-ভারতের দেশসমূহে ব্যবহৃত হত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান এ ভাষায় কথা বলে। যা হিন্দি ভাষা থেকে উদ্ভূত। ভারতের মুসলিম বিজয়কালে এর উৎপত্তি হয়। কাশ্মীর ও পাঞ্জাব থেকে শুরু করে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডের ভাষাসমূহে এ ভাষার বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত দু'টি ধারায় বিভক্ত। সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা, ইংরেজি ভাষাভিত্তিক শিক্ষার চর্চা বিদ্যমান। অবশ্য এতে সীমিত পরিসরে আরবী ভাষার উপস্থিতিও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি আরবী ভাষাভিত্তিক শিক্ষা প্রায় সমান সমান। ক্ষেত্র বিশেষে আরো বেশি। মাদরাসা

[১৭৮] মুশাহিদ দেওয়ান, 'আরবি জীবন্ত ভাষা', *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ১৮ ডিসেম্বর-২০১৫, পৃ.১০।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাব্যবস্থা আবার দু'টি ধারায় বিভক্ত। আলিয়া ও কওমী নিসাব। আলিয়া মাদরাসায় উর্দূ ভাষার উপস্থিতি অতি নগণ্য হলেও কওমী মাদরাসার পড়াশোনার মাধ্যম অনেকটা উর্দূ ভাষায়। আর তাই কওমী মাদরাসায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ উর্দূ চর্চা করে থাকেন। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে উর্দূ বিভাগ রয়েছে। যেখানে অনেক শিক্ষার্থী এ ভাষায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তিগত আগ্রহে উর্দূ ভাষার ক্যালিগ্রাফিও চর্চা করে থাকেন।

২.৯.৩ ফারসী ভাষার ক্যালিগ্রাফি

চিত্র-১৩৭: ফারসী ভাষার নাসতা'লিক ক্যালিগ্রাফি

ফারসী পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী একটি ভাষা। এটি পারস্য তথা-ইরান, আফগানিস্তান, কুর্দিস্তান, তাজিকিস্তান ও বেলুচিস্তান ইত্যাদি দেশ ও অঞ্চলের ৬০ মিলিয়নেরও অধিক জনগোষ্ঠীর ভাষা। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষা ইংরেজ শাসনাধীন ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয়-ইসলামী ভাষা ছিল। ইরান ও আফগানিস্তানে বর্তমানেও এটি রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় ভূষিত। আধুনিক ফারসী ভাষা বলতে কেবল ইসলামী যুগের পারস্য ভাষাকে বুঝানো হত। সাসানি যুগে (২২৪-৬৫১ খ্রি.) মধ্যযুগীয় ফারসী ভাষা ইসলামের জীবন বিধানের অভ্যুদয় পর্যন্ত ইরানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করা হত।[১৭৯] পারস্যের উপর ইসলামের প্রভাব এবং ভাষাগত ও ধর্মীয় কারণে আরবী ভাষা, বর্ণমালা ও লিখনশৈলী পারস্যে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। ফলে পারস্যবাসীরা ক্রমে পাহলভি বর্ণমালা ও লিখনরীতি বর্জনপূর্বক আরবী বর্ণমালার আদলে কয়েকটি বর্ণ বৃদ্ধি করে আরবী লিখনরীতির অনুকরণে একটি স্বতন্ত্র লিখনশৈলী উদ্ভাবন করে, যা 'ফারসী লিখনরীতি' নামে পরিচিত।

---

[১৭৯] মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম খান, *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকা: মজিদ পাবলিকেশন্স, ২০০৫), পৃ.৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী-ফারসী জাতীয় বর্ণমালার সুবিধাজনক আকার-প্রকরণের কারণে প্রাচীন পারস্য, মিসর ও আরব ভূখণ্ডে ক্যালিগ্রাফির চর্চার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। তবে ইসলামের গৌরবময় উত্থানের শুরু থেকে শিল্পকলার এ বিশেষ মাধ্যমটির অব্যাহত প্রসার ঘটতে থাকে।[১৮০] কয়েক শতাব্দীর মুসলিম শাসন, সাথে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ফারসীর প্রচলন উপমহাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চার দিগন্ত খুলে দেয়। সম্মানজনক ও জনপ্রিয় একটি শিল্প হিসেবে ক্যালিগ্রাফির পুরো বিকাশ হয় মুঘল আমলে। সেইসাথে ছড়িয়ে পড়ে আজকের বাংলাদেশের জনপদেও। ব্রিটিশ শাসনামলের গোড়ার দিকেও ঢাকায় ক্যালিগ্রাফি চর্চার ছিল উল্লেখযোগ্য। অমুসলিম ইংরেজ শাসন এবং ফারসী ভাষা পরিত্যক্ত হওয়ায় এ শিল্পটি এ অঞ্চলে আর বেশি দূর এগোতে পারেনি।

বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে আলিয়া নিসাবে যৎসামান্য ফারসী ভাষা বিদ্যমান থাকলেও কওমী নিসাবে মোটামুটি বেশ চর্চা বিদ্যমান রয়েছে। সে সুবাদে কওমী ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চার ক্ষেত্রে ফারসী ভাষার ব্যবহারও করে থাকেন। এজন্য ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ফারসী লিপিশৈলীর মধ্যে নাসতা'লিক ও শিকাসতা লিপিতে অনেকেই ক্যালিগ্রাফি করেছেন। আবার ক্যালিগ্রাফারদের অনেকেই ফারসী ভাষায় জ্ঞান না থাকলেও তারা এসব শৈলীতে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে থাকেন।

২.৯.৪ বাংলা ভাষার ক্যালিগ্রাফি

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা হলে শিক্ষার্থীরা নিজ ভাষার শিল্পমহিমা বিশ্বের দরবারে উঁচু করে তুলে ধরার সুযোগ পাবে। এমন ধারণা থেকেই বাংলাদেশের কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ ক্যালিগ্রাফার ভাবতে শুরু করেন। বাংলা ভাষায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা সম্ভব কি না। প্রথমদিকে এমন প্রশ্ন থাকায় শিল্পীগণ রীতিমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। একপর্যায়ে সফলতার

---

[১৮০] মিরাজ রহমান, *ক্যালিগ্রাফির নন্দনতত্ত্ব এবং লিপিশৈলী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি, ২০০৪), পৃ.২০।

Dhaka University Institutional Repository

মুখ দেখতে শুরু করেন। অনেক শিল্পী বাংলা ভাষার বিভিন্ন বর্ণমালায় ইসলামের মহিমান্বিত বাণীগুলোর সমন্বয়ে বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফি নির্মাণ করেন। ২০০০ সালে শিল্পী আরিফুর রহমান ঢাকার আজিজ সুপার মার্কেটে এককভাবে, ২০০৩ সালে ৬ শিল্পীর অংশগ্রহণে এবং ২০০৫ সালে ৭ শিল্পীর অংশগ্রহণে জাতীয় জাদুঘরে ৩দিন ব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মিডিয়ায় বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয়। এভাবে বাংলা ভাষায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এখন অনেক শিল্পীই আরবী, উর্দূ ও ফারসী ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেন। ক্যালিগ্রাফারগণ যেমন ধর্মীয় কারণে আরবী ক্যালিগ্রাফিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তেমনি দেশজ আবেদন বা দেশাত্ববোধ থেকে বাংলা ক্যালিগ্রাফিকে গুরুত্ব দিয়ে এর গতি আরো বেগবান করতে থাকেন।

শিল্পী সাইফুল ইসলাম একযুগেরও বেশি সময় ধরে গভীর নিমগ্নতায় বাংলা ক্যালিগ্রাফির চর্চা করে চলছেন। আরিফুর রহমান স্বীকৃত কিছু আরবী-ফারসী লিপিশৈলীকে আদর্শ মেনে বাংলা লিপিকে তাঁর নিজস্ব ঢঙে উপস্থাপন করে উক্ত ভাষাদ্বয়ের হরফের চরিত্রের সাথে মিশ্রিত করে একটি নতুন দ্যোতনার সৃষ্টি করেন। ফলে বাংলা ক্যালিগ্রাফি ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। সাথে সাথে তা মিডিয়াতেও বিস্তৃত হতে থাকে। শিল্পী বশির মেসবাহ বাংলা লিপির ডেকোরেটিভ ক্যানভাসে সুবিন্যস্ত করে তুলে ধরেন। এভাবে শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার লোকজ আশ্রিত বাংলা ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিন্যাস ও বিন্যস্ততাকে গতিশীল করে অনুষঙ্গের চিত্রায়নে লোকায়িত রূপ দিতে প্রয়াস পান।[১৮১]

চিত্র-১৩৮: শিল্পী আরিফুর রহমানের বাংলা ক্যালিগ্রাফি 'আল্লাহ'

বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের

Dhaka University Institutional Repository

সম্মান লাভ করায় এদেশের ক্যালিগ্রাফারগণ বাংলা ক্যালিগ্রাফি করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্যালিগ্রাফির গ্রামারিটিক্যাল মানদণ্ডে এগুলো পরিপূর্ণরূপে না টিকলেও একসময় এগুলোকেও একটি নিয়মে বিন্যস্ত করা যাবে। শিল্পী হামিদুল ইসলাম ১৯৮৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত কবি আল মাহমুদের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'যেভাবে বেড়ে উঠি' বইয়ের প্রচ্ছদ অঙ্কন করতে গিয়ে এ নিরীক্ষা চালান। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে পাতার বিষয় শিরোনাম করতে গিয়ে তিনি বরাবরই এ ধরনের ফ্রি-হ্যান্ড ক্যালিগ্রাফি চর্চায় দীর্ঘদিন থেকেই জড়িত আছেন। সাইফুল ইসলাম বাংলা ক্যালিগ্রাফির নবযাত্রার একজন সূচনা শিল্পী। ১৯৯০ সালে তিনি বাংলা ক্যালিগ্রাফি শুরু করেন। এ ধারায় তাঁর শিল্পকর্ম সরকারীভাবেও স্বীকৃত ও বরিত। এভাবে শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, ভাস্কর রাসা, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী বশির মেসবাহ, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদ, শিল্পী হা. মীম কেফায়েতুল্লাহ, শিল্পী আমিরুল হক, শিল্পী আরহাম-উল-হক চৌধুরী, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার, শিল্পী মাসুম আখতার মিলি, শিল্পী রফিকুল্লাহ গাজালী ও শিল্পী আবুদ্ দারদাসহ অনেক ক্যালিগ্রাফারই বাংলা ক্যালিগ্রাফি চর্চায় অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

তবে বাংলা ভাষায় হস্তলিখনের যে ধারা রয়েছে, তাকে শিল্পে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এখনও প্রাতিষ্ঠানিক তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে বাংলা ক্যালিগ্রাফিতে তেমন বিকাশ সাধিত হয়নি। অবশ্য অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এ প্রচেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, দলীল-দস্তাবেজ, ফরমান, মুদ্রা, তাম্রলিপি, শিলালিপি, ইস্টকলিপি, কামানগাত্র ইত্যাদিতে যেসব বাংলা লেখার নমূনা পাই, সেগুলোকে বাংলা ক্যালিগ্রাফির নমূনা হিসেবে বিবেচনায় নিলে বাংলা ক্যালিগ্রাফিকে আর নতুন কোন বিষয় বলে মনে হবে না।[১৮২]

[১৮২] মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, 'বাংলা ক্যালিগ্রাফি ও ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক ভাবনা', *স্মারক- ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি*, পৃ.১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষাতেও অত্যন্ত সুন্দর ক্যালিগ্রাফি সম্ভব। যা ভাষাপ্রেমিক, সৌন্দর্যপিয়াসী শিল্পীর কাজে প্রস্ফুটিত হয়। আর সৃজনশীল শিল্পকর্ম মানেই নতুন কিছু। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের কতিপয় শিল্পী তাদের আঁকা প্রচ্ছদসহ বিভিন্ন কাজে অনেক সুন্দর সুন্দর ক্যালিগ্রাফি করেছেন। সেগুলোকে আমরা কম্পিউটারের ব্যবহার উপযোগী ফন্টে রূপান্তরিত করতে পারি। বর্তমানে মাতৃভাষা ও দেশের মাটির প্রতি ক্যালিগ্রাফারদের যেহেতু মমতা ও ভালবাসা দেখা যাচ্ছে, তাই তাদের বিভিন্ন ফন্ট তৈরি করে তা সবার ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। এজন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও প্রয়োজন। দেশের তরুণ ক্যালিগ্রাফারগণ বাংলা বর্ণের নতুন বিশ্বাস ও নবরূপ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করা যায়। যা ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার ইতিহাসে এক অনন্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে। বিশ্বের লিপিকলার ইতিহাসে এ দেশের ক্যালিগ্রাফারদের অবদান ও বাংলা ক্যালিগ্রাফি একটি বিশেষ স্থান দখল করে নেবে। কারণ আমাদের শিল্পীদের মাঝে আছে কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার অপূর্ব সমাহার, ভাষা ও দেশমাতৃকার প্রতি অগাধ মমত্ববোধ ও নতুন সৃষ্টির অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা।[১৮৩]

২.৯.৫ ইংরেজি ভাষার ক্যালিগ্রাফি

চিত্র-১৩৯: ইংরেজি ভাষার ক্যালিগ্রাফি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'

ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা না হলেও এটি আন্তর্জাতিক ও জাতিসংঘের অন্যতম ভাষা হওয়ায় এর মর্যাদা সারা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয়ে থাকে। বিশেষত- যেসব দেশের মাতৃভাষা ইংরেজি তারা তাদের শিল্পচর্চার মাধ্যমও সেই ইংরেজি ভাষায়ই হয়ে থাকে। তাই তারা ক্যালিগ্রাফি চর্চা

---

[১৮৩] *ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*-২০০৩, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি, পৃ.২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

করেন তাদের ইংরেজি ভাষাতেই। বাংলাদেশে যেহেতু ইংরেজি ভাষার মোটামুটি প্রচলন আছে। তাই এদেশে ইংরেজি ভাষার কিছু কিছু ক্যালিগ্রাফিও নজর পড়ে। তবে সে পরিমাণ বেশি না হলেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশের স্বার্থে ইংরেজি ভাষাতেও ক্যালিগ্রাফি চর্চা বাড়ানো প্রয়োজন।

২.৯.৬ আঞ্চলিক ভাষার ক্যালিগ্রাফি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যেমন আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও তাদের আঞ্চলিক ভাষা বিদ্যমান। যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, বরিশাল ও রংপুর ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রভাষা ও মাতৃভাষা বাংলা হলেও আবহমান কাল থেকে অত্র অঞ্চলের মানুষের কথার আঞ্চলিক টোন ও শব্দ প্রয়োগের প্রভাবে এসব আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব। এ সকল ভাষার লৈখিকরূপ তেমন না থাকলেও কথ্যরূপ বিদ্যমান। তবে কোন কোন ভাষার লৈখিকরূপ রয়েছে। বাংলাদেশের ব্যতিক্রমধর্মী ক্যালিগ্রাফার ভাস্কর রাসা সিলেট অঞ্চলের মৃৎভাষা ‘নাগরী’ ভাষায় বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফি করেছেন।[১৮৪] যা দর্শক মহলে আরো আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু করে তুলে।

---

[১৮৪] ভাস্কর রাসার সাথে সরাসরি সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: বাংলা ভূখণ্ড ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

প্রথম পরিচ্ছেদ	এশিয়ায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ইউরোপে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	উত্তর আমেরিকায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বাংলা ভূখণ্ডে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: বাংলা ভূখণ্ড ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

ইসলামের অভ্যুদয়কালে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি কেবল হিজাযের সীমিত পরিসরে প্রচলিত ছিল। গুটিকতক সাহাবী ও অমুসলিমের মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ ছিল। অতপর যখন সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিস্তৃতি লাভ করে এবং এর ব্যাপ্তি আরব দেশ ছাড়িয়ে ইরাক, পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে ঐসব অঞ্চলের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মাঝে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিস্তার লাভ করে। অতি দ্রুত পারস্য, তুরস্ক, ভারত ও আফ্রিকা তথা মুসলিম বিশ্বের প্রায় সকল ভাষায় এর অনুপ্রবেশ ঘটে। ইসলামী সভ্যতার প্রসার এবং এর শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ফলে ঐসব অঞ্চলের অধিকাংশ ভাষা আজও আরবী লিপির অনুকরণে লিপিবদ্ধ করা হয়। এশিয়া মহাদেশে উর্দূ, ফারসী, তুর্কী, পশতু, কুর্দি, বালুচি, মুলতানী, কাশ্মীরী, মালে, জাভী ও সিন্ধী ভাষা এবং আফ্রিকা মহাদেশে বাবরী, হাবশী, নূবী, হাওসী, সাওয়াহিলী, মালাগাছি, সোমালী ও ইরিত্রিয়ান ভাষা আরবী লিপিরীতি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া বলকান অঞ্চলেও কতিপয় ইউরোপীয় জাতি আরবী লিপিরীতি ব্যবহার করত।[১]

প্রাচীন স্প্যানিশ, হল্যান্ড, স্লাভিয়া ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে আরবী লিপিরীতির অনুসরণ পাওয়া যায়। ফিলিপাইনের মিন্দানাও ও ছুলুর মুরগণ আজও তাদের ভাষা আরবী লিপিরীতির অনুযায়ী লিখে আসছেন। সুদূর চীন দেশেও মুসলমানদের আগমনের ফলে আরবী লিপিরীতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় ইসলাম প্রবেশের পর থেকেই আরবী ভাষার পাশাপাশি ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা আরম্ভ হয়। মধ্যযুগে বাংলাভাষা মুসলিম শাসনামলে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা বৃদ্ধি পায়। তখন বাংলার মুসলমানগণ বাংলা লিপিরীতির পরিবর্তে আরবী লিপিরীতি অনুসরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অবশ্য পরবর্তীতে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফারগণ বাংলা

---

[১] *আল-খাত্তুল আরাবী ওয়া আছারুল হাদারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার ক্যালিগ্রাফি করার প্রয়াস চালান এবং কিছুটা সফলও হন। পারেস ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর গ্রন্থে লিখেন- ‘Bengal made a unique and most important contribution to the development of Islamic calligraphy’.[২] অর্থাৎ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উন্নয়নে বাংলার এক অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। উল্লেখ্য, মধযুগের বাংলা কাব্য ও পাণ্ডুলিপি আরবী লিপিরীতি অবলম্বনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন জাদুঘরে আজও তার কিছু নমুনা সংরক্ষিত আছে।

বর্তমানে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। আধুনিক শিল্পীরা কুরআনের লিখনকে নতুনভাবে ব্যবহার করতে শিখেছেন। মিসর, সুদান, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানে আধুনিককালের শিল্পীরা আল-কুরআনের লিখনকে নতুন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। মিসরের মুহাম্মদ তাহা হোসাইন ও সুদানের শিবরান এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। কাজেই এ শিল্প কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবার নয়, বরং নব নব ব্যঞ্জনায় এর প্রকাশ ঘটেই চলছে।[৩] গোটা মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পীদের তুলির টানে বহু বিবর্তনের মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজো জনপ্রিয়তার শীর্ষে। যারা আরবী পড়তে বা লিখতে পারেন না তারাও ক্যালগ্রিাফির নিবিড় সৌন্দর্যপিপাসী ও ভক্ত। কারণ মানুষের মনের কাজ হলো সৌন্দর্যের আকর সন্ধান করা। মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, কাতার, সৌদি আরব ও অন্যান্য সব দেশে শিল্পকর্মের মধ্যে ক্যালিগ্রাফিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়।[৪] বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের ক্যালিগ্রাফির চর্চার চিত্রকে মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্যালিগ্রাফির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করার প্রয়াস পাব।

---

[২] *Islamic Calligraphy in the medieval India*, Ibid, p.48.

[৩] সৈয়দ আলী আহসান, *শৈল্পিক* ৬৯, পৃ.২৭।

[৪] ইসলামী ক্যালিগ্রাফির অনন্য শিল্পী সাইফুল ইসলাম, *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*, ১৮ আগস্ট-১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

৩.১ এশিয়ায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

৩.১.১ ইরানে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

ইরানে নাসতা'লিক ও নাসখী লিপির মাধ্যমে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির যাত্রা করেন মীর আলী তাবরীজি। অতপর আলী হেরাভী, শাহী ইসফাহানী ও কালহোর এ শিল্পকে আরো উন্নত করেন। বিখ্যাত উস্তাদ মীর ইমাদ হোসাইনীও এমন কিছু অসাধারণ শিল্প উপহার দেন, যা ক্যালিগ্রাফির সর্বোচ্চ মানে সমাসীন। তাঁর শিল্পকর্ম এত চমৎকার ছিল যে, তা দর্শক মহলে গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করে। ইরানের ক্যালিগ্রাফিতে আরেকটি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়, যা এ শিল্পকে অনেক অগ্রসর ও সমৃদ্ধি দান করেছে। আর তা হলো- শিকাসতায়ে নাসতা'লিক লিপির উদ্ভাবন। এটি তা'লিক ও নাসতা'লিকের সমন্বয়ে গঠিত। এ লিপির বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ছিলেন- সাইয়েদ গুলিস্তান ও আব্দুল মজিদ দারবিশ তালিকানী। যাদের কঠোর শ্রম ও সাধনা অসাধারণ সব ক্যালিগ্রাফি উপহার দিয়েছে। ইরানের সমকালীন ক্যালিগ্রাফারগণ তাদের উস্তাদের নিকট বিভিন্ন লিপিশৈলী আয়ত্ত্ব করে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে এবং চিত্রকলার অন্যান্য শাখাগুলোর মত ক্যালিগ্রাফিকেও আধুনিক বিশ্বসভায় তুলে ধরতে চেয়েছেন। এভাবে শিল্পের এ মহান মাধ্যমটি জাতীয়তার সীমা পেরিয়ে সমগ্র বিশ্বের দর্শকদের বিমোহিত করতে সক্ষম হয়েছে।[৫]

বর্তমানে ইরানী ক্যালিগ্রাফি কর্মগুলো সেদেশের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফারদের কঠোর অধ্যাবসায়ের ফসল। তারা এ শিল্পের সীমানাকে বিস্তৃত করেছেন। যেমন- স্ক্রীপ্ট পেইন্টিং-এ জালীল রাসূলী, স্ক্রীপ্ট গ্রাফিক্সে মোহাম্মদ এহসায়ী এবং মুয়াল্লা লিপিশৈলীর উদ্ভাবনায় আযামী ও মেহেদী শোকারী

---

[৫] *ফোল্ডার: ইরানের ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এবং এর সমকালীন বৈশিষ্ট্যসমূহ*, কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইরানী দূতাবাস, পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত টাইলসের উপরও ক্যালিগ্রাফি এঁকেছেন। জালীল রাসূলী ক্যালিগ্রাফিকে পেইন্টিং-এর সাথে যুক্ত করেছেন এবং তাঁর বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফিতে সৌন্দর্য ও সুক্ষ্মতার এমন এক জগত সৃষ্টি করেছেন যে, ইতোপূর্বে তা আর কারো ক্যালিগ্রাফিতে দেখা যায়নি। তাঁর সৃষ্ট ক্যালিগ্রাফিগুলো এমন সৌন্দর্যের ছায়া বহন করে, যা ক্লাসিক মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। তিনি চিত্রাঙ্কন ও লিপির সমন্বিত ব্যবহারেও তৎপর। তাঁর মতে, এর প্রথম উদ্ভাবক হলেন- হাসান যেন্দে রুদী, মরহুম পিল আরাম ও মরহুম রেযা মাফী। রাসূলী বিগত ৪০ বছর ধরে সৃজনশীল কীর্তি উপহার দিয়ে যাচ্ছেন, যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ত্রিশটির বেশি প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি ক্যালিগ্রাফিকে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে গেছেন। বিশেষত চিত্রাঙ্কন ও গ্রাফিক্সে। মোহাম্মদ এহসাঈ একজন আধুনিক ক্যালিগ্রাফার, যিনি অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করেছেন। যেখানে তিনি বিমূর্ত পেইন্টিং-এর সাথে ক্যালিগ্রাফির সুন্দর প্যাটার্ন যোগ করেছেন। তাঁর কীর্তিগুলো প্রাচ্যের উচ্চ প্রশংসিত চিত্রকর্মের উদাহরণে পরিপূর্ণ, যা প্রাচ্যের চিত্রশিল্পীদের সম্মানিত ও পবিত্র বিশ্বাস প্রকাশে তাঁর বুৎপত্তির প্রমাণ।[৬]

ইসলামী বিপ্লবের পর প্রতি বছর রমজান মাসে ইরান সরকারের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইরানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কুরআন ও ক্যালিগ্রাফির প্রদর্শনী এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ইরানের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং দেশের সর্বস্তরের মানুষ এতে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো- কুরআন ও ক্যালিগ্রাফির প্রতি মানুষকে আগ্রহী ও সচেতন করে তোলা। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় করা।[৭] ইরানের মালিক মিউজিয়ামে রয়েছে বিশাল লাইব্রেরি। এতে রয়েছে বিভিন্ন যুগের দুর্লভ ধাতব মুদ্রা, বিভিন্ন যুগের ব্যবহৃত সুন্দর সুন্দর কলমের বিশাল এক সংগ্রহশালা। একটি গ্যালারিতে ইরানের পুরনো শিল্পী ও কারিগরদের সুদক্ষ ও কুশলী হাতে নির্মিত সুদৃশ্য কার্পেটের এক বিশাল সম্ভার। সেখানে রয়েছে

---

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩-৪।

[৭] মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, 'সাম্প্রতিক ইরান ভ্রমণ', *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯ নভেম্বর-২০০৪, পৃ.১৬।

Dhaka University Institutional Repository

পুরনো অনেক শিল্পীর আঁকা শিল্পকর্ম বা ইসলামী ক্যালিগ্রাফি। আরেকটি গ্যালারিতে এক হাজার থেকে তেরশত বছর আগের দুষ্প্রাপ্য কুরআনের কয়েকটি কপি বিদ্যমান। সেখানে রয়েছে চামড়ার উপর লিখিত পবিত্র কুরআনের কপি। যা ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) পড়তেন।[৮]

ইরানে বাদশাহ রেজা শাহ পাহলভীর পূর্ব পুরুষদের প্রাসাদ রয়েছে, যা বর্তমানে বহুবিদ জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে রয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক মিনিয়েচার আর্ট। তাছাড়া ক্যালিগ্রাফি জাদুঘরে রয়েছে হাজার থেকে বারশত বছর পুরনো কুরআনের ক্যালিগ্রাফি। যা কুফী, সুলুস, নাসতা'লিক প্রভৃতি রীতিতে লিখিত। তার পার্শ্বেই রয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কুরআন শরীফ ছাপাখানা। যেখানে প্রতিদিন পাঁচ হাজার কুরআন শরীফ ছাপা হচ্ছে। সেখানে আরো আছে বৃহত্তম ইসলামী পাণ্ডুলিপির লাইব্রেরি।[৯]

ইরানের ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চারুশিল্পকে অতিক্রম করে কারুশিল্পেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে পেরিয়ে সকল বস্তুকে অধিকার করে আছে। ব্যবহারিক বৃত্তে এসেও এর শিল্পমান নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। এভাবে এ শিল্প সব সময় সব বস্তুকে অতিক্রম করে বিশ্বশিল্পকে এমন এক প্রভাব সৃষ্টি করেছে, যা কখনও অতিক্রান্ত হবার নয়। ২০০২ সালে ৩ অক্টোবর ইরানের তেহরানে 'দ্যা ইরানিয়ান একাডেমি অব আর্টস' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৮টি দেশের দু'হাজার শিল্পীর প্রায় চার হাজার শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আরব আমিরাত, বাহরাইন, সিরিয়া, জর্ডান, মালয়েশিয়া, লেবানন, লিবিয়া, তুরস্ক, মরক্কো, তাজিকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, মিসর, কুয়েত, আজারবাইজান, ভারত,

---

[৮] আমিনুল ইসলাম আমিন, '*ইরানের মালিক মিউজিয়াম*', *দৈনিক যুগান্তর*।

[৯] আমিনুল ইসলাম আমিন, 'তেহরানে আন্তর্জাতিক কোরআন ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', *দৈনিক যুগান্তর*, ১ জুলাই-২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

রাশিয়া, তিউনিশিয়া, জাপান, চীন, সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানী, আমেরিকা, নেদারল্যান্ড ও স্বাগতিক ইরান অংশগ্রহণ করে।[১০]

বর্তমানে ইরানের শীর্ষস্থানীয় ক্যালিগ্রাফারদের কয়েকজন হলেন- জালীল রাসূলী, জাভাদ বখতিয়ারী ও আব্বাস আখাওয়াইন প্রমুখ। ক্যালিগ্রাফির জন্য ইরানের শিল্পীরা প্রধানত নাসতা'লিক ও শিকাসতা শৈলী ব্যবহার করেন। ইরানে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মসজিদ ও মাজারের স্থাপত্যরীতিতে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ঐসব স্থাপত্যের ক্যালিগ্রাফিতে অলঙ্করণ ও বহু রঙের ব্যবহারে এর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১১] ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে সুষম রঙ, গ্রাফিক্স, কম্পোজিশন ইত্যাদি নান্দনিক আধুনিকায়ন ও সংযোজনের চর্চায় অগ্রবর্তী দেশ ইরান। ইরানের হাজার বছরের ঐতিহ্যের মধ্যে হাফিজ, রূমী, সাদী, ফেরদৌসি, খৈয়াম, আত্তার প্রমুখ কবির হৃদয়গ্রাহী পঙ্‌ক্তিমালা ক্যালিগ্রাফির যুগান্তকারী নমূনা হয়ে আছে।[১২]

৩.১.২ সৌদি আরবে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে রাসূল (সা.) এর জন্ম। এখানে তিনি শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পেরিয়ে ৫২ বছর বয়সে মদীনায় হিজরত করেন। প্রতিষ্ঠা করেন মদীনা ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র। বিস্তৃত করেন ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসীমা। এভাবে সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। মোটকথা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা.) সহ অসংখ্য নবী ও রাসূল এ ভূখণ্ডে আগমন করেন। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি হলো হজ্জ। যার সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয় সৌদি আরবের মক্কা-মদীনায়। এজন্য সৌদি আরবে হজ্জ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় নামে আলাদা মন্ত্রণালয় রয়েছে। ফলে ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালনের জায়গায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় বেশ

---

[১০] জহিরুল হক, *ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*, (ঢাকা: নভেম্বর-২০০৪), পৃ.৪৫।

[১১] সৈয়দ আলী আহসান, *শৈল্পিক ৬৯*, (ঢাকা: জানুয়ারি-২০০৬), পৃ.৩১।

[১২] বিদ্যুৎ বিহারী, 'শিল্পী আরিফুর রহমানের ক্যালিগ্রাফি', পৃ.২৩।

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া সৌদি আরবের ভাষা আরবী। আর ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিষয়াদি এ ভাষার সাথেই অধিক সম্পর্কযুক্ত। তাই সৌদি আরবে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির লালন ও চর্চার ব্যাপক ও বিস্তৃত সুযোগ বিদ্যমান।

কোন দেশের জাতীয় পতাকা সেই দেশের পরিচয় বহন করে। আর সৌদি আরবের জাতীয় পতাকায় স্থান পেয়েছে কালিমা তাইয়িবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র ক্যালিগ্রাফি। বর্তমানে সৌদি আরব কুরআন লিপিবদ্ধকরণ এবং এর আঙ্গিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য কুরআন সেলসহ একটি পৃথক কমপ্লেক্স এবং মদীনা মুনাওরায় 'ফাহাদ কুরআন কমপ্লেক্স' নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কমপ্লেক্সে খ্যাতনামা ক্যালিগ্রাফারগণ নিয়োজিত আছেন। এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার উসমান ত্বহার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ কমপ্লেক্সে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।[১৩]

মসজিদে নববীর জিয়ারতকারীদের কুরআনের সাথে সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সৌদি ধর্মমন্ত্রণালয় সামা হোল্ডিং কোম্পানীর সহযোগিতা ও ব্যবস্থাপনায় কুরআনের একটি স্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। মসজিদে নববীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত এ প্রদর্শনীটি ২০১৫ সালে উদ্বোধন হয়। এখানে প্রথমেই অভ্যর্থনা বিভাগ, তারপর নাবাউল আজিম কক্ষ, কুরআনের ইতিহাস কক্ষ, তারতীলের সাথে কুরআন তেলাওয়াত কক্ষ, তাফসীর ও তাদাব্বুর হল, 'কুরআনের ছায়ায় বেড়ে উঠা পরিবার' কক্ষ, পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনী কক্ষ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কক্ষ, বিদায় কক্ষ ও বিক্রয় কেন্দ্র। প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর কিতাবের সাথে পরিচিত করা। কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা, কুরআন শিক্ষায় সহযোগিতা করা, কুরআন নাযিল ও সংরক্ষণের

---

[১৩] মোহাম্মদ আবদুর রহীম, 'বাংলাদেশে কোরআন চর্চায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ভূমিকা', *দৈনিক সংগ্রাম*।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পাণ্ডুলিপি ও লেখার বিভিন্ন সামগ্রীর সাথে পরিচয় করানো।[১৪]

পবিত্র কা'বার গিলাফ কালো রেশমী কাপড়ে তৈরি হয়। ১৪ মিটার দীর্ঘ এবং ৯৫ সেন্টিমিটার প্রস্থ ৪১টি বস্ত্রখণ্ড জোড়া দিয়ে গিলাফটি তৈরি করা হয়। চার কোণায় সূরা ইখলাস স্বর্ণসূত্রে বৃত্তাকারে শোভা পায়। প্রতি বছর হাজীদের ইহরামের শ্বেত-শুভ্রতার সাথে সঙ্গতি রাখতে হজ্জের ঠিক আগে কা'বা শরীফের গিলাফ সরিয়ে তা সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। হজ্জ শেষে ১০ জিলহজ্জ নতুন গিলাফ পরানো হয়। পুরনো গিলাফটির বিভিন্ন অংশ মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানের উপহার দেয়া হয়।[১৫]

৩.১.৩ তুরস্কে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবস্থিত 'তোপকাপি প্যালেস' একটি বড় জাদুঘর। অটোমান সুলতানরা তাদের ৬২৪ বছরের শাসনকালে প্রায় ৪০০ বছর এখানে বসবাস করেছেন। জাদুঘরটি ইসলামের প্রথম যুগের অনেক দুর্লভ বস্তু সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের অন্যতম প্রধান স্থান। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দিয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম কুরআনের কপি তারা আবিষ্কার করেছেন। তারা বলেন- রেডিওকার্বন বিশ্লেষণে দেখা যায়, কপিটির লেখা ৫৬৮ থেকে ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিটি রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় লিখিত। এর ১৮ থেকে ২০ নং সূরার অংশ প্রাথমিক আরবী হিজাযী লিপিতে লিখিত। তবে সৌদি স্কলার ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, অধ্যায়গুলো পৃথকীকরণের জন্য যে লাল কালি ব্যবহার করা হয়েছে, তা রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় করা হয়নি। বরং হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ে হতে পারে। এ ব্যাপারে ২০০5

---

[১৪] মহিউদ্দীন ফারুকী, 'মসজিদে নববির আঙিনায় কোরআন প্রদর্শনী', *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ২৯ ফেব্রুয়ারি-২০১৬, পৃ.১০।

[১৫] মুহাম্মাদ রাশিদুল হক, 'যেভাবে প্রস্তুত হয় কা'বার গিলাফ', *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ২৭ আগস্ট-২০১৫, পৃ.১০।

Dhaka University Institutional Repository

সালে IRCICA বিশ্বের প্রাচীনতম কুরআন চিহ্নিত করণের প্রকল্পে কাজ করছে। তাদের মতেও এ পাণ্ডুলিপিটি হযরত উসমান (রা.) এর সময়ের কপি।[১৬] '

৩.১.৪ ইরাকে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

আব্বাসী সাম্রাজ্যের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও ক্যালিগ্রাফির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সবচেয়ে বেশি বাগদাদে বিদ্যমান ছিল। তখন বাগদাদের নিযামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক খরচ ছিল প্রায় ছয়লক্ষ দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা। মহিলা শিক্ষালয় জুনরও বাগদাদে বেশি ছিল। আর এ কারণেই বাগদাদে ক্যালিগ্রাফারদের মর্যাদা উচ্চকিত ছিল। ইরাকের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার জামিল হামদি আরবী লিপিকে জ্যামিতিক ফর্মে নিজস্ব রীতিতে উপস্থাপন করেছেন। শিল্পী যুদা মালারম তাঁর ছবির বিষয়বস্তুর সাথে লিপির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। শিল্পী শাকের হাসান তাঁর ফর্মের সাথে ক্যালিগ্রাফি উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয় চারুকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন ইরাকের বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার সাদী আল-কাবী। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু ছিল মরুভূমিতে শিলালিপি।[১৭]

বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থী হোসেন আল-খারসান নিজ হাতে বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম কুরআন স্বহস্তে লিখার উদ্যোগ নিয়েছেন। সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ কুরআন শরীফটি লিখতে খারসান ব্যবহার করছেন পাখির পালক ও রঙ। ৫০৩ পৃষ্ঠার এ কুরআন লিখতে গিয়ে কোমর ও পিঠের ব্যাথায় আক্রান্ত হয়েছেন। নাজাফ নামক শহরের এক গবেষণা কেন্দ্রে বসে তিনি এ কুরআন লিখেন।[১৮]

---

[১৬] 'বিশ্বের প্রাচীনতম কোরআন', আনাদোলু এজেন্সী অবলম্বনে, *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ৪ আগস্ট-২০১৫, পৃ.১০।

[১৭] ইব্রাহীম মন্ডল, 'ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিকাশ ও বর্তমান সমাজে প্রভাব', *মাসিক তানযীমুল উম্মাহ*, পৃ.১৪।

[১৮] 'নানারূপে আল কোরআন- দীর্ঘতম কোরআন শরীফ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ জুলাই-২০১২, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৫ আফগানিস্তানে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

আফগানিস্তানে ৩০ বছর যুদ্ধে কেটে যাওয়ার পরও শৈল্পিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে ভুলে যায়নি। বরং তা প্রমাণের জন্য আফগানরা পাঁচ বছরের প্রচেষ্টায় তৈরি করেছে বিশ্বের বৃহত্তম কুরআন শরীফ। ১০০০ পাউন্ড ওজনের কুরআন শরীফটির দৈর্ঘ্য ৭.৫ ও প্রস্থ ৫.১০ ফুট। আফগান সরকারের হজ্জ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে উদ্যোগে তৈরি হওয়া এই কুরআন শরীফটি প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে ২১টি গবাদি পশুর চামড়া। দামি চামড়ায় তৈরি প্রতিটি পৃষ্ঠায় অপরূপ সোনালি ক্যালিগ্রাফিতে বিবৃত হয়েছে এর কালাম। বর্তমানে এটি সংরক্ষিত আছে রাজধানী কাবুলের সংস্কৃতি কেন্দ্রে। ক্যালিগ্রাফার মোহাম্মদ সাবির খেদরির অধীনে নয় জন ছাত্র দিন-রাত খেটে এ কাজ সম্পন্ন করেছেন।[১৯]

৩.১.৬ ফিলিস্তিনে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ফিলিস্তিনেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা রয়েছে। বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিশীল ক্যালিগ্রাফার তাদের অনবদ্য শিল্পচর্চা করে চলছেন। তেমনি একজন ফিলিস্তিনী ক্যালিগ্রাফার নাহিদ দুখান। যিনি গাজা এলাকা থেকে বেড়ে উঠেছেন। যন্ত্র প্রকৌশল বিদ্যায় তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করার পাশাপাশি ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ধারাসমূহের উপরও ব্যাপক পড়াশুনা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফির নতুনত্ব প্রশংসার দাবি রাখে। সমকালীন ধারায় তৈরি তাঁর ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্মের প্রদর্শনী সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, শিকাগো ও সানফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত হয়।[২০] যা দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

৩.১.৭ ফিলিপাইনে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

ফিলিপাইনের মুসলমানগণ মিন্দানাও ছুলু ভাষা লেখার ক্ষেত্রে এখনও আরবী ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম প্রবেশের পর তারা আরবী বর্ণে ‘আত-তারাসুল’ নামে একটি

---

[১৯] ‘নানারূপে আল কোরআন- বৃহত্তম কোরআন শরীফ’, *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ জুলাই-২০১২, পৃ.৫।
[২০] *ক্যালিগ্রাফ আর্ট*, প্রাগুক্ত, পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এটি একটি কুলজিনামা। এর প্রেক্ষাপট হলো- ইসলাম পূর্ব তাদের অবস্থা ছিল একেবারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এখানে ইসলাম পৌঁছার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ছোঁয়া লাগে। তখন থেকে তাদের জীবনধারায় ফিরে আসে শৃঙখলা। তারা লিখতে শুরু করে তাদের ইতিহাস, জীবনচরিত ও কুলজিনামা ইত্যাদি। সেই সাথে আরবী হরফ গ্রহণ করে নেয়। তারা আত-তারাসুল ছাড়াও আরব ও মালয়দের নিকট থেকে গৃহীত বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থও তাদের ভাষায় এবং আরবী লিখনরীতি অনুযায়ী রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ঈদ ও জুম'আহর খুতবাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২১]

৩.১.৮ চীনে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

চীনের মুসলমানরা আরবী ও অনারবী ভাষায় প্রণীত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ তথা কুরআন, হাদীস ও ফিকহ ইত্যাদি লেখার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে যেমন আরবী লিপি ব্যবহার করে আসছে। তেমনি আরবী লিপি নিজেদের ভাষায় প্রণীত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ লেখার ক্ষেত্রেও আরবী লিপিরীতি অনুসরণ করে আসছে। অধ্যাপক হার্টম্যান 'মুখতাছারুল আহকামিল ইসলামিয়্যাহ' শীর্ষক গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি কাশগড়ে আবিষ্কার করেন। এ পাণ্ডুলিপির ভাষা হলো বকিন উপভাষার নিকটবর্তী উত্তর চীনের একটি উপভাষা। এতে আরবী ও ফারসী শব্দ রয়েছে। যা ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শৈলী অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

চীনে অনেক আগে থেকেই ইসলাম ও আরবী লিপিরীতির পদার্পন থাকলেও এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান থাকলেও সেখানে আরবী লিপির প্রাচীন নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। সেখানে প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে- ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন ক্যাংটং নগরীর মসজিদে উৎকীর্ণ আরবী লিপি। এটি থান পরিবারের সং কং এর আমলে উৎকীর্ণ করা হয়। চীনে প্রাচীন ব্রোঞ্জের পাত্রসমূহে প্রাপ্ত আরবী লিপিসমূহ নবম শতাব্দীর পর উৎকীর্ণ করা হয়। সেখানকার মুসলমানরা রেখা ও মুদ্রণের কাজ আধুনিক যুগেই শুরু করে। তারা মুদ্রণের জন্য প্রাচীন রীতি অনুযায়ী মসৃণ

---

[২১] *ইনতিশারুল খাত্তিল 'আরাবী ফিল 'আলিমিশ শারকী ওয়াল গারবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

কাষ্ঠফলক ব্যবহার করে থাকে। চীনের জনগোষ্ঠীকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো- উইগুর ও হুই। তারা উভয় জনগোষ্ঠীই ধর্ম শিক্ষায় তাদের নিজস্ব ভাষার পাশাপাশি আরবী ও ফারসী ভাষা ব্যবহার করে থাকে।[২২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৩.২ ইউরোপে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

৩.২.১ স্পেনে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

স্পেনে ইসলাম প্রবেশ ও তা বিস্তৃতির সময় আরবী ভাষা ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা শুরু হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় স্পেনেও ইসলামী লিপিকলা ব্যাপক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করে। সেই সাথে এর শিল্প সৌকর্য ও বিচিত্র ব্যবহার তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। আল-কুরআন, বিভিন্ন গ্রন্থ, ইমারতগাত্র ও মসজিদে তার সুদর্শন ও বিচিত্র ব্যবহার আজও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। তাছাড়া স্থাপত্যশিল্পকে কেন্দ্র করেও এখানে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। 'আল-হামরা প্রাসাদ'[২৩] তার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অতীব সুক্ষ্ম কারুকার্য, জটিল খোদাইকাজ এবং উজ্জ্বল মোজাইকের সাথে মনোরম ও আকর্ষণীয় কুফী ও অন্যান্য লিপিশৈলীর সংমিশ্রণে এক অভিনব রূপ ধারণ করেছে।

---

[২২] মোহাম্মদ রেজা মীরযায়ী, 'চীনে ইসলাম ও মুসলমান', *মাসিক নিউজ লেটার*, *প্রাগুক্ত*, জুলাই-আগস্ট-২০০৪, পৃ.১৮।

[২৩] আল-হামরা প্রাসাদঃ এটি মুসলিম স্থাপত্যের এক অবিস্মরণীয় ও বিস্ময়কর নিদর্শন। নাসিরীয় বংশের প্রথম সুলতান মুহাম্মদ ইবনুল আহমার (১২৩২-১২৭৩ খ্রি.)-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় দু'শত বছর ধরে এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। সচক্ষে না দেখে এর রূপসৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। রাজা ফার্ডিন্যান্ডও রানী ইসাবেলা কর্তৃক গ্রানাডা অধিকারের পর এর রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ১৮৭০ সালে এটিকে স্পেনের জাতীয় ইমারত হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুতকরণ ও চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি বিশাল ভূমিকা রাখে। গ্রানাডা, টলেডো ও রাজধানী কর্ডোভায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র হিসেবে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্রন্থের অনুলিপি প্রণয়নের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া ক্যালিগ্রাফিকে সৌখিন বস্তু ও মর্যাদাপূর্ণ পেশা হিসেবে গ্রহণ করায় এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। গ্রানাডাতে বৃহৎ আকারের ১৭টি এবং ছোট আকারের ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত ছিল গ্রন্থাগার। এতে ৪ লক্ষ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। সমগ্র স্পেনে ৮০টি গ্রন্থাগার ছিল। এতেও অসংখ্য পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যে খলীফা মুস্তানসিরের আমলের উমাইয়া গ্রন্থাগারটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে ৪ লক্ষাধিক পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল। স্পেনের দ্বিতীয় শাসক হাকাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বাগদাদ, কায়রো দামিশ্‌ক ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেন। আর এ কাজের জন্য তিনি অনেক ক্যালিগ্রাফারকেও নিয়োগ দেন।[২৪]

স্পেনের খলীফা দ্বিতীয় হাকাম গ্রন্থপ্রেমিক ছিলেন। অধ্যাপক আর ভোজী বলেন- 'তাঁর মত বিজ্ঞ সুলতান স্পেনের রাজত্ব করেননি এবং তাঁর পূর্বসূরীরা সকলেই জ্ঞানী-গুণী ছিলেন। কায়রো, বাগদাদ, দামেস্ক ও আলেকজান্দ্রিয়ায় হাকামের প্রতিনিধি ছিল। যারা যে কোন মূল্যে প্রাচীন ও আধুনিক পাণ্ডুলিপি ক্রয় ও অনুলিপি প্রস্তুত করতেন। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি দ্বারা তাঁর প্রাসাদ পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁর চারপাশ শুধু লিপিকার, বাধাইকার ও গিল্টিকারদের দেখা যেত।' আর সে সুযোগে প্রায় সকল সংস্কৃতিমনা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ বিবরণ প্রযোজ্য ছিল।[২৫]

---

[২৪] *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০-২৯১।
[২৫] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্পেনের বর্বর খ্রিস্টানরা ইতিহাসের নজিরবিহীন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের পাশাপাশি মুসলমানদের সিংহভাগ কীর্তিও ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। এ সময় তারা গ্রন্থাগার, মসজিদ, প্রাসাদ, এমনকি শিল্পকলার বিভিন্ন নিদর্শনকেও ধ্বংস করে দেয়। এস.পি স্টকের মতে, 'খ্রিস্টান যাজক সম্প্রদায় আরবী ক্যালিগ্রাফিকর্মকে ভৌতিক সূত্র বলে ঘোষণা করে এবং আরবী গ্রন্থাবলিকে ম্যাজিকের গ্রন্থ বলে অভিহিত করে।' স্পেন থেকে সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার জন্য আইনও প্রণয়ন করা হয়। দ্বিতীয় ফিলিপ এমনও নির্দেশ দেন যে, পাথরে খোদিত আরবী লিপিসমূহ যেন টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।[২৬]

৩.২.২ ইতালিতে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

মুসলমানদের সিসিলি বিজয়ের ফলে ইতালিতেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক বিস্তার ঘটে। সেখানে আরবী লিপির অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে মুসলমানদের নির্মিত অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মসজিদ, বড় বড় প্রাসাদ ও অট্টালিকা রয়েছে। পরবর্তীকালে সেখানকার স্থাপত্যশিল্পে এগুলো বিরাট প্রভাব ফেলে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত তরবারী, মুদ্রাসমূহ ও ইতালির জাদুঘরে সংরক্ষিত আরব যন্ত্রপাতি এবং কুফী বা নাসখী শৈলীতে লিখিত বিভিন্ন সমাধিফলক সাক্ষ্য দেয় যে, আরবদের শামনামলে সেখানে আরবী লিপি ও ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এমনকি নর্মেনদের বিজয়ের পরও আরব-ইসলামী সংস্কৃতির রূপ ও রঙের কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং সিসিলি ফিরে পাওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয়রা বড় বড় দালান ও রাজপ্রাসাদে আরবী লিপিতে স্মৃতিফলক উৎকীর্ণ করত। যার বড় নিদর্শন হলো- সিসিলির বলিরমে অবস্থিত সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সমাধিতে উৎকীর্ণ লিপি। তাছাড়া সিসিলির সম্রাট দ্বিতীয় রোজারসের কাপড়ে উৎকীর্ণ আরবী লিপি এর একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যা বর্তমানে ভিয়েনার জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[২৭]

---

[২৬] S. Lanepoole Scott, *The Moors in Spain*, pp.272-273.
[২৭] আহমদ আলী, *মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৩ লন্ডনে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

১২০৩ সালের রমজান মাসে লেখা কুরআনের একটি কপি ২৩ অক্টোবর-২০০৭ লন্ডনে নিলামে উঠে। নিলামে এটি বিক্রি হয় ২৩ লাখ মার্কিন ডলার। একে নির্দ্বিধায় কুরআনের সবচেয়ে দামী কপি হিসেবে অভিহিত করা যায়। ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ ইবনে উমর নামের এক ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্বলিত কুরআনের এ কপিতে তারিখ উল্লেখ আছে ৫৯৯ হিজরী সনের ১৭ রমজান। ১৯০৪ সালে হিসপ্যানিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আর্চার মিল্টন হটিংটন কায়রো থেকে এ কপিটি সংগ্রহ করেন। এর ক্যালিগ্রাফিগুলো খুব আকর্ষণীয়। কালো লাইনের উপর সোনালি হরফে এর আয়াতগুলো লেখা। প্রতিটি পৃষ্ঠায় বিভিন্ন আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেয়া আছে, তা রূপালি হরফে লেখা।[২৮] বর্তমানেও কতিপয় নিবেদিতপ্রাণ ক্যালিগ্রাফার সেদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন।

[২৮] 'নানারূপে আল কোরআন- পৃথিবীর সবচেয়ে দামী কোরআন শরীফ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ জুলাই-২০১২, পৃ.৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩.৩ উত্তর আমেরিকায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

৩.৩.১ আমেরিকায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

পশ্চিমা বিশ্বের দেশ আমেরিকায়ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা বিদ্যমান। রাসূল (সা.) এর ১৪৪৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ইসলামের প্রকৃত মূল্যবোধ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির এক বর্ণাঢ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। 'Love for the prophet' শিরোনামে প্রদর্শনীতে তুর্কীসহ বিভিন্ন ক্যালিগ্রাফারদের চিত্র শোভা পায়। তুর্কী দূতাবাসের উদ্যোগে আয়োজিত প্রদর্শনীতে প্রধানত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসেও এ ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনী দু'টির সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন তুর্কী সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা।[২৯] প্রদর্শনীটি উপস্থিত দর্শকদেরকে রাসূলপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে।

৩.৩.২ কানাডায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

কানাডার টরেন্টোতে ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে 'আগা খান মিউজিয়াম অব ইসলামিক আর্টস' যাত্রা শুরু করে। ইসলামী শিল্পকলা ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন সংগ্রহ এবং আগা খানের ব্যক্তিগত সংগ্রহের নানা শিল্পকর্ম নিয়ে জাদুঘরটি সাজানো হয়েছে। এখানে মুসলিম সমাজে অতীত বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধিভিত্তিক, সাংস্কৃতিক, শিল্পকলা ও ধর্মীয় রীতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে সিরামিক্স, ধাতবপত্র ও চিত্রকলা অন্তর্ভুক্ত। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রাচীনতম ইবনে সিনার 'কানুন ফিত তীব' (১০৫২ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য। এখানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত প্রায় ১ হাজার কপি, কুরআন শরীফের মধ্যে বিভিন্ন লিখনরীতি, উপাদান ও অলঙ্করণরীতিতে সাজানো চমৎকার সব কপি রয়েছে। এখানে 'ব্লু কুরআন' এর একটি পৃষ্ঠাও রয়েছে। যা স্বর্ণ দ্বারা কুফী লিপিতে নীল দ্বারা রঙিন চামড়ায় লিখিত হয়েছে। এটি নবম ও দশম শতাব্দীতে ফাতেমী শাসনামলে উত্তর আফ্রিকার কায়রোয়ানে তৈরি কুরআনের এ যাবৎকালের অনন্য সাধারণ একটি পাণ্ডুলিপি। সাদা মার্বেল পাথরের নয়নাভিরাম এ স্থাপত্যের নির্মাতা প্রিৎজকার পুরস্কারপ্রাপ্ত জাপানের বিখ্যাত স্থপতি ফুমিহিকো মাকি।[৩০]

---

[২৯] 'ওয়াশিংটনে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী', আনাদোলু এজেন্সী, *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ৯ নভেম্বর-২০১৪, পৃ.১০।

[৩০] 'আগা খান মিউজিয়াম', *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ৬ এপ্রিল-২০১৫, পৃ.১০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৩.৪ বাংলা ভূখণ্ডে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি

ভারতীয় উপমহাদেশে সুলতানী ও মুঘল উভয় আমলেই সমভাবে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা অব্যাহত ছিল। সুলতানী আমলে তুর্কী বংশোদ্ভুত ক্যালিগ্রাফারদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করা হত। মধ্য এশিয়া ও এশিয়া মাইনর হতে খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফারগণ এদেশে এসে ক্যালিগ্রাফির বিকাশ সাধনের জন্য অসামান্য অবদান রেখেছেন। দিল্লির মামলুক সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ উচুস্তরের ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে আল-কুরআনের অনুলিপি তৈরি করে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে সংসারের ব্যয়ভার বহন করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বের প্রায় এক শতাব্দী পর

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে বতুতা দিল্লি এসেছিলেন তখন দিল্লির প্রধান বিচারক কামাল উদ্দিন তাকে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত কুরআনের একটি কপি দেখিয়েছেন।[৩১]

ভারতবর্ষের শাসকগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ, মাদরাসা, প্রাসাদ, সমাধিসৌধ ও বিভিন্ন স্থাপত্যে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি সাজসজ্জা ও অলঙ্করণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩২] পর্যাপ্ত উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সুলতানী আমলে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশ ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফারদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম হতে শুরু করে বিভিন্ন ইমারত গাত্রে উৎকীর্ণ লিপির লিখনপদ্ধতি এবং গুণগত মান বিচার করে সে যুগের ইসলামী ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে উন্নত ধারণা পোষণ করা সমীচীন বলে মনে হয়। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন দক্ষ ক্যালিগ্রাফার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি 'খাত-ই-বিহার' পদ্ধতিতে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করতেন এবং তাঁর একটি কপি দিল্লির প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।[৩৩]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় কুফী লিপিশৈলীতে উৎকীর্ণ অনেক শিলালিপি পাওয়া যায়। ৭২৭-৭২৮ সালে সিন্ধুর বনহুরের জামে মসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং ৪৮২-১০৯০ সালে হান্ড এর উৎকীর্ণ শিলালিপি ভারতবর্ষের শিলালিপি হিসেবে অনুমান করা হয়। গুজরাট, দিল্লি, আজমীর ও মোহাম্মদগড় এলাকায় এ রীতির বিভিন্ন শিলালিপি দেখা যায়। যার অধিকাংশই ত্রয়োদশ শতাব্দীর মামলুক সালতানাতের (১২০৬-১২৯০ খ্রি.) প্রথমভাগে উৎকীর্ণ হয়।[৩৪]

---

[৩১] Ibn Batuta, *Rihla*, Eng. Tr. Agha Mahdi Husain (Baruda: 1953), p.35.

[৩২] Abul Farah Muhammad bin Ishaq Nadim, *The art of Calligraphy,* (New York: Colombia University Press, 1970), p.72.

[৩৩] *Memoirs of the Archeological Survey of India, No. 29, Speciman*.3.

[৩৪] মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক, *'আল-খাত্তুল 'আরাবী ওয়া আছারুল হাদারি'*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

মামলুক সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.) যখন মধ্য ও পূর্ব-ভারত বিজয় করে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে ভারতে নাসখী লিপিশৈলীর ব্যবহার শুরু হয়। আফগানিস্তানে গজনী সুলতানদের রাজধানীতে এ লিপিশৈলীর কয়েকটি শিলালিপিও পাওয়া যায়। যাতে সুলতান মাসউদের নাম থাকায় ভারতবর্ষে এর প্রসার ঘটে। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঘুরীদের শাসনামলে (১১৭৩-১২০৬ খ্রি.) এর ব্যাপক ব্যবহার হয়। তখন থেকে এটি দৈনন্দিন কার্যাবলি, সরকারী বিধি-বিধান ও সিদ্ধান্তসমূহ, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন, পাঠ্যবই ও মুদ্রাগাত্রে লিপিবদ্ধকরণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৩৫]

সুলতানী আমলে স্বাধীন প্রদেশগুলোতে ক্যালিগ্রাফি চর্চা অব্যাহত ছিল। শিলালিপির সাক্ষ্যে সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে (১২৩৩ খ্রি.) মুহাম্মদ বিন আহমদ ক্যালিগ্রাফারের নাম অবগত হওয়া যায়। সম্ভবত তিনি সরকারী ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। বাংলার সুলতান আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ বিন ইলিয়াস শাহের একটি শিলালিপিতে গিয়াস জারীনদাস্ত নামক একজন ক্যালিগ্রাফারের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর সুন্দর ও মনোরম ক্যালিগ্রাফির জন্য তাকে 'জারীনদাস্ত' উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়। এমন উপাধি তাঁর একজন দরবারী ক্যালিগ্রাফারের প্রমাণ বহন করে।

বাংলার সুলতানী আমলে (১২৩৩-১৫৭৫ খ্রি.) নাসখী রীতিতে লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি আজও বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তার মধ্যে 'হাউযুল হায়াত' পাণ্ডুলিপি অন্যতম। এছাড়া 'ফরহাঙ্গে ইবরাহীম' নামক ফার্সী ভাষার একটি অভিধান পাওয়া যায়। ইবরাহীম কাওয়ান ফারুকী রচিত এ অভিধানটি 'শরাফনামা' হিসেবেও পরিচিত। যা রুকনুদ্দীন ওয়াদ্ দুনিয়া বারবাক শাহের শাসনামলে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) লেখা হয়। বানকীপুরের খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরিতে তিন খণ্ডে বুখারী শরীফের একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। যা বাংলার সুলতান হোসাইন শাহের আমলে

---

[৩৫] আহমদ আলী, '*বাংলায় বিভিন্ন আরবী লিখনশৈলীর ব্যবহার*', প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

(১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযদান বখ্শ একডালা দুর্গে লিপিবদ্ধ করেন। এসব পাণ্ডুলিপি নাসখী লিপিতে সম্পাদিত।[৩৬]

বাংলাদেশের সুলতানী আমলে মিসরেও তুঘরা লিপির চর্চা লক্ষ্য করা যায় এবং উভয় দেশের এ লিপিশৈলীর মধ্যে সাদৃশ্যও দেখা যায়। কারণ উভয় দেশের সুলতানদের মাঝে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন বাংলার সুলতান জালালুদ্ দ্বীন ওয়াদ্ দুনিয়া মুহাম্মদ শাহ (১৪১৮-১৪৩৩ খ্রি.) তাঁর সমসাময়িক মামলুক সুলতান বারসবা এর শাসনামলে দু'দেশের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তারা পরস্পর পরস্পরের নিকট হাদিয়া পাঠাতেন। দু'দেশের মধ্যকার এ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে বাংলার তুঘরা লিপি স্বভাবতই মামলুকদের তুঘরা লিপি দ্বারা প্রভাবিত হয়। মামলুক সুলতানগণ তাদের সরকারী ফরমান বা নির্দেশাবলিতে ব্যবহার করতেন। তারা দীর্ঘ কাগজে তুঘরা উৎকীর্ণ করার জন্য ক্যালিগ্রাফার নিয়োগ করতেন।[৩৭]

সুলতান বারবাক শাহের শাসনামলে (১৪৫৯-১৫৭৪ খ্রি.) গৌড়ে প্রাপ্ত কবরগাত্রে কুফী ও সুলুস লিপির চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া উৎকীর্ণ দেওতলা শিলালিপির অঙ্গসৌষ্ঠব দেখে নাসখী লিপিশৈলীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে ব্যবহৃত 'আলিফ ও লাম'-এর খাঁড়া দণ্ডসমূহের পাদদেশে উৎকীর্ণ হরফগুলোকে ধুলিকণার মত মনে হয়। এজন্য একে ঘুবার লিপিশৈলীর লেখা হিসেবে মনে করা হয়।[৩৮]

অটোমান সম্রাজ্যে তুঘরা লিপি মর্যাদার আসন অলঙ্কৃত করেছিল। তারা ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় লেখার ক্ষেত্রে এটিকে আলঙ্কারিক রীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অটোমান তুঘরার আকৃতি ও প্রকৃতি মিসরের মামলুকীয় তুঘরার চেয়ে ভিন্ন ছিল। সুলতানী আমলে তুঘরা লিপির বিভিন্ন প্রকরণ লক্ষ্য

---

[৩৬] *'বাংলায় বিভিন্ন আরবী লিখনশৈলীর ব্যবহার'*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০।
[৩৭] *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৭।
[৩৮] মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। ক্যালিগ্রাফারগণ তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা এমনভাবে বিন্যাস করেন যে, সেগুলো আলঙ্কারিক মোটিফে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে দীর্ঘ শিলালিপি ক্ষুদ্র পরিসরে খোদাই করার জন্য পর পর কয়েকটি স্তরে হরফগুলো জড়িত করে উৎকীর্ণ করা হয়। পরস্পর জড়িত হরফগুলো জটিল ও পাঠোদ্ধারে অসুবিধা সৃষ্টি করলেও এদের ভারসাম্য, সুসামঞ্জস্য ও শৈল্পিক চাতুর্য ব্যাহত হয় না।[৩৯] মুসলিম সুলতানগণ ও শিল্পীগণ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশ ও প্রভূত উন্নয়ন সাধনে আন্তরিক ও যত্নবান ছিলেন। ফলে তখন অনেক সুদক্ষ ক্যালিগ্রাফার গড়ে উঠে। সুলতানী আমলে বাংলার শিলালিপিগুলোতে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বেশ উৎকর্ষ সাধিত হয়। তখন নাসখী ও সুলুসের পাশাপাশি তুঘরার লিপিশৈলী বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই আলঙ্কারিক রীতি হিসেবে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৪০]

মুঘল আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাট জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর একজন দক্ষ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। যিনি কয়েকটি লিপিশৈলীতে পারদর্শী ছিলেন। তাছাড়া তিনি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে লিখতেন যা 'খাত-ই-বাবুরী' নামে পরিচিত ছিল।[৪১] বাদায়ুনীর মতে, তিনি নিজ হাতে বাবুরী লিপিতে এক জিলদ কুরআন শরীফ নকল করে মক্কা শরীফে পাঠান। সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন শাসনক্ষমতা লাভ করেন। তিনিও তাঁর পিতার ন্যায় ক্যালিগ্রাফির চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তৎকালীন পারস্যের শাসনকর্তা শাহ তাহমাসপ এর সাথে গভীর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি শেরশাহের অনুরোধক্রমে পারস্য হতে ভারতে কয়েকজন লিপিকারকে পাঠান। তাদের মধ্যে মীর সাইয়েদ আলী তাব্রীজি ও খাজা আবদুস সামাদ অন্যতম। সে সময়ে ভারতীয় অনেক খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তাদের মধ্যে মীর মনসুর ও তদীয় পুত্র মাওলানা কাশিম, মির্জা মুহাম্মদ হুসাইন, খাজা মুহাম্মদ

---

[৩৯] *মুসলিম লিপিকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।

[৪০] *বাংলায় বিভিন্ন আরবী লিখনশৈলীর ব্যবহার*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮১।

[৪১] *মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখনশিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুনিম সুলুস ও নাসখী লিপিশৈলীতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক স্কুল গড়ে তুলেন।[৪২]

হুমায়ুনের পুত্র সম্রাট আকবর ছিলেন শিল্পের সমঝদার ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। বহু চিত্রকর ও ক্যালিগ্রাফার তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করতেন। জায়গীর রূপে ভূসম্পতি এবং মাঝে মাঝে সরকারী উচ্চ পদও দান করতেন। সম্রাট আকবরের শাসনামলে যেসব বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফারের আবির্ভাব হয়েছিল তাজকিরা-ই-খুশনবীশ বা লিপিকার স্মৃতি নামক গ্রন্থে তাদের প্রায় সবারই নাম উল্লেখ আছে। আবুল ফজল উল্লেখ করেন, কাশ্মীরবাসী মুহাম্মদ হুমায়ুনের (মৃ. ১০২০ হি.) নাম 'বরযীন কলম' বা স্বর্ণকলমধারী নামে পরিচিত। সম্রাট আকবর তাকে এ উপাধিতে আখ্যায়িত করেছিলেন। অন্যান্য ক্যালিগ্রাফারদের মধ্যে ছিলেন- মোল্লা মীর আলী, মুহাম্মদ আশীর, মীর হুসাইন কুলানকী, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা দাওরী, সুলতান বায়জীদ। সুলতান বায়জীদকে সম্রাট আকবর 'কাতিবুল মুলক' বা রাজ্যের লেখক উপাধি দিয়েছিলেন। মাওলানা আবদুর রহীম 'আমবরীন কলম' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি নাসতা'লিক লিপিতে পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি কবি নিযামীর খাম্‌সা নকল করেছিলেন। কাশ্মীরের আলী চমন ও নূরুল্লাহ কাসিম আরমালান, শীরাজের খাজা আবদুস সামাদ ও মুজাফ্‌ফর আলী, কান্দাহারের মীর মাসুদও খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফার ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকে মুঘল চিত্রকলা ও লিপিশৈলীর স্বর্ণযুগ বলা যায়। আকবরের দরবারে প্রায় সব লিপিকারই ক্যালিগ্রাফি চর্চা করতেন। তাঁর আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন, তাবরীজের মীর আবদুল্লাহ মুশকিন কলম ও আব্দুস সামাদ, শিরীন কলমের পুত্র মুহাম্মদ শরীফ, শিকাসতা লিপিতে পারদর্শী মির্জা মুহাম্মদ হুমায়ুন ও হিরাতের মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ। ইমাদ প্রবর্তিত শাহজাহান নাসতা'লিকের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'তাজকীরা-ই-খুশ্‌নবীশ' গ্রন্থে আছে

---

[৪২] *Islamic Calligraphy in the medieval India,* ibid, p.60.

Dhaka University Institutional Repository

যে, এ লিপিশৈলীর অনুসারীগণ একশত ঘোড়াদৌঁড় মর্যাদা পান। তিনি স্বয়ং নাসতা'লিকের চর্চা করতেন। তাঁর রাজত্বে কয়েকজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। যেমন- কাশ্মীরের আব্দুল বাকী, মীর সাইয়েদ আলী তাব্‌রিজী, মাওলানা আবদুল হাই, মীর আবদুল্লাহ, মীর সালেহ আব্দুর রশীদ, দায়লামী, মুহাম্মদ আফজাল ও মির্জা ফয়জুল্লাহ প্রমুখ। সম্রাট শাহজাহানের আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন আব্দুর রশীদ। তিনি ক্যালিগ্রাফির জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে মুঘল ভারতে ক্যালিগ্রাফির উৎকর্ষ সাধন করেছে। যুবরাজ দারাশিকো ও রাজকুমারী জেবুন্নেছা রশীদের নিকট ক্যালিগ্রাফির সবক গ্রহণ করেন। আওঙ্গজেবের গৃহশিক্ষক আব্দুল বাকী অভিজ্ঞ ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি ৩০ পাতায় সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের নকল করে সম্রাট শাহজাহানকে উপহার দিলে বাদশাহ তাকে ‘ইয়াকুত রকম’ তথা রত্ন লেখনী ধারক উপাধি দেন।[৪৩]

সম্রাট শাহজাহানের জেষ্ঠ্যপুত্র দারাশিকো তাঁর পিতা কর্তৃক নিয়োগকৃত পারস্যের প্রসিদ্ধ শিক্ষক আবদুর রশীদ দায়লামীর প্রশিক্ষণে ক্যালিগ্রাফিতে নিপুণতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। তাঁর স্বহস্তে লিখিত ওয়াছিলী তথা মনোরম হস্তাক্ষরে লিখিত কবিতাংশ দিল্লি কেল্লায় সুরক্ষিত আছে। সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন ঈমান আকিদার দিক থেকে প্রকৃত মুসলমান। তাই প্রাণী চিত্রাঙ্কণের প্রচলিত ধারা বন্ধ করে ক্যালিগ্রাফির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর সময়ে কয়েকজন হিন্দু ক্যালিগ্রাফারও ছিল। তারা হলো- পণ্ডিত লক্ষ্মীরাম লাল, সুখরাম মুন্সী, মাহবুব রায় ও মুনশী কমল রায় প্রমুখ।[৪৪]

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন উঁচুমানের ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে পবিত্র আল-কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করে বিক্রি করতেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে সংসারের খরচ বহন করতেন। তিনি প্রতি বছর সুন্দর হস্তাক্ষরে আল-কুরআনের অনুলিপি করে, দু'টি কপি তিনি

---

৪৩ *মুসলিম লিপিকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩।

৪৪ ইব্রাহীম মণ্ডল, ‘*ইসলামী শিল্পকলা ও ক্যালিগ্রাফি*’, *মাসিক ছাত্রসংবাদ*, সিরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ২০০৩, পৃ.৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনায় পাঠিয়ে দিতেন। যার প্রতিটি কপির মূল্য ছিল পাঁচ হাজার টাকা।[৪৫] তাঁর লিখিত কুরআন শরীফের কপি সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদে সংরক্ষিত আছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল লিপি চর্চার অবনতি ঘটে। এতদসত্ত্বেও ফারুখ সিয়ারের আমলে হাজী মিনদার ও মির্জা খাতিম বেগ ক্যালিগ্রাফি চর্চা করে খ্যাতি লাভ করেন।[৪৬] মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে যে সকল ক্যালিগ্রাফার খ্যাতি লাভ করেন তাদের মধ্যে মুহাম্মদ আফজাল আল-হুসাইনী, মুহাম্মদ আসলাম, মুহাম্মদ সাদিক, আব্দুল্লাহ আল-হুসাইনী অন্যতম। শাহ আলমের শাসনামলে নাসতা'লিক রীতিতে কুরআন শরীফের অসংখ্য কপি করা হয়। তাঁর সময়ে ক্যালিগ্রাফারগণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। তাদের মধ্যে কাজী ইসমতুল্লাহ, তদীয় ভ্রাতা ফয়জুল্লাহ, পুত্র ইবাদুল্লাহ, মুহাম্মদ আতা (মুরাসসা রকম), সৈয়দ ইজাজ (রওশন কলম), মুহাম্মদ আলী ও হাফিজ ইব্রাহীম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় আকবরের সময় যারা সুনাম অর্জন করেন তারা হলেন- মীর মুহাম্মদ হুমায়ুন, মীর জয়নুল আবেদীন, মীর মাহদী, মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ, মির্জা ইবাদ আল্লাহ বেগ (জামরুবাদ রকম) ও মীর পাঞ্জাকাশ প্রমুখ।

সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর একাধারে একজন কবি, শিল্পী ও ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। তাঁর ক্যালিগ্রাফির নমুনা দিল্লির ফরাশখানায় (জীনাত মহল) এবং সিরকাওয়ালা মহল্লার হাকীম আহসান উল্লাহ খানের হাম্মামের শিলালিপিতে দেখা যায়। তাঁর শাসনামলে যে সকল ক্যালিগ্রাফার বাদশাহ্র দরবারকে অলঙ্কৃত করেন তারা হলেন- মুহাম্মদ জান, মীর ইমাদ আলী ও তদীয় পুত্র মীর জালালুদ্দীন ও সাইম আমির রিজভী। মুঘল দরবার ব্যতিত গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ক্যালিগ্রাফির চর্চা হয়। সেখানকার ক্যালিগ্রাফারগণ এক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। যেমন- দাক্ষিণাত্যের আদিল শাহ ও মীর খলিলুল্লাহ প্রমুখ।[৪৭] মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার পর বহু বিখ্যাত আলিম ও গুণীজন লাখনৌতে চলে যান। তখন লাখনৌ শিল্প, সাহিত্য ও

---

[৪৫] *মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখনশিল্প*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩৬।

[৪৬] *Islamic Calligraphy in the Medieval India,* ibid, p.92.

[৪৭] *মুসলিম লিপিকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষ্টি কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হয় এবং এর পাঠ্যসূচিতে ক্যালিগ্রাফি অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

মুঘল আমলের প্রথম দিকে কুরআন, হাদীস ও ধর্মীয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলোতে নাসখী লিপির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। তাছাড়া মসজিদ ও কবরগাত্রের উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও এর ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। তবে মুঘল আমলের শেষে দিকে নাসখী লিপির ব্যবহার হ্রাস পায় এবং নাসতা'লিক লিপিশেলী এর স্থান দখল করে নেয়। সরকারী চিঠিপত্র ও ফার্সী ভাষায় কোন কিছু লেখার ক্ষেত্রে নীচে ও উভয় পার্শ্বে টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে এ লিপি ব্যবহার করতেন। এ ধরনের গ্রন্থাদির মধ্যে মুঘল আমলে লিখিত কুরআনের একটি অনুলিপি উল্লেখযোগ্য। এতে কুরআনের আয়াতগুলোর পৃষ্ঠার মাঝখানে ফার্সী লিপিতে এবং ফার্সী ভাষার টীকা-টিপ্পনীগুলো পৃষ্ঠার পাদদেশে নাসতা'লিক শৈলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৪৮]

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত কুরআনের একটি অনুলিপি মুঘল আমলে লিখিত নাসখী লিপির একটি উৎকৃষ্ট নমূনা। যা একাদশ হিজরী তথা সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা হয়েছে। সম্রাট আকবরের আমলে বাংলায় নাসতা'লিক লিপির বিকাশ ঘটে। জাতীয় জাদুঘরে সে আমলের ১৫৯১ সনে উৎকীর্ণ ৩টি লিখনশিল্প সংরক্ষিত রয়েছে। যাতে নাসতা'লিক লিপির প্রভাব রয়েছে। এরপর থেকে অধিকাংশ ক্যালিগ্রাফি এ লিপিশৈলীর অবলম্বনে লিখিত হয়। জাতীয় জাদুঘরে নাসতা'লিক লিপিশৈলীতে প্রসিদ্ধ সুলতান আলী মাশহাদীর ১৪৭৮ সালের লিখিত 'শাহ আল-রুবাইয়াত' এর একটি অনুলিপি এবং বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার মুহাম্মদ আলীর লিখিত 'মোখজানুল আসরার' গ্রন্থের আংশিক পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়।[৪৯]

---

[৪৮] 'আল-খাত্তুল 'আরাবী ওয়া আছারুল হাদারি', *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮২।
[৪৯] *বাংলায় বিভিন্ন আরবী লিখনশৈলীর ব্যবহার*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

নয়াদিল্লির রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালা ভারতীয় শিল্পকলা সংরক্ষণের এক বিশাল কোষাগার স্বরূপ। অতীব গুরুত্বপূর্ণও ইসলামী শিল্পকলার সংগ্রহ এতে সুরক্ষিত রয়েছে। যাতে রয়েছে বেশ ক'টি ভাষায় ও শৈলীতে লিখিত পাণ্ডুলিপি। এসবের উপজীব্য বিষয় যেমন বিপুল, তেমনি চিত্তাকর্ষক। পাণ্ডুলিপির উপজীব্য বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ, ক্যালিগ্রাফি ও ক্ষুদ্র চিত্রকলা ইত্যাদি। এ সংগ্রহশালায় ইসলামিক শিল্প সামগ্রীগুলো খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয়েছে। প্রথম সংগ্রহটি হলো- চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) কে উৎসর্গীকৃত কুরআন শরীফের একটি অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি। তারপর আছে অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে লিখিত অনুরূপ সব পাণ্ডুলিপি। পার্চমেন্ট কাগজে লিখিত এসব পাণ্ডুলিপি ভারতে মুসলমান শাসনকালে আমদানি হয়েছিল।

অনেক পাণ্ডুলিপি বিদেশী পণ্ডিত, কবি, ব্যবসায়ী প্রভৃতির উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্ত। যারা বিভিন্ন কারণে স্বদেশ পরিত্যাগ করে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। এসবের মধ্যে রয়েছে পার্চমেন্ট, রেশম, কাগজ, আর্ট কাগজ ও হাতের তৈরি কাগজে লিখিত বেশ কিছু চিত্র বা চিত্রবিহীন পাণ্ডুলিপি। এসব পাণ্ডুলিপি বাগদাদ, বুখারা, সমরখন্দ, শিরাজ, হিরাত, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন শিল্পীদের সৃষ্টি। যেমন- বুখারা স্কুলের 'সুবহাতুল আবরার', ফেরদৌসি স্কুলের 'শাহনামা' ও কুরআন শরীফের কয়েকটি প্রতিলিপি ইত্যাদি। এভাবে অসংখ্য পাণ্ডুলিপি আছে, যা ভারতে প্রবাসকালে অভারতীয় পণ্ডিত ও শিল্পী দ্বারা লিখিত ও চিত্রিত হয়েছিল। যেমন- 'কালিলা ও দিমনা' (১৪৯২ খ্রি.), 'বুস্তা' (১৫০১-১৫০২ খ্রি.), নিযামীর 'খামসা' (১৪৭২ খ্রি.) ইত্যাদি। সুলতানী ও মুঘল আমলে ভারতীয় পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও শিল্পী দ্বারা লিখিত ও চিত্রিত ইসলামী শিল্পকলা সম্পর্কিত কয়েক হাজার পাণ্ডুলিপি দিল্লির রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালায় রয়েছে। যেমন- 'কুল্লিয়াত-ই-আমির খসরু', 'ফাওয়াইদ-ই-কুতুবশাহী', তজুক-ই-আসিফিয়া' ও 'আইন-ই-আকবরী' ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে মুঘল আমলকে শিল্প ও সাহিত্য প্রসারের স্বর্ণযুগ বলা হয়। মুঘল সম্রাটদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় সম্রাট থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্যকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। ফলে এ যুগে ইসলামী শিল্পকলা ও সাহিত্য শীর্ষস্থানে আরোহন করে। মূলত মুঘলদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক প্রচুর সংখ্যক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল। 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ শৈল্পিক ঐতিহ্য শেষ মুঘল সম্রাট সাহিত্যিক স্বয়ং বাহাদুর শাহ জাফরের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৫০]

ক্যালিগ্রাফি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের গৌরবময় অবদান রয়েছে। তখনকার সময়ে ক্যালিগ্রাফি স্মৃতিসৌধ বা জাদুঘরের দেয়াল, মসজিদ, মাদরাসা ও সমাধিসৌধের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বিবর্তনে এসব ক্যালিগ্রাফি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। বাংলায় আগেকার দিনে ক্যালিগ্রাফি আঁকা হতো অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও মাধুর্যপূর্ণভাবে। এক সময়ের বাংলাদেশের অংশ বিহারের বারী দরগায় প্রাচীন হস্তলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। দিল্লির কুতুব মিনার এবং কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের ক্যালিগ্রাফির সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ১২৪৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে দিকে দিনাজপুরের একটি মসজিদে ক্যালিগ্রাফির সন্ধান পাওয়া যায়। যা ছিল তুঘরা লিপিতে লিখিত। ১৩০১ খ্রিস্টাব্দে সালে বিহারে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে নাসখী লিপির উপস্থিতি দেখা যায়। ১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ সালের মধ্যে আলিবর্দী খাঁর শাসনামলে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিপাটি ও শিল্প-সংস্কৃতিমনা। তারপর তাঁর পৌত্র সিরাজুদ্দৌলার শাসনামলে ক্যালিগ্রাফি শিল্প নবজীবন লাভ করে। এভাবে সময়ের বিবর্তনে বাংলা মুলুকে ক্যালিগ্রাফি শিল্প বিকাশ ও উন্নতি লাভ করে। এ সময় বাংলা ক্যালিগ্রাফিতে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৫১]

---

[৫০] *ক্যাটালগ: ভারতীয় ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শনী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৮।
[৫১] আসাদ সায়েম, 'দক্ষিণএশিয়া, ভারতবর্ষ এবং বাংলায় ক্যালিগ্রাফির বিকাশ', *দৈনিক আমার দেশ*, ২৯ জুন-২০১২, পৃ.৭।

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ শতাব্দীর শতকের মধ্যভাগে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন পারস্য থেকে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী বিহ্যাদের শিষ্য মীর সাঈদ আলী এবং খাজা আব্দুস সামাদ নামক দু'জন শিল্পীকে ভারতে নিয়ে আসেন। তারা ভারতে এসে মিনিয়েচার এবং ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। এ সময় মসজিদ ও ইমারতের দেয়াল ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থের অলঙ্করণ কাজে ক্যালিগ্রাফি ব্যবহৃত হতে থাকে। 'বাবরনামা' এমনই একটি গ্রন্থ যাতে ফুল, লতা-পাতা ও পাখিসহ ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় ঘটেছে। ভারতের বিখ্যাত তাজমহলের গায়ে আব্দুল হক সিরাজী নামক এক শিল্পী কুরআনের বর্ণবিন্যাসের মাধ্যমে অলঙ্করণের কাজ করেছেন। মূলত ভারতে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ব্যাপক চর্চা ও প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাটদের সক্রিয় সহযোগিতার কাজ করছে। মুঘল সম্রাটগণ নিজেরাও ক্যালিগ্রাফি চর্চা করতেন। মধ্য ভারতসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ক্যালিগ্রাফি চর্চা কেন্দ্রগুলো ক্যালিগ্রাফি শিল্পের জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দিল্লির গালিব একাডেমি বোম্বের আঞ্জুমান-ই-ইসলাম উর্দূ রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং হায়দ্রাবাদের ইদারাতুল মুয়াদিফ উল্লেখযোগ্য।[৫২]

মধ্যযুগে বাংলার মুসলিম শাসনামলে মুসলমানগণ বাংলা ভাষায় ও বাংলা লিপিরীতি অনুসরণের দিকে ঝুকে পড়ে। সে সময়ে বহু বাংলা কাব্য ও পাণ্ডুলিপি আরবী লিপিরীতি অবলম্বনে লিপিবদ্ধকরা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে এর কিছু নমুনা আজও সংরক্ষিত রয়েছে। তবে পরবর্তীকালে আরবী ভাষার প্রতি শাসকবর্গের আগ্রহ হ্রাস পাওয়ায় বাংলাভাষী সাধারণ মুসলমানরাও বাংলা ভাষায় আরবী লিপিরীতির অনুসরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে।[৫৩]

বর্তমান ইরান, পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মিসর ও সুদানসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পকলার একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে গণ্য এবং কম-বেশি প্রতিষ্ঠিত। ক্যালিগ্রাফি চর্চার দেশ হিসেবে ইরান অগ্রসর ভূমিকা পালন করছে। ক্যালিগ্রাফির বিষয় নির্বাচনে ইরানের

[৫২] ড. আব্দুস সাত্তার, *শৈল্পিক, ক্যালিগ্রাফি শিল্প ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, (ঢাকা: জানুয়ারি-২০০৬), পৃ.৫৪।
[৫৩] 'আল-খাত্তুল 'আরাবী ওয়া আছারুল হাদারি', *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। আল-কুরআনের বাণী, আল-হাদীসের উদ্ধৃতি ছাড়াও তাদের রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত অনেকগুলো মহাকাব্য। হাফিজ, রুমী, সাদী, ফেরদৌসী, খৈয়াম ও আক্তারের মহাপঙ্ক্তিমালা এখনও পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফারদের আকৃষ্ট করে।[৫৪]

ইরান, ভারত, তুরস্ক ও মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশে কাগজের আকার বড় হওয়ায় কুরআনের আরবী লিখন, তার নীচে মন্তব্য এবং তার নীচে নিজ নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে থাকেন। ফলে কুরআন বুঝতে সুবিধা হয়। সবচেয়ে বড় আকারের পৃষ্ঠার হস্তলিখিত কুরআন শরীফের আকার হচ্ছে ১১৭.৯ সেন্টিমিটার। ভারতের বরোদা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে একখানা কুরআন শরীফ সংরক্ষিত আছে। যার আকার ৫ফুটX৪ফুট। এটা কাগজে লিখে কাপড়ের উপর লাগিয়ে সেলাই করা। এতে অনুবাদ ও মন্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।[৫৫] তাছাড়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের কোন কোন মুসলিম ও অমুসলিম শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফি চর্চা করেছেন এবং আজও করে চলেছেন। যার অন্যতম রাজশাহীর শ্রী বাচ্চুধর পাল। তিনি বেশ কয়েকটি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। মালয়েশিয়াতেও তাঁর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়েছে।[৫৬]

---

[৫৪] সৈয়দ আলী আহসান, *শৈল্পিক ৬৯*, (ঢাকা: জানুয়ারি-২০০৬), পৃ.২৩।

[৫৫] ড. আবদুর রহমান, *আরবী লিপি ও ইসলামী হস্তলিপিকলা*, পৃ.৬২।

[৫৬] ড. আব্দুস সাত্তার, *শৈল্পিক, ক্যালিগ্রাফি শিল্প ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, (ঢাকা: জানুয়ারি-২০০৬), পৃ.৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রভাবঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের সংস্কৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সৃজনশীলতা ও শিল্পসৌন্দর্য
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহিঃপ্রকাশ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪. ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রভাবঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশের সংস্কৃতি

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন-[১] لقد خلقنا اللانسان فى احسن تقويم অর্থ- নিশ্চয়ই আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। মানুষকে বাহ্যিক ও দৈহিক গঠনের সাথে সাথে তার হৃদয়ের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার অনুভূতি প্রদান করা হয়েছে। যা যুগে যুগে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে মননশীলতার পরিচয় দেয়। তাই যে সমাজের লোকজন শিল্পকলায় যতবেশি অগ্রসর সে সমাজ ততবেশি সভ্য ও সংস্কৃতিবান হিসেবে বিবেচিত। শিল্পকলার বিকাশ ও উৎকর্ষতার মাত্রা বিচার করে সে জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা যায়। ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এমনই এক চিত্রকলা যা ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়ন লাভ করেছে। আধ্যাত্মিক জগতের ভ্রমণকারীগণ এক আল্লাহর ধ্যানমগ্নতায় এটিকে যাত্রা শুরুর মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কেননা একজন ক্যালিগ্রাফার দর্শকের হৃদয় ও মনকে আল্লাহর স্মরণ দিয়ে পূর্ণ করে দেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য।[২]

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির আড়ালে সঙ্গীতও লুকিয়ে আছে। বাহ্যিকভাবে লতানো-প্যাঁচানো আরবী লিপি, রেখা ও রঙের অপূর্ব বিন্যাস ও ছন্দময়তার কারণে প্রতিটি লিপিশিল্পই সঙ্গীতময়। আরবী লিপিশিল্পে আছে তিনটি শিল্পের সংমিশ্রণ। চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ও সঙ্গীত।[৩] জন্মগতভাবে মানুষ স্বপ্নবিলাসী ও কল্পনাপ্রবণ। তাই মানুষ যেমন স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। তেমনি বিভিন্ন বিষয় কল্পনা করতেও পছন্দ করে। স্বপ্নে ও কল্পনায় তারা অসাধ্য সাধন করে। তারা কল্পনার আকাশে উঁড়ে বেড়ায় ও উঁড়ে বেড়াতে পছন্দ করে। শিল্পতাত্ত্বিক এরিস্টটল মনে করেন, কাব্য ও সঙ্গীতের

---

[১] *আল-কুরআন*, সূরা আত-ত্বীন, আয়াত-৪।
[২] *ফোল্ডার: ইরানের ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এবং এর সমকালীন বৈশিষ্ট্যসমূহ*, কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইরানী দূতাবাস, পৃ.১।
[৩] সবিহ-উল আলম, *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি), পৃ.৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে মানুষের মনের অমূর্ত অবস্থাকে মূর্ত প্রকৃতি দেয়া সম্ভব। তাঁর মতে- সঙ্গীতের সুর মানুষের মনে দোলা দেয় বলেই আনন্দ উৎপন্ন হয়। হৃদয় দোলানোর এ বিষয়টি শিল্পের সমঝদার ও পণ্ডিতগণের অনেকেই সমর্থন করেছেন। এ অভিমত প্রায় সব শিল্পতাত্ত্বিকের। অতএব শিল্পের সাথে যে সুন্দরের ও আনন্দের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান, সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই শিল্পের প্রতি তাদের এত বেশি আসক্তি। তবে তাদের শিল্প-চেতনা যদি হয় নেতিবাচক, তাহলে তা কোন দেশ বা জাতির জন্য হয় মারাত্মক ক্ষতিকর। অপরপক্ষে তা যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে তা হয় কল্যাণকর। সুতরাং এ কল্যাণকর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ইসলামী চারু ও কারু শিল্পের ব্যাপক বিস্তৃতির প্রয়োজন। কারণ চারু ও কারু শিল্পে ইসলামের ছোঁয়া থাকলে মানুষ অশ্লীলতা, এমনকি প্রচ্ছন্ন শিরক থেকেও রক্ষা পায়। তাই বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে ইসলামী আবহ সৃষ্টির লক্ষে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির চর্চা চলছে। যা শুধু ইসলামী সংস্কৃতিতেই নয় বরং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাব ফেলছে। নিম্নে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

৪.১. ইসলামী ক্যালিগ্রাফির সৃজনশীলতা ও শিল্পসৌন্দর্য

৪.১.১ সৃষ্টির আনন্দ ও প্রভাব

শিল্প একজন দর্শককে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনিভাবে ঐ শিল্পীকেও আনন্দ দেয়। একজন শিল্পী যখন তাঁর হৃদয়ে লালিত কোন বিষয়কে বাস্তবে তুলে ধরতে চান। তখন তিনি তাঁর নানা উপকরণের সাহায্যে তাকে প্রকাশ করার প্রক্রিয়ায় ডুবে থাকেন। একজন কবি কিংবা লেখক খাতা-কলম, একজন সঙ্গীতশিল্পী বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে যেমন তাঁর শিল্পের প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশ করতে চান, ঠিক তেমনি একজন চিত্রশিল্পী কিংবা ভাস্করও তাঁর রং-তুলি, ক্যানভাস কিংবা মাটি, কাঠ, পাথর প্রভৃতির সাহায্যে স্বার্থক শিল্পের রূপ দিতে চান। ফলে ক্যানভাস প্রস্তুতকরণ, প্রয়োজনীয় রং নির্বাচন, ক্যানভাসে ড্রইং ও ফর্মের সংযোজন, রঙের সাহায্যে ড্রইং ও ফর্মের চারিত্রিক বৈশিষ্টের পরিস্ফুটন, পরিস্ফুটিত বিষয়কে রূপ ও রসে অনন্য স্বভাব ও অমরত্ব দান এবং মাটি, কাঠ কিংবা পাথরের সাহায্যে কল্পনা রাজ্যের বিষয়কে বাস্তবে আনয়নের কাজ সম্পন্ন করেন। সব প্রক্রিয়া শেষে শিল্পী যখন তাঁর কল্পনার সার্থক রূপ দিতে সক্ষম হন তখন তিনি নব সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেন। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে শিল্পী ও শিল্পের সৌন্দর্য বিষয়ক আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে অসমর্থ হন, তাহলে তিনি শিল্প সৃষ্টির সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন। যেমনটি হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ক্ষেত্রে। তিনি তাঁর অমর সৃষ্টি মোনালিসা চিত্রটি বহু সময় ধরে এঁকেও মনে করেছেন যে, চিত্রটির যথাযথ রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি।[৪]

---

[৪] ড. আব্দুস সাত্তার, 'শিল্প ও আনন্দ', দৈনিক *নয়াদিগন্ত*, ঈদ সংখ্যা-০৯, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.৩৬৫-৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

একজন ক্যালিগ্রাফার যখন হরফগুলোকে সাজাতে থাকেন, তখন তাকে হরফগুলোর অনুপাত, অবস্থান ও বহমানতা লক্ষ্য করে লিখনপ্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়। প্রতিটি বর্ণলিপির প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক ও সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কে তাকে খেয়াল রাখতে হয়। লিপিবদ্ধ হরফগুলোকে মনে হয় যেন সঙ্গীতের স্বরগ্রামের রেখাঙ্কিত সুর উৎসারিত হবে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পিয়ানোর নোটেশন যেমন একটি সুরের চরিতার্থতাকে আকৃতিতে পর্যবসিত করে, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের মধ্যেও ঠিক তেমনি পবিত্র আল-কুরআনের ধ্বনিমূর্চ্ছনাও যেন অন্তর্লীন হয়ে থাকে।[৫] ক্যালিগ্রাফারগণ নিবিষ্টচিত্তে রেখার গতিময়তা, অনুপাত ও অবস্থান অনুধাবন করেন। যাতে তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজনীয় ছন্দের সৃষ্টি করতে পারেন। খাঁড়া অথবা বক্রাকার রেখার লীলায়িত ভারসাম্য মানসিক কল্পনার মত মনে হয়। তাই একজন দক্ষ চিত্রকর একজন নিপুণ ক্যালিগ্রাফাররও বটে। এ জন্য আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, পারস্য চিত্রকরগণ রেখা দ্বারা পরিমিত ভঙ্গিতে যা কিছু করেছেন, তা পশ্চিমা দেশীয় ইউরোপীয় শিল্পীদের নিকট ঈর্ষার বস্তু হিসেবে গণ্য।[৬]

অষ্টম শতাব্দীতে ক্যালিগ্রাফির সাথে ফুল ও লতা-পাতার মন্ডনধর্মী নক্‌শার সমন্বয় করে শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তারা মসজিদ, মিম্বার, মিহরাব ও পবিত্র কুরআন অলঙ্করণে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। পরবর্তীতে শিল্পীরা এ ক্যালিগ্রাফিকে তাদের ক্যানভাসে শিল্পের বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যারা ক্যালিগ্রাফি করতে জানেন না তারাও ক্যালিগ্রাফির আদলকে তাদের ছবিতে উপস্থাপন করতে প্রয়াস চালিয়েছেন। যেমন- পল ক্লী ও কান্দিনাসকি প্রমুখ।[৭]

এজন্য এম. এ গফুর বলেন- ‘Arabic script, not only influenced the Christian Europe but also the Buddhist Asia. Like the coins of Offa, the Christian king of Mercia,

---

[৫] ড. মো. রফিকুল আলম, ‘ক্যালিগ্রাফি ও আজকের ভাবনা’, *ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: জানুয়ারি-২০০৬), পৃ.১২।

[৬] S A Rahman, *Armughan-e-Ilmiba Khidmat,* (Lahore: 1995), 42.

[৭] *ক্যালিগ্রাফ আর্ট*, ক্যালিগ্রাফি সোসাইটি বাংলাদেশ, ব.১, স.১, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

Arabic script was also found inscribed on the coins of a Buddhist king of Arakan.'[৮] এবং শাহ্ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ বলেন- 'The place of Arabic script in Islamic civilization is very conspicuous. It has been the vehicle of the religion Islam and Quran. It is the most honoured script throughout the Islamic world even today.'[৯]

অতি সাধারণ অথবা জটিল অলঙ্করণের নক্‌শা যাই হোক না কেন, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ম্যাজিকের মত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটি অলঙ্করণে অতি সাবলীল লিপিকলার মোটিফ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে। স্কট উল্লেখ করেন- 'খ্রিস্টানদের অজান্তেই কুফী লিপিশৈলীর মাধ্যমে কুরআনের বাণী গির্জার প্রাচীরে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। যেমন- সেন্ট পিটারের প্রসিদ্ধ প্রাসিল গীর্জায় সুউচ্চ ফটকে আরবী লিপির কালিমা শোভিত বাণী খোদাই করা হয়েছে। এটি আরবী লিপির এমন এক শৈল্পিক অভিব্যক্তি, যা শিল্পীকে নিজের অজান্তেই আন্দোলিত করেছে।'[১০]

চতুর্দশ শতাব্দীর রেনেসাঁ চিত্রকর জিওট্টো (Giotto) ভেনিজিওনোর চিত্রকর্মে কুফী রীতিতে ইসলামী নক্‌শা দেখা যায়। এমনকি বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিল্পী পল ক্লী, যিনি বহুদিন তিউনিসিয়ায় অবস্থান করেন। তাঁর 'হারবার ইন ব্লুম' (Harbour in Bloom) শীর্ষক চিত্রে 'মুহাম্মদ' শব্দটি কুফী লিপিতে অঙ্কন করেন। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশ অন্যান্য লিপিকলার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নয়নাভিরাম না হলে বিভিন্ন অমুসলিম দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের স্থাপত্য অলঙ্করণে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এত মর্যাদাপূর্ণ স্থান পেত না ।

মূর্ত শিল্পকলায় একজন মানুষকে দেখে তার ছবি আঁকা বা কোন মূর্তিকে দেখে তার অনুকরণে একটি মূর্তি তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ হতে হলে নিজস্ব উদ্ভাবন ও কৌশলের প্রয়োগ

---

[৮] M A Ghafoor, *The Calligraphers of Thatta* (Karachi: 1968), p.38.
[৯] Shah Muhammad Shafiqullah, *Calligraphic Art in Sultanate Archetecture* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2012), p.6.
[১০] S P Scott, *History of the Moorish empire in Europe*, v.111, ch.29.

Dhaka University Institutional Repository

অপরিহার্য। এ ব্যাপারে মহান স্রষ্টা আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা হৃদয়াঙ্গম করা সহজ হবে। তিনি একই ধরনের উপাদান তথা হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব মানুষের মাঝে সংযোজন করার পরও প্রত্যেকটি মানুষকে ভিন্ন ভিন্নভাবে চেনা যায়। পৃথিবীর ছয় শত কোটি মানুষের কারোর সাথে কারোর মিল নেই। এখানেই স্বকীয় উদ্ভাবনার এবং সৃষ্টির শিল্পরূপের নিগুঢ় রহস্য ও দর্শন বিদ্যমান। একজন শিল্পীকেও অনুরূপ তার শিল্পকর্মে নতুনত্ব ও স্বকীয়তা আনতে হয়। কারণ সুন্দর ও স্বকীয় শিল্পকর্ম সৃষ্টিতেই একজন শিল্পীর সার্থকতা। শিল্পীকে হরফের মধ্যে নান্দনিক সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। হরফ বিন্যাসের ক্ষেত্রে অধিকমাত্রায় সৃজনশীল হতে হয়। আর এক্ষেত্রে অনুকরণীয় পথ পরিহার করতে হয়। সর্বোপরি হরফ দ্বারা সৃষ্ট চিত্রকে নান্দনিক রসে সমৃদ্ধ করতে হয়। অন্যকে অনুসরণ করে বা অন্য হরফের সৃষ্ট শিল্পের অনুকরণে কাজ করা যত সহজ। নিজে সৃষ্টি করা ঠিক ততটাই কঠিন। ক্যালিগ্রাফারদেরকে এ কঠিন কাজটিই করতে হয়।[১১]

সৃজনশীলতা মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশ। চারুকলাও এ সৃজনশীলতার বাহন হিসেবে কাজ করে এবং মানব সমাজের নিরস কাঠামোকে নান্দনিক অনুভূতির রঙের প্রলেপ দিয়ে ব্যঞ্জনময় ও অর্থবহ করে তুলে। এভাবে চারু ও কারুকলা মানব জীবনের সুশৃঙ্খল ও লক্ষ্য অভিযাত্রায় প্রতিবন্ধক নয় বরং আবশ্যক অনুষঙ্গ ও সহযোগী হয়ে উঠে।[১২] এজন্য ফিলিপ ব্যামব্রো বলেন- 'The word of God together with the hand of man combined to create perhaps the greatest examples of calligraphy in the history of mankind. The explosive artistic energy created by this new partnership flowed throghout the world of Islam.'[১৩] রেনেসাঁপূর্ব সময় থেকে পৃথিবীর শিল্পকলায় ধর্মীয় অনুষঙ্গের প্রবল আধিপত্য

---

[১১] মিসবাহ আমীন কামাল, *শিল্পের ভাবনা* (ঢাকা: মজিদ পাবলিকেশন্স-২০০৫), পৃ.৬৭।

[১২] *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

[১৩] Philip Bambrough, *Treaseres of Islam* (New York: 1977), p.24.

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান ছিল। ফ্রা এঞ্জেলিকো এবং লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি থেকে শুরু করে আজকের মকবুল ফিদা হুসেন পর্যন্ত সকল মহৎ শিল্পীই চিত্রকলার সাথে ধর্মের একটা সংশ্লিষ্টতা নির্ণেয় করে আসছেন।[১৪]

শুধু তাই নয় ইউরোপ, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের স্থাপত্য অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় আরবী হস্তলিখন শিল্প প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রফেসর লেথাবী মনে করেন, ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবীর কোন কোন অংশের অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় মুসলিম হস্তলিখন শিল্পের অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। অতএব ডেকোরেটিভ আর্ট হিসেবে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর পারেস ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান তাঁর Islamic Calligraphi in the medieval India গ্রন্থে বলেছেন- 'The nature of Arabic script is such that it provides the calligraphers with squares, circles, ovals, loops, entwining and interlacing shafts adaptable to almost any design or graceful curvature.'[১৫] আর তাই ইসলামী ক্যালিগ্রাফির এত ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ সম্ভব হয়েছে।

৪.১.২ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ

লিপিকলা তথা ক্যালিগ্রাফি শিল্পকলার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশেষত ইসলামী শিল্পকলা তথা ইসলামী ক্যালিগ্রাফি একদিকে যেমন জাগতিক দিক থেকে নান্দনিক ও হৃদয়ে অবেগে পরিপূর্ণ। তেমনি এ শিল্প দর্শনে আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ভাবনার নির্যাস এবং সৌন্দর্য-সুধা পানের সাথে পবিত্র ও পূণ্যানুভূতি হৃদয়কে আবিষ্ট করে। শিল্পীদের হাত দিয়ে ক্যানভাসে বর্ণিল হয়ে উঠে এর অন্তর্নিহিত ব্যাঞ্জনা। নিজস্ব পরিমন্ডলে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয় হরফগুলো। ফলে দক্ষতা ও নিপুণ কুশলতা যেমন প্রতিভাত হয়ে উঠে। অলৌকিক দ্যোতনাও তেমনি অন্তকরণকে ঝংকৃত করে। ফলে ক্যালিগ্রাফারদের শিল্পকর্মে বিভিন্ন হরফের সুষম প্রয়োগ, দর্শন, চিন্তা ও নিজস্বধারার উপস্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

---

[১৪] *ক্যাটালগ: বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী*, পৃ.৩।

[১৫] *Islamic Calligraphy in the Medieval India*, Ibid, p.5.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে নতুন এক সভ্যতার জন্ম হয়। যা পৃথিবীর জন্য আশির্বাদ স্বরূপ। এই একত্ববাদ বিশ্বাসীদের মধ্যে যে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাই ইসলামী সংস্কৃতি। একত্ববাদে বিশ্বাসীদের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্রোধ সংযত করা এবং অপরাধীদের ক্ষমা করা শেখায়। মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব, ভালবাসা, ব্যবহার ও সম্প্রীতি শিক্ষা দেয়। জীবনকে সম্মানিত করে তুলে, অনাদর্শবাদীকে আদর্শবাদী, মুর্খ ও অজ্ঞকে বিজ্ঞ এবং সাহসহীন মানুষকে সাহসী করে তুলে। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন- Calligraphy is the Art of penmenship, inspired by devine will, It is now a global Art practical by eminent and devoted calligraphers throughout the muslim world.[১৬] অর্থাৎ ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে হস্তলিপিকলা যা ভালকে উৎসাহিত করে। এটি বর্তমানে একটি বৈশ্বিক শিল্পকলা যা মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত ও উৎসর্গীকৃত ক্যালিগ্রাফারগণ অনুশীলন করছেন।

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে প্রবাহমান ঝর্ণার মত প্রাণোচ্ছল ও সদা বিকাশমান মনোমুগ্ধকর হরফমালা। ইসলামী মননের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী শিল্পকৌশল আরবী ভাষায় নির্মিত ক্যালিগ্রাফি। আরবী হরফের বিভিন্ন ধরনের উচ্চাঙ্গ রীতি-কৌশল শিল্পীকে তাঁর শিল্পকর্মে এক সীমাহীন সম্ভাবনা প্রদান করে। ইসলামী ক্যালিগ্রাফির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এর একটি শক্তিশালী অলঙ্করণ কলা রয়েছে এবং হরফের মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর বিমূর্ত লিপিকলার প্রবাহমানতা। ইসলামী ক্যালিগ্রাফির স্বাভাবিক বা নমনীয় চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য তরঙ্গমালার মত পুনরাবৃত্তি বা রিপিটেশন প্রয়োগবিধি এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলামী ক্যালিগ্রাফি তার Aethetic Sence বা সৌন্দর্য দর্শন বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও সার্বভৌম।

৪.১.৩ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির শিল্পসৌন্দর্য

---

[১৬] *আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি একজন সুদক্ষ শিল্পীর আবিষ্কার এবং তাঁর ধ্যান-ধারণা প্রকাশের একটি বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল। এটি তাঁর একটি জীবন্ত প্রতীক। যদিও সময়ের পরিবর্তনে ক্যালিগ্রাফির রীতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়, তবুও এর মধ্যে এমন কতগুলো মৌলিক উপাদান বিদ্যমান। যা সাধারণ দর্শকগণও সেগুলোকে চিহ্নিত করতে পারে। এভাবে ক্যালিগ্রাফারগণ জনসাধারণের মাঝে তাদের লিপিশৈলীর বিকাশ অনুধাবন করেন।[১৭] এভাবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়- নারী-পুরুষ সবাই হাটতে পারে। কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই সুরুচিপূর্ণ হাটতে পারে। তেমনি প্রায় সবাই লিখতে পারে। কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই তার লিখনীকে সৌন্দর্যময় করে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

ক্যালিগ্রাফির এ জীবন্ত মাধ্যমের প্রতি একজন ক্যালিগ্রাফার সর্বদা নিষ্ঠাবান থাকেন। তিনি লিপিশৈলীর পরিবর্তনের সম্ভাবনাগুলো বিবেচনা করেন এবং পাঠকদের নিকট সহজবোধ্য করে তোলার নিমিত্তে নানাধরনের রীতিকৌশল উদ্ভাবন করেন। ক্যালিগ্রাফিতে শিরঃকোণকে বক্রাকারে পরিবর্তন করা হয় এবং খাঁড়া দণ্ডগুলোকে হাতের স্বাভাবিক ও সাবলীল আঁচড়ের দ্বারা প্রাণবন্ত করা হয়। হরফগুলোর স্বাভাবিক আকৃতি নষ্ট না করে লিপিকলাকে সহজতর ও বোধগম্য করা হয়। যাতে তা পাঠকের নিকট সুন্দর মনে হয়। রুক্ষ ও রুচিহীন লিপি থেকে সুন্দর, সাবলীল ও সহজতর লিপিশৈলীর বিবর্তনে লিপিকারদের খাঁড়া ও বক্রাকার রেখানুপাতের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। হরফের সঠিক গঠন ও বর্ণশুদ্ধি ব্যাহত না করে হরফের অনুপাত পরিবর্তন করে ক্যালিগ্রাফারগণ নতুন নতুন লিপিশৈলী উদ্ভাবন করেন। শৈল্পিক আঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্নভাবে নিরীক্ষা করে থাকেন। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের লিপিশৈলীর উদ্ভব হয়।

---

[১৭] *মুসলিম লিপিকলা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৪.২ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বহিঃপ্রকাশ

৪.২.১ সত্য ও সুন্দরের পথ প্রদর্শক

রাসূল (সা.) বলেছেন, الخط الحسن يزيد الحق وضوحا-[১৮] অর্থ- উত্তম নজরকারা হস্তলিখন সত্যের উজ্জ্বলতাকে বাড়িয়ে দেয়। ক্যালিগ্রাফি বা যে কোন শিল্পকলা শুধু সাজ-সজ্জার উপকরণ নয়। বরং এটি সত্য, সুন্দর ও স্বচ্ছতার বহিঃপ্রকাশ। সঠিক ও আলোর পথের দিশারী। অসত্যকে সত্য, অসুন্দরকে প্রাণবন্ত, আদর্শহীনকে আদর্শবান বানানো, নির্জীব ও অলস মানুষকে নির্ভীক ও সাহসী করে তোলা শিল্পীদের কাজ। তারা তাদের তুলির বলিষ্ঠ রেখায় ছড়িয়ে দিতে পারেন সঠিক পথের চেতনা ও বিশ্বাসের অনুপম ম্যাসেজ। যারা ক্যালিগ্রাফিকে বিষয়বস্তু করে থাকেন তারা হলেন অনিন্দ্য সুন্দরের সাধক, ধারক, বাহক ও ঈর্ষণীয় সমাজের সদস্য। তারা নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে জাতিকে অগ্রগতি, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করেন। তারা

---

[১৮] মুসনাদে ফেরদৌস, *দায়লামী শরীফ*

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সংঘাত, সন্ত্রাস, অসভ্যতা, বিশৃঙ্খলা, অন্যায় ও অপশক্তির বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার। কারও হিংসা-বিদ্বেষ, কোন প্রকার লোভ-লালসা কিংবা কোন মহলের প্ররোচনা সত্যিকার একজন ক্যালিগ্রাফারকে আদর্শচ্যুত করতে পারে না।

ক্যালিগ্রাফারদের মর্যাদা জাতির সর্বোচ্চ শিখরে। সততা, বিশ্বস্ততা ও তাদের মৌলিক অবদান তাদের এ অবস্থানকে আরো সুসংহত করে। তারা শুধু দেশ নয়, মানব জাতির সম্পদ। এরা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে আলোকিত করে। জাতিকে সত্যের পথ দেখায়। যে শিল্পীর সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক যত গভীর সে শিল্পী তত সৎ ও স্বাধীন। কারণ তাদের ধারণা, শিল্প শিল্পের জন্য নয়। শিল্প জীবনের জন্য, সত্য ও সুন্দরের জন্য। শিল্প-সাহিত্য মানুষকে সুন্দর ও মানবিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে এবং সমাজে শান্তি ও আনন্দের প্রবাহ বইয়ে দেয়। আজকের দিনে বিশ্বময় একটি সমাজের এ পাগলা ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে মানুষ শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় মানবিক আচার আচরণে নিজেকে যত ব্যাপৃত রাখবে ততই মানব জাতির এক মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে। একজন ক্যালিগ্রাফার তার নিজস্ব হস্তলিপি শৈলী উদ্ভাবনে দৈহিক ও মানসিক রুচিবোধ ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেন। তাই তিনি তাঁর হস্তলিপি নিদর্শনকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও প্রকাশধর্মী করতে চান। যাতে সেগুলো বলিষ্ঠ, কঠোর ও কোমল, মাধুর্যপূর্ণ ও সুন্দর মনে হয়।[১৯]

বাংলাদেশ শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত। এ দেশের মানুষ স্বভাবতই ধর্মভীরু ও ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। ক্যালিগ্রাফিও অনুরূপ ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস, আবেগ ও অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর একটি নান্দনিক মাধ্যম। যা মানুষের চিন্তা চেতনার মাঝে ধর্মীয়ভাবে একটি গভীর আবহ সৃষ্টি করে। তাই ক্যালিগ্রাফির প্রতি এদেশের মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অনেক বেশি। এমনকি একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও আরবী লিপির এক অসামান্য পবিত্রতা উপলব্ধি করেন এবং কুরআনের আয়াত সম্বলিত ক্যালিগ্রাফিকে মর্যাদা দেন।

---

[১৯] ইব্রাহীম মন্ডল, ‘একুশ শতকের ক্যালিগ্রাফি: শিল্পীদের করণীয়’, *সাহিত্য-সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা-২০১১, (ঢাকা: সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র), পৃ.১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২.২ সুন্দর ও রুচিবোধের বহিঃপ্রকাশ

নান্দনিক ও হৃদয়গ্রাহী ক্যালিগ্রাফির চর্চার প্রতি মানুষের আকর্ষণ এবং এর সংগ্রহের প্রচলন অনেক রীতিসিদ্ধ। রুচিশীল ব্যক্তি মাত্রই তার অফিসে, চেম্বারে, বাসার ড্রইং রুমে এবং গ্রামাঞ্চলে কাচারি ঘরে এ নান্দনিক শিল্পকে সংগ্রহে রাখার রুচিবোধ লক্ষ্য করা যায়। কারণ রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী। শিল্পের স্বভাব হচ্ছে- আনন্দ উৎপাদন ও অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ। আর এ আনন্দের ধারা দু'ধরনের হতে পারে। একটি অনিষ্টকর বা অকল্যাণকর। অন্যটি সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক। যাকে আমরা বলতে পারি Arts for human sake বা মানবতার জন্য শিল্প। এ আনন্দের সাথে যখন নৈতিকতার সংযোগ ঘটে, তখনই তা হয়ে উঠে মহোত্তম শিল্প। বিশ্ব শিল্পের ইতিহাসে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এমনই এক শিল্প, যার রয়েছে একটি স্বতন্ত্র ধারা। বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা গ্রন্থে এনামুল হক বলেছেন- 'Islamic Art (Calligraphy) has indeed expended the horizon of civilization. A refined and hrythomical expression of a rich and inspiring aesthetics experience epitomics its spirit.'[২০] অর্থাৎ সভ্যতার বিস্তৃতিতে ইসলামী শিল্পকলার (ক্যালিগ্রাফি) প্রকৃত অবদান রয়েছে। এটি সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতার নির্যাসকে সমৃদ্ধ ও উৎসাহিত করার পরিশীলিত ও ছন্দায়িত অভিব্যক্তি।

সৌন্দর্য চর্চা মানুষের রুচিবোধ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। সমাজে সুন্দর জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ মানুষকে সৌন্দর্যের মাঝে বসবাস করতে, জীবজগতের সকল প্রাণী ও প্রকৃতির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে, মানুষকে উৎসাহিত করতে ও শিল্পীরা নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তারা রঙ-তুলির সাহায্যে সৌন্দর্যময় করে তোলার সাধনায় নিজেকে আমৃত্যু নিয়োজিত রাখেন এবং স্বপ্নময় সুন্দর সমাজ নির্মাণের স্বপ্নে বিভোর থাকেন। সুতরাং এমন একজন মানুষের পক্ষে সমাজের অকল্যাণ কামনা করা সম্ভব নয়। যে শিশুটি রঙ-তুলির সাহায্যে সুন্দর সুন্দর চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে তার প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেয়েছে, সে শিশুটির হৃদয়ে সৌন্দর্যের বিষয়টি

---

[২০] Islamic Art in Bangladesh- *Catalogue of special exhibition* , Ibid, p.13.k

Dhaka University Institutional Repository

দাগ কেটেছে। অতএব সে তার কর্মজীবনে যেখানেই থাকুক না কেন, যে কাজেই নিমগ্ন থাকুক না কেন, সে কখনও অসুন্দরের পথে, অকল্যাণের পথে পা বাড়াতে পারে না। সৌন্দর্যের বোধগুলো তাকে অসুন্দর ও অকল্যাণের পথ থেকে রক্ষা করবেই। এজন্য আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিল্প চর্চার বিষয়কে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।[২১]

৪.২.৩ বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে এক অনন্য ধারা

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পকলার অন্যতম চালিকাশক্তি। মহান আল্লাহ তা'আলা অপূর্ব সাজে সজ্জিত করেছেন সবুজ ঘাস, পত্র-পল্লব, বৃক্ষের শাখা ও বনাঞ্চলের প্রাণী ইত্যাদি। সবকিছুতেই আমরা তাঁর অনন্য ও অসাধারণ পরিপূর্ণতা দেখতে পাই। বিশ্বাসের নির্ভরতায় শিল্পীরা আল্লাহর এরূপ দক্ষতাকে অত্যন্ত অভিনিবেশ এবং আন্তরিকতার সাথে অবলোকন করেন। সৃষ্টির সকল বিমুগ্ধতাকে গ্রহণ করে শিল্পীরা তা রঙ ও রেখায় প্রকাশ করে থাকেন। ক্যালিগ্রাফি শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট শিল্পবোদ্ধা, গবেষক ও জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন- 'শিল্প প্রকরণ ও শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে হস্তলিখন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কোথাও শিল্পের সূত্রপাতে হস্তলিখনের অনুশীলন করতে হয়। আবার কোথাও হস্তলিখন শিল্প পূর্ণাঙ্গ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়।'[২২] জাপান, চীন ও কোরিয়াতে চিত্রকলায় হস্তক্ষেপ করার পূর্বে একজন শিক্ষার্থীকে হস্তলিখনের অনুশীলন অবশ্যই করতে হয়। শুধু তাই নয়, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'The beautiful writting in Arabic script was employed to enhance the apeal of the words of Quran which was cultivated by the muslim from the earliest times.'[২৩] অর্থাৎ কুরআনের শাব্দিক আবেদন বৃদ্ধির লক্ষে

---

[২১] জহিরুল হক, *শিল্পী ও শিল্প আন্দোলন* (ঢাকা: রূপেন প্রকাশন), পৃ.২৭।
[২২] *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৯।
[২৩] *Islamic Art in Bangladesh- Catalogue of special exhibition*, Ibid. p.13.

Dhaka University Institutional Repository

আরবী পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে সুন্দর হস্তলিপির জন্য নিয়োগ প্রদান করা হতো, যা পরবর্তীতে মুসলমানগণ আরো বিকশিত করেছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিকাশে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠা এসব শিল্পীদের প্রতি এদেশের মানুষের বিশেষত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের ভালবাসা রয়েছে। ক্যালিগ্রাফি শিল্পের সাথে জড়িত শিল্পীদের তালিকা দিন দিন দীর্ঘ হচ্ছে। যুক্ত হচ্ছে নতুন মুখ। গৃহাভ্যন্তরের সাজসজ্জার অন্যতম উপাদান হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ক্যালেন্ডারগুলো নারী কিংবা জীবজন্তুর ছবির পরিবর্তে ক্যালিগ্রাফি দখল করে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। জাতীয় সংসদ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ সরকারী ও বেসরকারী ভবনে ক্যালিগ্রাফিকর্ম দৃশ্যমান হয়। নগর সাজানোর কাজ ও রাস্তার পার্শ্বে দর্শনীয় স্থানে ক্যালিগ্রাফির ম্যুরাল সরকারীভাবে স্থাপনের মাধ্যমে এ শিল্পকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

আরবী হরফের চ্যাপ্টা, সমান্তরাল ও লম্বা প্রকৃতির হওয়ায় তা বিভিন্ন অলঙ্করণে মানিয়ে নেয়া যায়। তাছাড়া আরবী হরফের বৈচিত্রপূর্ণ লিখনশৈলী থাকায় শিল্পীদের অনেক সুবিধা রয়েছে। ফলে এর গুরুত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। যা ইউরোপের অমুসলিম শাসক ও শিল্পানুরাগীদের পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। এ শিল্প সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বাণীমালা নিজেদের মুদ্রা ও স্থাপত্যে উপস্থাপন করেছেন। যেমন অষ্টম শতাব্দীর খ্রিস্টান শাসক মার্সিয়া ওফ্ফা (৭৫৫-৫৯৬ খ্রি.) তার মুদ্রায় কুফী লিপিতে কালিমা উৎকীর্ণ করেন। একইভাবে নবম শতাব্দীতে ব্রোঞ্জ নির্মিত একটি আইরিশ ক্রুশের মাঝখানে কুফী লিপির ‘বিসমিল্লাহ’ উৎকীর্ণ হয়েছে। সাধু পিটারের গির্জার সুউচ্চ প্রবেশ পথের প্রাচীর গাত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস উৎকীর্ণ হয়েছে। মধ্যযুগে ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের স্থাপত্য অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রভূত প্রভাব রয়েছে। বই বাঁধাই ও বইয়ের প্রচ্ছদে নক্‌শা করার ব্যাপারেও এক সময় ইউরোপীয়গণ স্পেনীয় মুসলিম নক্‌শার রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করেছে। এভাবে বিমূর্ত শিল্পেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব বিদ্যমান। যেমন বিখ্যাত শিল্পী পল ক্লীর চিত্রকর্মটি মূলত

Dhaka University Institutional Repository

আরবী হরফের আদলে কতগুলো আকৃতির সমাবেশ। তাছাড়া এ রেখাগুলোতেও রয়েছে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব।[২৪] অনুরূপভাবে ইউরোপেও অ্যারাবেস্কুর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সেখানে এটি এতটাই জনপ্রিয় লাভ করে যে, তা খ্রিস্টানদের গির্জা, দেয়াল, দরজা, জানালা, এমনকি পোশাক-পরিচ্ছেদে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। স্পেন, ইতালি, গ্রিস ও মাল্টায় অ্যারাবেস্ক কারুকাজ বেশি দেখা যায়। এভাবে বর্তমানে বাংলাদেশেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.২.৪ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির বিশ্বব্যাপী প্রভাব

ইসলামী সংস্কৃতি আজ বিশ্বব্যাপী এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যেন একটি প্রাচীন বৃক্ষ তার ডালপালাগুলোকে ছড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। আর এ ডালপালাগুলোতে বিভিন্ন বর্ণের ফুলের মত মুসলিম স্থপতি, শিল্পী, লেখক ও চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ তাদের মহান ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক নিদর্শনকে নবরূপে প্রতিনিয়ত প্রস্ফুটিত করে চলেছেন। তাদের এ কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দীপনা ও প্রবাহকে আল-হাল্লাজের রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক কবিতার সাথে তুলনা করা যায়। ক্যালিগ্রাফি আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকলায় প্রভাব বিস্তার করেছে। যার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে বিখ্যাত শিল্পী পল ক্লীর বিভিন্ন চিত্রকর্মে। তাঁর ডকুমেন্ট বা দলীল নামে ছবিটির কতগুলো আরবী বর্ণমালা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার রেখাঙ্কনেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ইউরোপীয় শিল্পেও প্রভাব বিস্তার করেছে। আরবী না জেনেও ইউরোপীয়রা আরবী লেখার অনুকরণে নক্‌শা করেছে। কাপড়ের বুননে ও নক্‌শাতে আরবী লিপিকলার নক্‌শা অনুসরণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক শিল্প আন্দোলনের অন্যতম দিকপাল পাবলো পিকাসোর জন্ম স্পেনের আন্দালুসিয়া অঞ্চলে। এ অঞ্চল প্রায় ৭০০ বছর আরবদের অধীনে ছিল। এখানকার নক্‌শায় ইসলামী জ্যামিতিক মন্ডনকলার প্রভাব খুব সুস্পষ্ট। বিখ্যাত শিল্পী আঁরি মতিস

---

[২৪] ইব্রাহীম মন্ডল, 'ইসলামী শিল্পকলা', *মাসিক নতুন কলম* (ঢাকা: জুন-১৯৯৬), পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ছবির অনুপ্রেরণা পান ইরানী গালিচা থেকে। তাঁর ছবির রঙ ও কর্ম গালিচা থেকে নেয়া। তিনি তাঁর অবিমিশ্র রঙের পাশাপাশি সংস্থাপনের মাধ্যমে রঙের আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন।[২৫]

তাছাড়া পাশ্চাত্য শিল্পকলায় ইসলামী লিপিকলার প্রভাব দেখা যায়। পাশ্চাত্যেও আলঙ্কারিক নক্‌শায় কুফী রীতি ম্যাজিকের মত কাজ করেছে। এর প্রতিফলন দেখা যায়- ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের গীর্জা ও সমাধির অঙ্গসজ্জায়। এমনকি ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্সের গীর্জার সুউচ্চ ফটক কালিমা দ্বারা শোভিত। স্পেনের খ্রিস্টান শাসক মার্সিয়া ওফ্‌ফা স্বর্ণমুদ্রায় কালিমা খোদিত আছে। শুধু তাই নয়, নীল এ আর্মস্ট্রং যখন চাঁদের বুকে পদার্পণ করলেন, তখন যেদিকেই তাকান সেদিকেই দেখতে পান, আরবীতে লেখা ক্যালিগ্রাফি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। মহান আল্লাহ অবিশ্বাসীদের নিকট এ প্রমাণ করলেন যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং রাসূল (সা.) আল্লাহর বান্দাহ বা রাসূল।[২৬] বিংশ শতাব্দীর চিত্রশিল্পেও ইসলামী শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রভাব পড়েছে। বিমূর্ত শিল্পের জনক মন্ড্রিয়ান ক্যালিগ্রাফি শিল্পে মুগ্ধ হয়ে বিমূর্ত শিল্পের জন্ম দেন। বিমূর্ত শিল্পের ফিগার নেই, ফর্ম আছে। শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফির বদলে ফর্ম ব্যবহার করেছেন তাদের চিত্রকর্মে। বলা যায়- পৃথিবীর শিল্পের বিমূর্ততার উদ্ভব এখান থেকেই। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ক্যালিগ্রাফির এসব প্রভাব বাংলাদেশের সমাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

৪.২.৫ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফারদের কৃতিত্ব

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফারগণ অনেক অগ্রসর হয়েছেন। যা তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, অধ্যাবসায় ও সাধনার ফলে বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক

---

[২৫] An introduction to Islamic Calligraphy, Ibid, p.35.

[২৬] আমিনুল ইসলাম আমিন, 'চাঁদের বুকে আযান ও কালিমা শরীফের অনুপম ক্যালিগ্রাফি', *দৈনিক যুগান্তর*, আগস্ট-২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিসরে বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের প্রাপ্তির তালিকা একবারে ক্ষুদ্র নয়। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বাইনেল ও ট্রাইনেলে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফারগণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তারা সমকালীন শিল্পের বরপুত্র হয়ে আমাদের শিল্পাকাশে দেদিপ্যমান নক্ষত্রের মত জ্বলজল করছেন।[২৭] তারা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন। বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রণে শিল্পীরা প্রদর্শনী ও সেমিনারে অংশ নিচ্ছেন। গত ৯-১৮ ২০১১ সেপ্টেম্বর ইরানের জরগান শহরে অনুষ্ঠিত ১৮তম আন্তর্জাতিক তরুণশিল্পী শিল্পকলা উৎসবে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফার হাসান মোরশেদ প্রথম পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। বিশ্বের ২১ টি দেশের দুই শতাধিক শিল্পীর অংশগ্রহণে এ প্রতিযোগিতায় তিনি এ বিরল সম্মান লাভ করেন।[২৮] এর মাধ্যমে মুসলিম দেশসমূহের সাথে ইসলামিক কালচারের সাথে একটি সেতুবন্ধন তৈরি হয়েছে।

শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল ২০০১ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত নবম ইন্টারন্যাশনাল ক্যালিগ্রাফি এক্সিবিশন ও ২০০২ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, শিল্পী আরিফুর রহমান ১৯৯৭ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ক্যালিগ্রাফি ফেস্টিভ্যাল, ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার, ২০০২ সালে ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড এবং ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কুরআন ফেয়ার-এ অংশগ্রহণ করেন। গত ৩ অক্টোবর ২০০২ সালে ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত ‘ক্যালিগ্রাফি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে ২৮টি দেশের ২ হাজারের বেশি ক্যালিগ্রাফার ও স্কলার ৩ হাজার শিল্পকর্ম নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এতে বাংলাদেশের শিল্পী ড. আব্দুস সাত্তার, শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন, শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম, শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার ও

---

[২৭] জাহিদ মুস্তাফা, ‘আমাদের আধুনিক চারুশিল্পের ষাট বছর’, *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ঈদ সংখ্যা-২০০৮, পৃ.৫৫৩-৫৫৪।

[২৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ সেপ্টেম্বর-২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী আবুদ্ দারদা প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে আবদুর রহমান মৌলভীর হিলাইয়া ও মুসান্না প্রকরণে দক্ষ ও নিখুঁত উপস্থাপন দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।[২৯] তাছাড়াও ২০০2 সালে ১৫ নভেম্বর দশম আন্তর্জাতিক কুরআন ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০টির অধিক দেশের শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে বাংলাদেশের সরব অংশগ্রহণ ছিল। অন্যান্য দেশগুলো ছিল- ইরান, পাকিস্তান, ভারত, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, তিউনিসিয়া, লেবানন, মরক্কো, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুদান, বসনিয়া, যুগোস্লাভিয়া, চীন, রাশিয়া ও বৃটেন প্রভৃতি।

ইরান সরকারের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক সৈয়দ আশরাফ আলী, বাংলাদেশ কুরআন রিসার্চ একাডেমির প্রেসিডেন্ট আহমদ মনসুর ও ক্যালিগ্রাফার আমিনুল ইসলাম আমিন বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন। কুরআন প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের গ্যালারিটি ছিল সবচেয়ে বড়। আর এতে সবচেয়ে বেশি দর্শকের সমাগম ঘটে। সেমিনার পর্বে The holy Quran and the Art শিরোনামে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- বাংলাদেশের প্রতিনিধি সৈয়দ আশরাফ আলী। ইরানসহ বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়ায় বাংলাদেশ হতে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করে। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়।[৩০] ২০১৭ সালে তুর্কি-বাংলা আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী এবং ২০১৮ সালে ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ‘ইন্টারন্যাশনাল আর্ট এন্ড ক্যালিগ্রাফি

---

[২৯] মোহাম্মদ আবদুর রহীম, ‘দুবাইয়ের ৩য় আন্তর্জাতিক আরবী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০৬ শিল্পাঙ্গনে আলোড়ন তুলেছে’, *দৈনিক সংগ্রাম*, ৫ এপ্রিল-২০০৬।

[৩০] আহমদ মনসুর, ‘তেহরানে আন্তর্জাতিক কুরআন প্রদর্শনী ও সেমিনারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ’, *মাসিক নিউজ লেটার*, পৃ.৩০।

Dhaka University Institutional Repository

এক্সিবিশন'-এ বাংলাদেশের নবীন শিল্পী জামিল আহমদ ও শারমিন রূপা প্রমুখ অংশগ্রহণ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন।[৩১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৪.৩ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

[৩১] আমিনুল ইসলাম হুসাইনী, 'ইসলামি ক্যালিগ্রাফি: স্বপ্নবাজ তরুণদের ভাবনা', *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*, ২৯ অক্টোবর ২০১৮, পৃ.১০।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.১ অন্তর্নিহিত রহস্যের উদঘাটন

মানুষ মহান আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি। সেই মানুষের মধ্যে যারা গবেষক, বিশ্লেষক ও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী তারাই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্য ও গভীরতত্ত্ব বিষয়ে অবিরাম সাধনা চালিয়ে যান। নানাবিধ বিষয়ের অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটনে নানাভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করে থাকেন। এভাবে যারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিরহস্যের তত্ত্ব উদঘাটনে বিরামহীনভাবে কাজ করে চলছেন, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে চিত্রশিল্পীগণ অন্যতম। একজন শিল্পী আল্লাহর সৃষ্ট কোন বিষয়কে যেভাবে, যে দৃষ্টিতে দেখেন একজন সাধারণ মানুষ সেভাবে, সে দৃষ্টিতে দেখেন না। সাধারণ একটি বৃক্ষের কচিপাতা, তার বেড়ে উঠা, তার রঙ বদলের পর্যায় ও প্রক্রিয়া, পাতার গঠন ও প্রকরণ প্রভৃতি বিষয়ে একজন শিল্পী যেভাবে আগ্রহ নিয়ে গবেষণা করেন এবং সেই পর্যবেক্ষণের পর্যায় এবং অভিজ্ঞতাকে যেভাবে রঙ ও রেখায় প্রকাশ করেন, একজন সাধারণ মানুষ সেভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন না। এজন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিল্পীকে পছন্দ করেন। কারণ শিল্পীরা আল্লাহর সৃষ্ট বিষয়গুলোর রহস্য উৎঘাটন পূর্বক সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন এবং তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করেন।

সৃষ্টির সূচনা থেকেই মানুষকে নানা বিষয়ে সচেতন করতে এবং বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিল্পীরা শিল্প চর্চা করেন। এর মধ্যে ধর্মীয় শিল্পচর্চার বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। সৃষ্টিকর্তা কীভাবে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জন্য ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রচলন করেছেন? এসকল বিষয়ে শিল্পী তাঁর উপলব্ধিকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ের প্লাবন, নামাজ, রোজা, ঈদ, কুরবানী ও কুরআন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্নভাবে চিত্র রচনা করেছেন। তারা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী, বাণীর মর্মার্থ, হরফ বিন্যাস ও মর্মার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলির সমন্বয়ে রঙ-রসের ব্যাঞ্জনায় তাদের অপূর্ব সুন্দর চিত্রকর্মসমূহকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে চিত্রকর্ম বিশ্বশিল্পের জগতকে করেছে সমৃদ্ধ এবং সেরা শিল্পীদের করেছে অনুপ্রাণিত। আধ্যাত্মিক বাণীসমৃদ্ধ ক্যালিগ্রাফি, শিল্পের বর্ণবিন্যাসের রূপব্যাঞ্জনায় আকৃষ্ট হয়ে ভিন্ন ধর্মের বহু বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী তাদের শিল্পের পরিচর্যা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিগ্রাফির বর্ণিল উপস্থাপন কৌশলের বিষয়গুলোকে তাদের শিল্পে উপস্থাপনের মাধ্যমে শিল্পকর্মগুলোকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও আধ্যাত্মিক রসে সমৃদ্ধ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি বর্তমানে বাংলাদেশেও জনপ্রিয় শিল্প হিসেবে পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

৪.৩.২ ক্যালিগ্রাফির বিকাশধারায় ধর্মীয় প্রভাব

ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব, বিকাশ ও এর সংরক্ষণে ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। যখনই পৃথিবীতে কোন নতুন ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটেছে। তখনই সে ধর্মমতকে কেন্দ্র করে ক্যালিগ্রাফি বিশেষ মোড় নিয়েছে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধর্মের ভূমিকা অতুলনীয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের আরবী লিপিতে লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তবে এটি শুধু মুসলমানদের ক্ষেত্রেই নয়। বরং প্রায় প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরাই তাদের লিপিরীতিগুলো সংরক্ষণ করেছে এবং ভাষাগুলো নিজস্ব লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেছ। যেমন- ইহুদীরা তাদের মূলভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আজ আবধি যে দেশেই বসবাস করছে, সে দেশের ভাষাকেই নিজের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নিলেও সে ভাষাকে নিজেদের হিব্রু লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, তারা বর্তমানে আরবী, ফারসী, জার্মানী ও স্পেনিশ ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষাগুলোকেও হিব্রু লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে থাকে।[৩২]

খ্রিস্টানরাও তাদের সিরিয়ক লিপিরীতি সংরক্ষণের প্রতি অতীব যত্নবান ছিল। সিরিয়া ও আরবের খ্রিস্টান অঞ্চলে যখন ইসলাম প্রবেশ করে এবং আরবী ভাষার উপর একচ্ছত্র প্রাধান্য লাভ করে,

---

[৩২] এ ধরনের লিপিকে ইউরোপীয়রা আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন নামে অভিহিত করত। যেমন- মিসর ও সিরিয়ার ইহুদিরা হিব্রু লিপিরীতিতে আরবী ভাষা লিখে থাকে। তারা একে Judeo-Arabic বা ইসরাইলি-আরবী নামে অভিহিত করে। পারস্যের ইহুদিরা হিব্রু অক্ষরে ফারসী-ইসরাইলি লিখে থাকে। একে Judeo-Parsian বা ইসরাইলি-ফারসী নামে অভিহিত করে। জার্মানীর ইহুদিরা হিব্রু অক্ষরে জার্মানী ভাষা লিখে থাকে। একে Judeo-German বা ইসরাইলি-ফারসী নামে অভিহিত করে। তুর্কীস্তান ও অন্যান্য দেশে স্পেনিশ ইহুদিদের লিপিকে Judeo-Spanish নামে অভিহিত করে। এভাবে তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও ত্রিপোলীতে ইহুদিরা কথ্য আরবী ভাষাকে হিব্রু লিপিরীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে। একে তারা Judeo-Tunisian নামে অভিহিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

তখন তারা মাঝে মধ্যে সিরিয়ক অক্ষরেই আরবী ভাষা লিখত। এ লিপিকে তারা ‘কারশুনি’ নামে অভিহিত করত। এ রীতিতে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলসহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছে। প্রাচীনকালে মিসরের প্রতিমা পূজারী ধর্মযাজকরা ‘হায়ারোগ্লিফস’[৩৩] তথা চিত্রলিপিকে পবিত্র বলে মনে করত। তারা এর সাহায্যে ধর্মীয় বিভিন্ন নিদর্শনগুলোকে চিত্রিত করত। অথচ তখনও এর চেয়ে অনেক সহজ ও সুন্দর লিপি ‘ডায়ামেটিক্স’[৩৪] বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধরাও বর্তমানে উত্তর এশিয়ায় ‘তিব্বতি লিপি’ ও দক্ষিণ এশিয়ার ‘পালি লিপি’কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

এভাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতিগুলো তাদের ধর্মীয় ভাষার লিপিকে অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতময় মনে করে। উপরন্তু তারা একে একটি ধর্মীয় নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। তারা নিজের ভাষার চেয়েও ধর্মীয় ভাষার প্রতি অধিক যত্নবান হয়। ফলে কেউ নতুন ধর্ম গ্রহণ করলে সাথে সাথে তাদের পূর্ব প্রচলিত ভাষার লিপিরীতি পরিহার করে নতুন ধর্মের লিপিরীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।[৩৫] এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, যে কোন ধর্মই লিপি ও ভাষার উৎপত্তি, বিকাশ ও বিলুপ্তির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেব কাজ করে।

৪.৩.৩ ইসলামী ক্যালিগ্রাফির মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

মানব সমাজে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও বিদ্যমান। এ শিল্প চর্চার মাধ্যমে মানুষের অন্তকরণে এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবে শৃঙ্খলাবোধ, সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধ, পরিমিতবোধ, প্রগতিশীল, সুপরিকল্পক ও গঠনমূলক কাজে উদ্যোগী ও সাহসী পরিচালক হিসেবে গড়ে তুলতে তাকে সহায়তা করে। তাই ক্যালিগ্রাফি চর্চা একজন

---

[৩৩] হায়ারোগ্লিফস: এটি একটি গ্রিক শব্দ। গ্রিকরা প্রাচীন মিসরে প্রচলিত লেখার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো বুঝানোর জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করত। এটি هيروس ও غليفاؤس এর সমন্বয়ে গঠিত। هيروس অর্থ- পবিত্র বস্তু আর غليفاؤس অর্থ- চিত্র। অতএব শব্দটির পূর্ণ অর্থ হলো- পবিত্র বস্তুর চিত্র বা চিহ্নসমূহ। এ লিপিটি মূলত জীব-জন্তু ও বস্তুর প্রতিকৃতি ও চিত্রনির্ভর।

[৩৪] ডায়ামেটিক্স: এটি সর্বসাধারণের একটি লিপি। এটি হায়ারেটিক্স-এর তুলনায় অধিকতর সহজসাধ্য। এটি মিসরে ষোড়শ সম্রাজ্ঞীর আমলে ক্রমান্বয়ে হায়ারেটিক্স-এর অবস্থান দখল করে। এ লিপি থেকেই পৃথিবীর সকল জাতি ফিনিশীয়দের মাধ্যমে বর্ণমালার জ্ঞান লাভ করে।

[৩৫] *ইনতিশারুল খাত্তিল ‘আরাবী ফিল ‘আলিমিশ শারকী ওয়াল গারবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫-১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে যত সহজে তার অবচেতন মনে সেসব গুণাবলীর শিক্ষা দেয়। বই পড়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে এসব গুণ এত সহজে অর্জন করা যায় না। উন্নত দেশে তাই শিশুদের অক্ষর জ্ঞান দেয়ার পাশাপাশি ছবি আঁকার জন্য রঙ ও তুলি হাতে দেয়া হয়। এ প্রবণতা আমাদের দেশেও বিদ্যমান থাকলে এদেশের শিক্ষার্থীগণ এসব গুণাবলি সহজে অর্জন করতে সক্ষম হবে। এভাবে যদি আমাদের সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির বিস্তার ও সৌন্দর্যবোধের প্রসার ঘটে, তাহলে সুন্দরের চর্চায় বিদগ্ধ, সুন্দর ও রুচিশীল সমাজ গড়ে উঠবে। কেননা সুস্থ সংস্কৃতি বিনির্মাণে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।[৩৬]

আদিম যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ পৃথিবীতে কত জাতির উত্থান-পতন ঘটেছে। কত সভ্যতার পতন ঘটেছে। আবার কত জাতি বিলীন হয়েছে। কিছু কিছু সভ্যতার কথা আমরা জানলেও অনেক সভ্যতার ইতিহাস আমরা জানি না। আর এসব জাতির পরিচয় জানার মাধ্যমই হল শিল্পকলা, চিত্রকলা, লিপিকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, কারুশিল্প ও অন্যান্য শিল্পকলা ছাড়া তাদের ভাষা জানার আর কোন মাধ্যম ছিল না। ধ্বংসাবশেষের পর স্থাপত্যের নিদর্শন যেসব চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও শিলালিপি পাওয়া গেছে, তা থেকে গবেষকগণ বের করেছেন সেসব যুগের ইতিহাস ও মানুষের চলাফেরা, আচার-আচরণ এবং সে সময়ের সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতা। যেমন- ব্যবিলনীয়, মিসরীয়, গ্রীক, আরবীয়, প্রাচীন চৈনিক ও সিন্ধু সভ্যতা ইত্যাদি। এক জাতির বা অন্য যুগের শিল্পকলা অন্য জাতির জন্য যুগ যুগ পরেও বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই ইসলামী ক্যালিগ্রাফিকে আন্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যম হিসেবে পৃথিবীতে অন্য জাতির ভাব ও চিন্তার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা

---

[৩৬] আমিনুল ইসলাম আমিন, 'শিল্পকলায় সৃজনশীলতা', *দৈনিক যুগান্তর*।

Dhaka University Institutional Repository

‘সমকালীন ইসলামী ক্যালিগ্রাফি: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ শীর্ষক বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে গিয়ে আমি এদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চার যে প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতা অবলোকন করেছি তার আলোকে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির প্রচার, প্রসার ও বিকাশের লক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করছি:

ক. শিক্ষার্থী পর্যায়ে

১. গভীর মনোনিবেশ ও আন্তরিকতার সাথে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির লিপিশৈলীগুলোর আয়ত্ত্ব করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

২. ইসলামী ক্যালিগ্রাফি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হতে হবে।

৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীগুলোতে অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

খ. ক্যালিগ্রাফার পর্যায়ে

১. বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমান ক্যালিগ্রাফারদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে এবং তাদের শিল্পকর্মের সাথে নিজেদের শিল্পকর্মের মান তুলনাপূর্বক নিজেদেরকে আরো গুণগত মানে উন্নীত করতে হবে।

২. ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস ও এর শৈলীসমূহের উপর হাতে-কলমে, গ্রন্থ-ম্যানুয়াল ও অনুশীলনপত্র তৈরি এবং নতুন নতুন ফন্ট আবিষ্কারে প্রয়াস চালাতে হবে।

৩. ঐতিহ্যিক ধারা চলমান রাখতে ও বিকশিত করার জন্য আরো ব্যাপক পরিমাণ ক্যালিগ্রাফার তৈরি করতে হবে।

৪. দ্বিবার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনীসহ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলোতে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. সমকালীন শিল্পকলার সৌন্দর্য দর্শনে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির আরো নতুন মাত্রা আবিষ্কারে প্রয়াস চালাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. দেশের প্রথিতযশা ক্যালিগ্রাফার, ক্যালিগ্রাফি গবেষক ও সংগঠকদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে হবে। যাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্প একটি অনুপম ও শক্তিশালী শিল্প হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং শিল্পীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ. সংগঠন ও সংস্থা পর্যায়ে

১. বিদ্যমান ক্যালিগ্রাফি কেন্দ্রিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে নিয়মিত ক্লাস, কর্মশালা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।

২. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফির সংগঠন বা সংস্থাসমূহের পরিচিতি কার্যক্রম তুলে ধরে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্যালিগ্রাফারদের শিল্পকর্মগুলো তাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রতি বছর সভা, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজনের মাধ্যমে জনসংযোগ বৃদ্ধি ও কর্মমূল্যায়ন করতে হবে ।

৪. ক্যালিগ্রাফির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পী, আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা শিল্পী, বাণিজ্যিকভাবে জড়িত শিল্পীদের তালিকাভুক্ত করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৫. ক্যালিগ্রাফি বিষয়ক মূল্যবান প্রবন্ধ, নিবন্ধ, শিল্প সমালোচনা ও ক্যালিগ্রাফারদের জীবন ও কর্ম নিয়ে ম্যাগাজিন, সাময়িকী কিংবা গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করতে হবে।

৬. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কপি করার জন্য ক্যালিগ্রাফারদের উৎসাহিত করতে হবে।

৭. ক্যালিগ্রাফারদের সম্পাদিত ক্যালিগ্রাফিকর্ম বিক্রির ব্যবস্থা করতে সহযোগিতা করতে হবে।

ঘ. প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

১. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ক্যালিগ্রাফিকে শিক্ষা কারিকুলামে ১০০ নাম্বারের নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে হলেও সম্পৃক্ত করতে হবে।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ বা ইনস্টিটিউটে ক্যালিগ্রাফির উপর স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও আর্ট কলেজসমূহে একটি কোর্স চালু করতে হবে।

৩. বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা ও মিডিয়ায় অশ্লীল দৃশ্যের পরিবর্তে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহিতকরণ এবং এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করতে হবে।

৪. ভালমানের ক্যালিগ্রাফি কর্মগুলোর সমন্বয়ে প্রতি বছর ক্যালিগ্রাফি এলবাম কিংবা Contemporary Calligraphy in Bangladesh শীর্ষক রঙিন বই বা সংকলন প্রকাশ করতে হবে।

ঙ. রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে

১. বিভাগীয় শহরগুলোতে ক্যালিগ্রাফি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেখানে থাকবে ক্যালিগ্রাফি চর্চা করার মত সুযোগ, স্বাধীনতা ও মনোরম পরিবেশ।

২. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে জাতীয়ভাবে ক্যালিগ্রাফির উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও কোর্সের আয়োজন করতে হবে।

৩. জাতীয় জাদুঘরসহ বিভিন্ন শহরের জাদুঘরগুলোতে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের জন্য আলাদা গ্যালারি বরাদ্দ রাখতে হবে। যেখানে শুধু বাছাইকৃত ক্যালিগ্রাফিগুলো এবং হাতে লেখা কুরআন শরীফ, পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি ও ফরমান ইত্যাদি স্থান পাবে।

৪. শিশু একাডেমির কেন্দ্র ও শাখাগুলোতে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, তার মধ্যে ক্যালিগ্রাফির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫. সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতি বছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।

৬. বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত শিল্পকর্মের জন্য প্রতিবছর শ্রেষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার এ্যাওয়ার্ড প্রদান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. বিভিন্ন শহর, গুরুত্বপূর্ণ চত্বর, মসজিদ ও ভবনের চুড়ায় কুরআনের ভাস্কর্য, কালিমা স্তম্ভ, ক্যালিগ্রাফির ম্যুরাল ইত্যাদি স্থাপন করতে হবে।

৮. OIC, ISESCO বা UNESCO সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক মানের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।

৯. নতুন উদ্ভাবন সাপেক্ষে ক্যালিগ্রাফির নির্দিষ্ট মডেলকে কপিরাইট আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে বাণিজ্যিক উৎপাদন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

১০.ক্যালিগ্রাফি বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আর্ট শিক্ষক সমমানে ক্যালিগ্রাফি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১.ক্যালিগ্রাফি শিল্পকে পূর্তকর্মের সাথে সমন্বয়ের জন্য শিল্পী ও আগ্রহী প্রকৌশলীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষত মসজিদ স্থাপত্যে এর ব্যাপক প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২.বাংলা ভাষায় ক্যালিগ্রাফির প্রাচীন উৎস আবিষ্কার, ঐতিহ্য ও সমকালীন ক্যালিগ্রাফারদের শিল্পকর্ম বিশ্লেষণসহ একুশে কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ধারায় বাংলা ক্যালিগ্রাফিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৩.ক্যালিগ্রাফি চর্চা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে। এমন নান্দনিক শিল্পধারাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, বরং একে সমৃদ্ধ করে এর অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।

১৪.সর্বোপরি ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিদর্শন স্বরূপ পর্যায়ক্রমে জাতীয়ভাবে ইসলামিক আর্ট মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য এক অনন্য মডেল হিসেবে পরিগণিত হবে।

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পকলার প্রতিনিধিত্বশীল শিল্পমাধ্যম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা আরবী ও এ ভাষায় সৃষ্ট ক্যালিগ্রাফি তাবৎ পৃথিবীর মুসলমানদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ। আল-কুরআনের আয়াতের শিল্পমাধুর্য শিল্পবোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধকরণে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি বিরাট ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। কুরআন ও জাগতিক পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রণয়নে এবং চারুশিল্পের সম্প্রসারণে ক্যালিগ্রাফি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, এ লিপি মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক। ফিলিপ ব্যামব্রো বলেন- 'One of visible links of Islam that can be seen throughout the Islamic world, in countries of different races and cultural background is the Arabic script.' কারণ আল-কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুতকরণ একটি ধর্মীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন কর্ম বলে পরিগণিত। প্রাণীর চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ থাকায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি মুসলিম বিশ্বে প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই এটি শুধু পাণ্ডুলিপি ও ধর্মগ্রন্থের রচনা বা অনুলিপি প্রণয়নেই ব্যবহৃত হয়নি। বরং স্থাপত্য, মৃৎপাত্র, টালি, ধাতবপাত্র, কার্পেট, কাঠখোদাই ও শিলালিপি অলঙ্করণ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে লিপিকারের কালি হচ্ছে তার সুবাস, কাগজ, অবয়ব ও কলম আল্লাহর বাণী শাশ্বত করার একটি যন্ত্র। রাসূল (সা.) লিখনরীতিকে সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং জায়েদ বিন সাবিতকে তাঁর নিজস্ব লিপিকার হিসেবে নিযুক্ত করেন।

রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলামের অমীয় বাণী ও তাওহীদের মূল বক্তব্য পৃথিবীর অর্ধগোলার্ধে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিজিত দেশের জনমানবে সঞ্চারিত করে প্রাণস্পন্দন ও শিল্প-সাহিত্যে গতিময়তা সৃষ্টি করে। বিজয়ীদের সঙ্গে শিল্পীরা উন্নত জীবনের সন্ধানে বিজিত অঞ্চলে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এতে করে শিল্পে আসে গতিশীলতা এবং তা আরব-পারস্যের গণ্ডি পেরিয়ে ভারত উপমহাদেশে পরিব্যাপ্তি লাভ করে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে। বাংলা ভূখণ্ড এর ব্যতিক্রম নয়। মধ্য এশিয়ার অধিবাসী তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানরা সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনকে পরাভূত করে বাংলা বিজয় করেন। মধ্য এশিয়া উন্নত সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে মুসলমানরা এদেশে প্রবেশ করেন। তুর্কী-আফগান শাসনামলে ফারসী রাষ্ট্রভাষা

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া সত্ত্বেও তারা ধর্মীয় ভাষা হিসেবে বাংলার পরিচর্যা করেন। আরবী ভাষার ক্যালিগ্রাফি সৌন্দর্য মর্মস্পর্শী ও লালিত্যে দীপ্তিমান। কারণ আরবী হরফের আলিফ ও লাম-এর লম্বদণ্ড উপস্থাপন এবং সেসবের নিম্নাংশে কিংবা উপরিভাগে বক্রাকৃতি নুন, ইয়া ও এ জাতীয় হরফগুলোর পরিবর্ধন, সম্প্রসারণ, সংকোচন ও পাশাপাশি সুষম সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে লিপির যে বৈচিত্রময় ও একই সঙ্গে যে নান্দনিক অবয়বের সৃষ্টি হয়, তা সত্যিই বিস্ময়কর।

বাংলার স্থাপত্যে উৎকীর্ণ শিলালিপি ইসলামী ক্যালিগ্রাফির একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বাংলার তুর্কী-আফগান সুলতানদের লিপিশিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা এবং ক্যালিগ্রাফির উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টার প্রমাণ বহন করে তাদের সময়ের ইমারতগাত্রের প্রস্তরলিপি। এসব প্রস্তরলিপিতে তুঘরা লিপিশৈলীর ধারা নানাবিধ আলঙ্কারিক মোটিফ উপস্থাপন করে সে সময়ের বাংলার লিপিশিল্পীগণ তাদের নান্দনিক শিল্পের চরম বিকাশের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাংলাভাষার চর্চায় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও বাংলা অক্ষরে ক্যালিগ্রাফির ধারণা সে সময়ের ক্যালিগ্রাফারদের ছিল বলে কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলামী ক্যালিগ্রাফি বলতে মূলত আরবী, ফারসী ও উর্দূ ক্যালিগ্রাফিকেই বুঝায়। কিন্তু অতি অধুনা শিল্পীরা বাংলা অক্ষরের মধ্যে গতিময়তা ও শিল্পপ্রবাহ পরখ করে তাতে অলঙ্কারের লেবাস পরিয়ে সুষম ক্যালিগ্রাফির কাতারে দাঁড় করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাংলাদেশের শিল্পাঙ্গনে সাম্প্রতিক ইসলামী ক্যালিগ্রাফি একটি স্বকীয় অবস্থানে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। আগ্রহী ক্যালিগ্রাফার, সংগঠন ও সংস্থার একান্ত প্রচেষ্টায় বেশ পথ পাড়ি দিয়েছে। এদেশের শিল্পাঙ্গনের প্রথম সারির প্রবীণ শিল্পীগণ যেমন ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম করেছেন, তেমনি একেবারে নবীন প্রতিভবাবান শিল্পীগণ ক্যালিগ্রাফি শিল্প নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। ক্যালিগ্রাফিকে নান্দনিকতার নতুন মাত্রায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে এর প্রচার, প্রসার, চর্চা, লালন ও জনসম্মুখে যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরার জন্য বিগত কয়েক দশকে ক্যালিগ্রাফির চর্চা বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

এসব প্রচেষ্টা শিল্পতাত্ত্বিকদের মধ্যেও সাড়া জাগতেও সক্ষম হয়। দেশের শীর্ষপর্যায়ের শিল্পীদের অংশগ্রহণ মিডিয়াগুলোতে সাড়া পড়ে। এর ফলে সামাজিকভাবেই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রতিনিয়ত আজ অফিস-আদালত ও ড্রইং রুমে জায়গা করে নিচ্ছে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি। ক্যালেন্ডার, ভিউকার্ড, ঈদকার্ড ও বিভিন্ন অলঙ্করণে এবং গৃহসজ্জাসহ মসজিদ ডেকোরেশনে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। এসব প্রমাণ করে, সামাজিকভাবে ক্যালিগ্রাফি শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কুরআনিক কালচার ও ইসলামী শিল্পের এ মাধ্যম নিয়ে ইদানিং পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফারগণ যথেষ্ট অবদান রাখছেন। তারা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছেন। বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রণে শিল্পীরা বিভিন্ন সেমিনারেও অংশ নিচ্ছেন। এতে বাংলাদেশের সাথে মুসলিম দেশসমূহের ইসলামিক কালচারের একটি সেতুবন্ধন তৈরি হচ্ছে।

A nation is known by it’s culture. মূলত একটি জাতির আত্মপরিচয় ফুটে উঠে তার দৈনন্দিন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। তাই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস ও চেতনার ধারক জাতীয় সাংস্কৃতিক নীতিমালায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। কারণ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি একটি পরিপূর্ণ শিল্প। শিল্পকলার যতগুলো দিক ও বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে এটি অত্যন্ত পরিশীলিত। শিল্প শুধু শিল্পের জন্য নয়, বরং সত্য ও সুন্দরের জন্য। তাই ইসলামী শিল্পকলা- বিশেষত ইসলামী ক্যালিগ্রাফি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সুনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, শুভ চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে ও মানব চরিত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি নীরবে মানব মনে নানা ভাব ও চিন্তার উদ্রেক করে। ধর্ম মানুষকে বিশুদ্ধ করে এবং শুভ ও সুন্দর কাজে অনুপ্রাণিত করে। তাই ধর্মের সাথে সঙ্গতিশীল শিল্পকলা মানবজাতির জন্য অবশ্যই কল্যাণকর এবং সমাজে ন্যায় ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি চর্চা হচ্ছে- প্রয়োজনীয় উৎসাহ উদ্দীপনা ও

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আশা করা যায়, বাংলাদেশেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটবে এবং বিশ্বসভায় একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

Dhaka University Institutional Repository

ক. আল-কুরআন

১. *পবিত্র আল-কুরআনুল কারীম*

খ. আল-হাদীস

১. ইমাম বায়হাকী (রহ.), *বায়হাকী শরীফ*, শুয়াবুল ঈমান

২. ইমাম মুসলিম (রহ.), *সহীহ মুসলিম শরীফ*, কিতাবুল ঈমান

৩. *দায়লামী শরীফ*, মুসনাদে ফেরদৌস

গ. অভিধানসমূহ

১. *আল-ক্বামুসুল জাদীদ লিত তুল্লাব* (আল-শারিকাতুত তিউনিসিয়্যা লিত্ তাওযী আল-মুরাসসাতুল ওয়াতানিয়্যাহ আল-জাযিরিয়্যাহ, ১৯৮৮)

২. *আল-মাওরিদ, ইংরেজি-আরবী অভিধান* (বৈরুতঃ ১৯৬৭)

৩. নরেন বিশ্বাস, *বাংলা উচ্চারণ অভিধান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯)

৪. *Cambrige Advanced Learners Dictionery* (Cambridge University Press, 2008)

৫. *Encyclopedia Britanica*

৬. *Encyclopedia of Islam*, vol.i

৭. *Encyclopedia of World Art*

৮. *Illustrated Oxford Dictionery, Oxford*, Newyork

Oxford Advanced learners Dictionery, 4th Edition (London: Oxford University Press, 2011), p.148.

ঘ. আরবী গ্রন্থাবলি

১. *আল-কুরআন ফী কুল্লি লিসান (দাক্ষিণাত্য, হায়দরাবাদ, ১৯৪৬)*

২. আবু আবদুল্লাহ ইবনু কুতায়বা, *আল-মা‘আরিফ*

৩. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-লাওয়াতী, *রিহলাহ ইবন বতুতা* (বৈরুতঃ তা বি)

৪. আবু উমর ইউসুফ বিন আবদুল বাবর আল-কুরতুবী, *আল-কাসদ ওয়াল উমাম* (কায়রোঃ মাকতাবাহ আল-কুদ্সী, ১৩৫০ হি.)

Dhaka University Institutional Repository

৫. আবুল আব্বাস কালকাশান্দি, *সুবহুল 'আশা* (কায়রো: আল-মাতবা'আতুল আমিরিয়্যাহ, ১৯১৬), খ.৩

৬. আবুল ফাদল জামালুদ্দীন ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব* (ইরান: নাশরু আদাবিল হাওযা, ১৪০৫ হি.), খ.১১

৭. আবদুল ফাত্তাহ উবাদাহ, *ইনতিশারুল খাত্তিল 'আরাবী ফিল 'আলিমিশ শারকী ওয়াল গারবী* (মিসর: মাতবা'আ হিনদিয়া বিল মুসিকী, ১৯৯৫)

৮. আবদুল ফাত্তাহ উবাদাহ, *তারিখু খাত্তুল 'আরাবী* (মিসর: ১৯৯৫)

৯. আবদুল হামিদ আবু সিক্কীন, *ফিকহুল লুগাহ* (কায়রো: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১)

১০. আর্নস্ট ক্যুহেনল, *ফান্নুল খাত্তিল 'আরাবী* (বৈরুত: তাবি)

১১. ড. আলী আবদুল ওয়াহিদ ওয়াফী, *ফিকহুল লুগাহ* (কায়রো: দারু নাহদাতি মিসর, ১৯৭৩)

১২. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* (বৈরুত: মাতবা'আতুল মা'আরিফ), খ.১০

১৩. ইবনুন নাদীম, *কিতাব আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৭৮)

১৪. ইযযুদ্দীন ইবনুল আছির, *উসদুল গাবাহ* (তেহরান: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ), খ.২

১৫. কামিল সালমান আল-জাবুরী, *মাওসূ'আতু আল-খাত্তুল 'আরাবী* (দার ওয়া মাকতাবাতু হিলাল, ১৯৯৯)

১৬. ড. খলীল ইয়াহইয়া আন-নামী, *মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল আদাব* (মিসর: আল-জামি'আতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৫), খ.৩

১৭. জালালুদ্দীন সুয়ুতি, *আল-মুজহির ফী 'ইলমিল লুগাতি ওয়া আনওয়া'ইহা* (কায়রো: আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাতুল 'আম্মাহ, ১৯৭৪), খ.২

১৮. নাসীরুদ্দীন আল-আসাদ, *মাসাদিরু শি'রুল জাহিলী* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৬)

১৯. বিলাল আব্দুল ওহহাব রিফাঈ, *আল-খাত্তুল 'আরাবী: তারিখুহু ওয়া হাদিরুহু* (বৈরুত: দারু ইবনু কাছীর, ১৯৯০)

২০. মাহমুদ শুক্কুর জাব্বুরী, *আল-মাদরাসাতুল বাগদাদিয়্যাহ ফিল খাত্তিল 'আরাবী* (বাগদাদ: ২০০১), খ.১

Dhaka University Institutional Repository

২১. মুহাম্মদ আরশাদুল হাসান, *আল-ওয়াজিযু ফী তারিখিল খাত্তিল ‘আরাবী* (ঢাকা: নুন ওয়াল-কালাম পাবলিকেশন্স, ২০০৮)

২২. মুহাম্মদ তাহির ইবনু আব্দুল কাদির আল-কুরদী আল-মাক্কী, *তারিখুল খাত্তিল ‘আরাবী ওয়া আদাবিহী* (আল-মাকতাবাতুল হিলাল, ১৯৩৯)

২৩. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *আত-তিবয়ান ফি উলুমিল কুরআন* (বৈরুত: আলামুল কুতুব, ১৯৮৫)

২৪. মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দীক, *আল-জামিয়াতুল ‘আলামিয়্যাহ লিল ‘উলুমিল ইসলামিয়্যাহ*, এপ্রিল-জুন-১৯৯৪

২৫. শিহাবুদ্দীন আহমদ আন-নুয়াইরী, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল মিসরিয়্যাহ)

ঙ. ইংরেজি গ্রন্থাবলি

1. A Grohmann, *From the world of papyri* (Cairo: 1952)
2. A H Christie, *Islamic Minor Arts and their Influence upon European work*, LI
3. Abdel Kader Khatibi, *The Splendour of Islamic Calligraphy* (London: Thames and Hudson, N.D)
4. Abul Fadl, *Ain-I-Akbari*, Eng. Tr. H. Bluclaman (Calcatta: 1873), vol.1
5. Abul Farah Muhammad bin Ishaq Nadim, *The art of Calligraphy* (New York: Colombia University Press, 1970)
6. Annemarie Schimmel, *Calligraphy and Islamic Culture*
7. Annemarie Schimmel, *Islamic Calligraphy* (Leiden: EJ Brill, 1970)
8. E H Palmer, *Oriental Penmanship* (London: 1889)
9. Ettinghausen, *Al-Ghazzali on beauty, Islamic Art and Architecture* (Newyork: Garland Library of the history of the Art, 1979)
10. F R C Begle, *Counsel for Kings (*London: 1964)
11. Fredaric M Ash & G S I Goi Edited, *Indian Epigraphy: Its bearings on the History of Art* (New Dilhi: 1985)
12. Ibn Batuta, *Rihla*, Eng. Tr. Agha Mahdi Husain (Baruda:1953)

Dhaka University Institutional Repository

13. Ibn Khaldun, *The Muqaddimah,* Tr. Franz Rozenthal (London: 1958), vol.2
14. Jafar Hasan, *Muslim Calligraphy, Indian Art and Letters* (London: 1935), N S, vol.ix, no.i
15. Khalil Siman, *Linguistics in the Middle ages* (Leiden: E J Brill, 1968)
16. Lois lamya Al Faruqi, *Islam and Art* (Islamabad: National Hijrah Council, 1985)
17. M A Ghafoor, *The Calligraphers of Thatta* (Karachi: University of Karachi, 1978)
18. M Ziauddin, *A Mograph of Muslem Calligraphy* (Calcutta: Visva Bharati Studies, 1969)
19. M Ziauddin, *Muslim Calligraphy*
20. Muhammad Mohor Ali, *History of the Muslims of Bengal*, vol. IB, (Dhaka: Islamic Foundation, 2003)
21. Nabil F. Safwat, *The Art of the pen: Calligraphy of 14th centuries (*London: Oxford University Press, 1996)
22. P I S Mustafizur Rahman, *Islamic Calligraphy in the medieval India-* (Bangladesh: University Press Limited, 1979)
23. P K Hitti, *History of the Arabs (*London: Macmillan, 1968)
24. Philip Bambrough, *Treaseres of Islam* (New York: 1977)
25. Qadi Ahmad, *Gulistan-e-Hunr*, Eng. Tr. copy entitled Calligraphers & Painterss, T. Minorsky, Freer Gallary of Art (Washington: 1959), op. cit
26. *Memoirs of the Archeological Survey of India, no. 29, speciman*.3
27. S A Rahman, *Armughan-e-Ilmiba Khidma (*Lahore: 1995)
28. S Lanepoole Scott, *The Moors in Spain*
29. S P Scott, *History of the Moorish empire in Europe,* v.iii, ch.29
30. Dr. Sayed Mahmudul Hasan, *Glimpses of Muslim Art and Archetecture* (Dhaka: Islamic Foundation, 1983)
31. Shah Muhammad Shafiqullah, *Calligraphic Art in Sultanate Archetecture-* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2012)
32. Shamsuddin Ahmed, *Inscription of Bengal* (Rajshahi: 1960), vol.ii

Dhaka University Institutional Repository

33. W Lents Tomas, *Arab and Iranian Arts of the book, Arts of Asid,* 1987
34. Yasin Hamid Safadi, *Islamic Calligraphy (*London: 1978)

চ. বাংলা গ্রন্থাবলি

১. আবদুল বারিক ভূঁইয়া, *শরীফ চারু ও কারুকলা* (ঢাকাঃ তানিয়া প্রেস ও পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯)
২. ড. আব্দুস সাত্তার, *প্রকৃত শিল্পের স্বরূপ সন্ধানে* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, মে-২০০৫)
৩. *আব্দুস সাত্তারের শিল্পকর্ম* (ঢাকাঃ অক্টোবর, ২০০২)
৪. আবু তাহির মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দিন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫)
৫. আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি* (ঢাকাঃ প্রীতি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি-২০০১)
৬. ড. আহমদ আলী, *মুসলিম লিপিকলাঃ উৎপত্তি ও বিকাশ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০১৭)
৭. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *আরব জাতির ইতিহাস চর্চা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮২)
৮. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৯)
৯. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা* (রাজশাহী : জুন-১৯৯৬)
১০. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ সংস্কৃতি* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯)
১১. এনামুল হক, *বাংলাদেশে ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকাঃ জাতীয় জাদুঘর, ১৯৭৮)
১২. এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮)
১৩. এম. জিয়াউদ্দিন, *ইসলামী লিপিকলা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪)
১৪. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলাম ও শিল্পকলা*, অনু. ড. মাহফুজুর রহমান (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭)
১৫. ইব্রাহীম মন্ডল, শহীদুল্লাহ এফ. বারী ও মোহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাতে কলমে ক্যালিগ্রাফি*
১৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয়, নবম ও দ্বাদশ খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

১৭. জহিরুল হক, *শিল্পী ও শিল্প আন্দোলন* (ঢাকা: রূপেন প্রকাশন)

১৮. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *চারু ও কারুকলা* (বাংলাদেশ: নবম-দশম শ্রেণি, পুণর্মুদ্রণ, ২০১৭)

১৯. ড. নাজিম উদ্দীন আহমদ ও ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সম্পা., *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকা: ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন, ২০০৯)

২০. মাহফুজা ঝর্ণা, *সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিরকের প্রভাব* (ঢাকা: ওয়ামী, বাংলাদেশ অফিস, ২০০৭)

২১. মিসবাহ আমীন কামাল, *শিল্পের ভাবনা* (ঢাকা: মজিদ পাবলিকেশন্স, ২০০৫)

২২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২), ৭ম প্রকাশ

২৩. মুহাম্মদ নূরুর রহমান, *আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি ফাউন্ডেশন, ২০০৫)

২৪. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম খান, *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকা: মজিদ পাবলিকেশন্স, ২০০৫)

২৫. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *ইন্ট্রুডাকশন টু ইসলাম*, অনু. মুহাম্মদ লুতফুল হক, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫)

২৬. ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক, *আরবী সাহিত্য সমালোচনা* (ঢাকা: সুলতানা প্রকাশনী, ১৯৮৯)

২৭. ড. মো. রফিকুল আলম, *ইসলামী সভ্যতা ও শিল্পকলা* (ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪)

২৮. মোহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: যোগাযোগ পাবলিশার্স, ২০০২)

২৯. মোহাম্মদ আবদুর রহীম, *সহজ ও সুন্দর আরবী ক্যালিগ্রাফি- নাসখী লিপি* (ঢাকা: ঝিঙেফুল, ২০০৫)

৩০. *সিলেবাস*, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩১. *সিলেবাস*, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩২. *সিলেবাস*, প্রাচ্যকলা ও গ্রাফিক ডিজাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩৩. সৈয়দ আলী আহসান, *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন-২০০৪)

৩৪. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম ক্যালিগ্রাফি* (ঢাকা: মজিদ পাবলিকেন্স, ২০০৫)

Dhaka University Institutional Repository

৩৫.ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম চিত্রকলা* (ঢাকা: ছাত্রবন্ধু পাবলিকেন্স, ডিসেম্বর-১৯৯৪)

৩৬.রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *মুসলিম সংস্কৃতি কমলা বক্তৃতামালা*

৩৭.হাসনাত আবদুল হাই, *মুর্তজা বশীর* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জুন-২০০৪)

ছ. ক্যাটালগসমূহ

১. *ক্যাটালগ: ১ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৮*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

২. *ক্যাটালগ: ২য় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-১৯৯৯*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৩. *ক্যাটালগ: ৩য় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৪. *ক্যাটালগ: ৪র্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০১*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৫. *ক্যাটালগ: ৫ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৬. *ক্যাটালগ: ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৭. *ক্যাটালগ: ৭ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৪*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৮. *ক্যাটালগ: ৮ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৯. *ক্যাটালগ: ৯ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

১০. *ক্যাটালগ: ১০ম ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮*, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

১১. *ক্যাটালগ: আর্ট ও ফটো প্রদর্শনী-২০০৮*, ঢাকা

১২. *ক্যাটালগ: ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০১৭

১৩. *ক্যাটালগ: ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা*, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ২০১৮

১৪. *ক্যাটালগ: ক্যালিগ্রাফি ওয়ার্কশপ-২০০৮*, ইসলামী আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

১৫. *ক্যাটালগ: ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং এক্সিবিশন-২০১৪*, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ড, ঢাকা

১৬. *ক্যাটালগ: ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং প্রদর্শনী-২০১৫*, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি আর্টিস্টস গিল্ডস, ঢাকা

১৭. *ক্যাটালগ: গ্রুপ আর্ট প্রদর্শনী-২০০৫*, জাতীয় জাদুঘর, অংকন আর্ট স্কুল, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

১৮. *ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৩*, বাংলাদেশ ক্যালিগ্রাফি একাডেমি

১৯. *ক্যাটালগ: বাংলা ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, আমার দেশ ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, ঢাকা

২০. *ক্যাটালগ: মোহাম্মদ আবদুর রহীমের ক্যালিগ্রাফি*, ২০১০, ঢাকা

২১. *ক্যাটালগ: শিল্পী আমিনুল ইসলাম আমিন-এর ৩য় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৮*, ঢাকা

২২. *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০*, ঢাকা

২৩. *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০১*, ঢাকা

২৪. *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০২*, ঢাকা

২৫. *ক্যাটালগ: শিল্পী আরিফুর রহমানের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৫*, ঢাকা

২৬. *ক্যাটালগ: শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডলের একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০০*, ঢাকা

২৭. *ক্যাটালগ: শিল্পী ফেরদৌস-আরা আহমেদের দ্বিতীয় একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৯*, ঢাকা

২৮. *ক্যাটালগ: শিল্পী বশির মেসবাহ'র একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০০৬*, ঢাকা

২৯. *ক্যাটালগ: ঢাকা- এশিয়া অঞ্চলের ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী-২০১২ উদযাপন উপলক্ষে ক্যালিগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী-২০১২*

৩০. *ক্যাটালগ: ভারতীয় ইসলামী শিল্পকলা প্রদর্শন-১৯৯৪*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

৩১. *Catalogue: Calligraphy on Quranic cosmology by sayed Zulfiquar Zahur*, Dhaka, 2009

৩২. *Catalogue: The Kalima Tayeba, Recent Paintings by Murtaja Baseer*, Bangladesh Shilpokola Academy, 2002

৩৩. *Catalogue of the special exhibition of Islamic Art in Bangladesh*, Dacca Museum, 3-28 April-1978

৩৪. *Catalogue of winner's plates in the First International Calligraphy Competition in the name of Abn-el-Bawwab,* Istanbul, International commission for the Preservation Islamic cultural haeritage, 1996

জ. স্মারকসমূহ

১. *জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক-২০০৬*, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

২. *ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি*, সম্পা. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, (ঢাকা: সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০২)

৩. *সাহিত্য সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা-১৯৯৬, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৪. *সাহিত্য সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা-২০০০ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৫. *সাহিত্য সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা-২০০১ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৬. *সাহিত্য সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা-২০০৪ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

৭. *সাহিত্য সংস্কৃতি*, সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা-২০১১ সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা

ঝ. বাংলা পত্রিকা, জার্নাল ও সাময়িকীসমূহ

১. *দৈনিক আজকালের খবর*
২. *দৈনিক আজকের কাগজ*
৩. *দৈনিক আমার দেশ*
৪. *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*
৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*
৬. *দৈনিক ইনকিলাব*
৭. *দৈনিক খবরপত্র*
৮. *দৈনিক জনকণ্ঠ*
৯. *দৈনিক ডেসটিনি*
১০. *দৈনিক নয়াদিগন্ত*
১১. *দৈনিক প্রথম আলো*
১২. *দৈনিক বর্তমানবাজার*
১৩. *দৈনিক বাংলা*
১৪. *দৈনিক বাংলা বাজার*
১৫. *দৈনিক বাংলার বাণী*
১৬. *দৈনিক যায়যায়দিন*
১৭. *দৈনিক যুগান্তর*
১৮. *দৈনিক সংগ্রাম*
১৯. *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*

Dhaka University Institutional Repository

২০.মাসিক অগ্রপথিক

২১.মাসিক কলম

২২.মাসিক ক্যালিগ্রাফ আর্ট

২৩.মাসিক ছাত্রসংবাদ

২৪.মাসিক তানযীমুল উম্মাহ

২৫.মাসিক নিউজ লেটার

২৬.মাসিক ব্যতিক্রম

২৭.মাসিক হুনর

২৮.ত্রৈমাসিক ক্যালিগ্রাফি

২৯.ত্রৈমাসিক প্রত্যাশা

৩০.ত্রৈমাসিক প্রেক্ষণ

৩১.ত্রৈমাসিক শিকড়

৩২.ত্রৈমাসিক শৈল্পিক

৩৩.ষাণ্মাসিক শিল্পকলা

৩৪.ইসলামিক ফাইন্যান্স

৩৫.ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা

৩৬.এশিয়াটিক সোসাইট পত্রিকা

৩৭.মাহজুবাহ

ঞ. ইংরেজি পত্রিকা

1. *Daily Star*

ট. ওয়েব সাইটসমূহ

1. Bloom1999
2. http:bdcalligraphy.blogspot.com
3. http:dictionary.onepakistan.com.pk.
4. Mediavilla-1996:17, en.wikipedia.org/wiki.mic
5. www.arabiccalligraphy.com
6. www.bdcalligraphy.com
7. www.behance.net

Dhaka University Institutional Repository

8. www.calligraphy.org
9. www.islimicart.com
10. www.islimiccalligraphy.com
11. www.islimicity.org
12. www.sakkal.com
13. www.syfulart.com
14. Wikipedia, the free encyclopedia Islamic calligraphy.

ঠ. বিবিধ

১. *Folder: Cezzane Art Gallary*
২. *Folder: M. Syful Islam*
৩. *পোস্টার: মহানবী (সা.)-এর জীবনীভিত্তিক পোস্টার ও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী-২০১৮,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৪. *প্রচারপত্র: মহিমান্বিত কুরআন প্রদর্শনী (ঢাকা: ২০০৫)*
৫. প্রেস ব্রিফিং: ইসলামিক আর্টস অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ (ঢাকা: ৮ মার্চ-২০০৮)
৬. *ফোল্ডার: ইরানের ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এবং এর সমকালীন বৈশিষ্ট্যসমূহ,* কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর, ইরানী দূতাবাস
৭. বুলেটিন: *ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস*, ইরানী সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত
৮. *হ্যান্ডবিল:* দ্বিতীয় জাতীয় শিশু-কিশোর ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা-২০১২ ও ১৩
৯. বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার অফিস ও ক্লাস পরিদর্শন
১০. বিভিন্ন শিল্পীর নিকট প্রেরিত প্রশ্নের উত্তরপত্র
১১. বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিগত ফেসবুক পেইজ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১. মূল সেমিটিক বর্ণমালার বংশাবলি

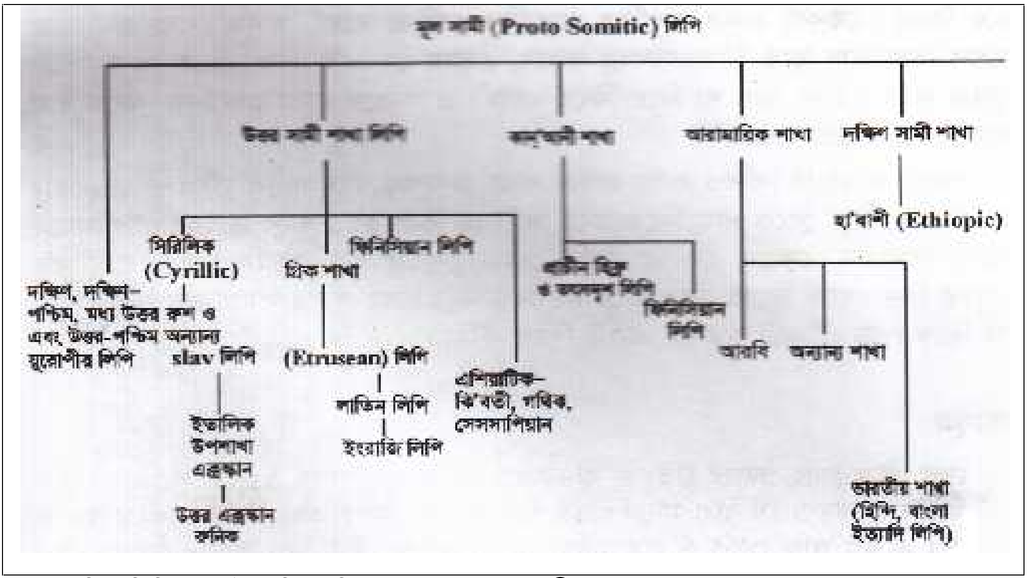

সূত্রঃ মুসলিম লিপিকলাঃ উৎপত্তি ও বিকাশ, ড. আহমদ আলী, পৃ.১৭।

২. ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন বর্ণমালার নমূনা

Dhaka University Institutional Repository

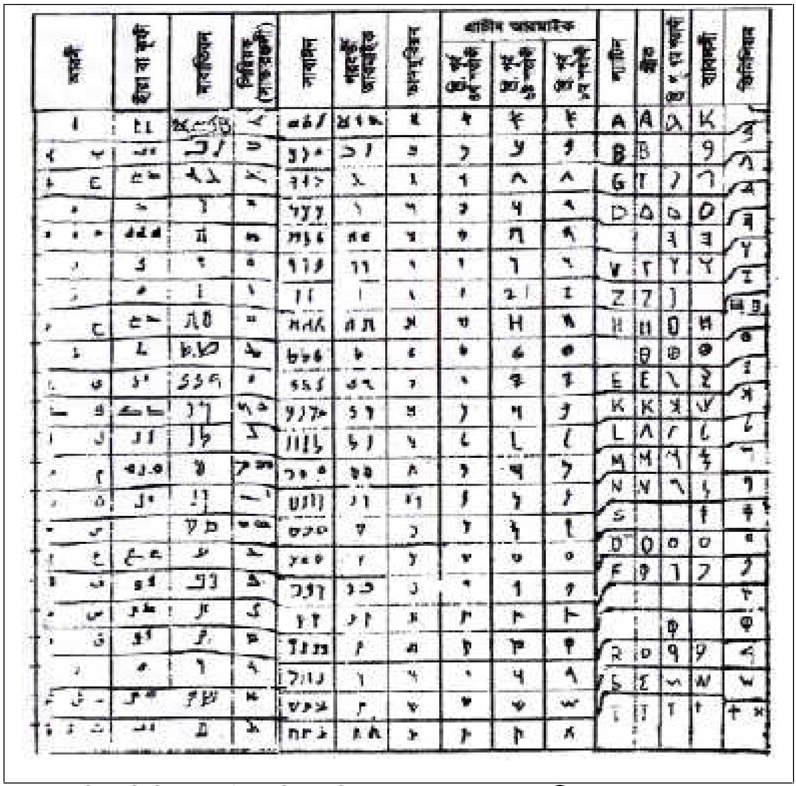

সূত্র: মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ, ড. আহমদ আলী, পৃ.১৬।

৩. আরবী লিপির বিভিন্ন ধারাসমূহ

সূত্র: মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ, ড. আহমদ আলী, পৃ.৮৬।

৪. আল-কুরআনের অধিক সংখ্যক পাণ্ডুলিপিকারক ক্যালিগ্রাফারগণ

ক্যালিগ্রাফার	মাসহাফ সংখ্যা	ক্যালিগ্রাফার	মাসহাফ সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ উবনু উমর	১০০০	ইবনুল বাওয়াব	৬৪
আল হোসাইন ইবনু আলী আল-মা'রুফ	৫০০	আশ-শায়খ আবদুহু ইসহাক	৫৫
আস-সাইয়িদ মুহাম্মদ ইবনু আহমদ	৫০০	মিহরাব ইবনু মুহাম্মদ	৫৪
উমর ইবনু মুহাম্মদ আল-আইয়ুবী	৪৭৭	মুহাম্মদ ইবনু হিবাতুল্লাহ	৫০
রমজান ইবনু ইসমাইল	৪০০	মুস্তাফা ইবনু উমর আল-আইয়ুবী	৪৮
মুস্তাফা হামী	২০০		

সূত্র: তারিখুল খাত্তিল আরাবী ওয়া আদাবিহী, মুহাম্মদ তাহির ইবনু আব্দুল কাদির আল-কুরদী, পৃ.১৭৩।

৫. বাহরাইনের বাদশাহ মুনজির ইবনু সাভির নিকট রাসূল (সা.)-এর প্রেরিত চিঠি

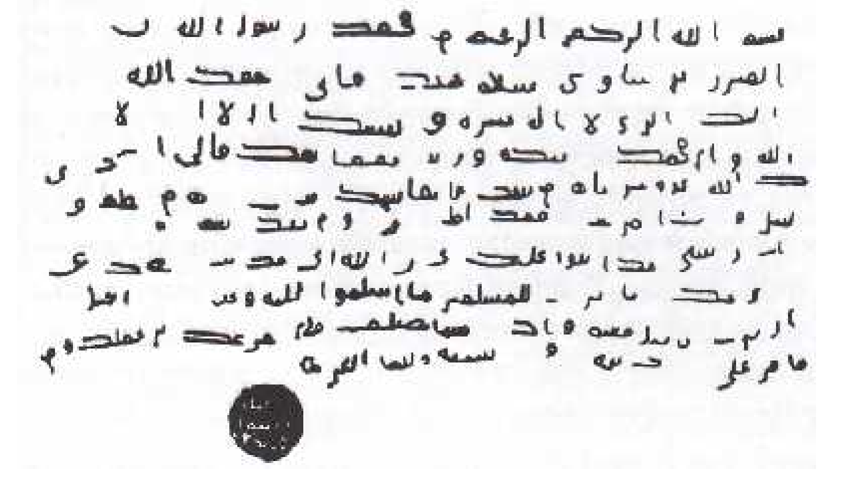

সূত্র: আরবী ক্যালিগ্রাফির উদ্ভব ও বিকাশ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, মুহাম্মদ নূরুর রহমান, পৃ.১৭।

৬. হযরত আলী (রা.) কর্তৃক লিখিত মুসহাফের অংশবিশেষ

Dhaka University Institutional Repository

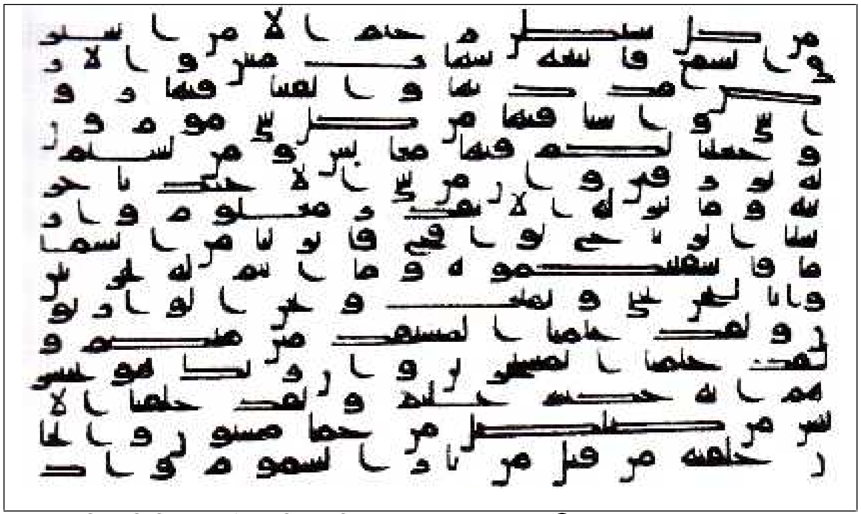

সূত্র: মুসলিম লিপিকলা: উৎপত্তি ও বিকাশ, ড. আহমদ আলী, পৃ.৬৭।